বাসনা অন্তহীন

সমীর রায়চৌধুরী

BanglaBook.org

বাসনা অন্তহীন

সমীর রায়চৌধুরী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকাল
কলকাতা বইমেলা-২০০২

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুদীপ মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মৌসুমী প্রকাশনী, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯
থেকে দেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত
ও অন্নপূর্ণা এজেন্সি, ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

॥ পূর্ব কথা ॥

কয়েকমাস আগে উড়িষ্যায় এক দেবীর মন্দিরে একটি শিশুকে বলিদান দেওয়ার অপরাধে এক পিতা ও তার কন্যাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারান্তে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের সাজা হয়েছিল। কিন্তু প্রাণদণ্ড কার্যকর করবার সময়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে সে সমস্যার কোনো সঠিক সমাধান বা উত্তর খুঁজতে দেশব্যাপী সন্ধান শুরু করলেন আইনজ্ঞরা। সংবাদপত্রে মাত্র এতটুকু সংবাদই প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে কি হলো, তার কোনো তথ্যই পরবর্তীকালে আর জানা যায়নি। সে সব প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলেনি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই ছোট্ট সংবাদটুকুই এই উপন্যাসের ভিত্তি। এই উপন্যাসে সময়কালকে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী, ঘটনাস্থলের পরিবর্তন করা হয়েছে উড়িষ্যা থেকে উত্তর বিহার অঞ্চলে। কাহিনীর স্বার্থেই এই পরিবর্তন। বিহারের মতো একটি অনগ্রসর রাজ্যে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ঘটিত একটি কাহিনীর চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনার সংগঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, নারী সমাজের অবমাননা, কন্যা-সন্তানের প্রতি অবহেলা ও অনাদর, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান — ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ ও বিশ্বাস্য। তাছাড়া, ফেলে আসা কালের ইতিহাস, জন-জীবন, মানুষের আচার-আচরণ, প্রেম-প্রণয় যে আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এটা তো অনস্বীকার্য। বাকিটা বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম পাঠকের হাতে। আমি শুধু নিমিত্তমাত্র।

আমার বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ প্রসঙ্গে আরো দুটি একটি কথা বোধহয় না বললেই নয়। উপন্যাস রচনার এবং তা প্রকাশনার ব্যাপারে প্রথম উৎসাহ লাভ করি বন্ধুবর শ্রীউত্তম ঘোষের কাছ থেকে। তার আন্তরিক সহযোগিতা এবং বর্তমান গ্রন্থটি রচনাকালে আমার অন্যতম পুত্রপ্রতিম শ্রীমান লালুর (শ্রীপতি কুমার জানা) দেশের বাড়ীতে আমার থাকার সময়ে তার সেবা ও পরিচর্যা লাভ না করতে পারলে এ লেখা আদৌ হয়ে উঠতো কিনা জানি না। এই সুযোগে এদের দুজনের প্রতি এবং আমার রচনার বিশেষ অনুরাগী, মৌসুমী প্রকাশনীর কর্ণধার, আমার অনুজপ্রতিম শ্রীদেবকুমার বসুর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখা গেল।

গ্রন্থটি আমার সমস্ত প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

কলকাতা, ২০০২

সমীর রায়চৌধুরী

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

পাটনা হাইকোর্টের চওড়া গেটটার মধ্যে দিয়ে জেলের পুলিশ ভ্যানটা ঢুকলো। তারিখটা মনে রেখে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই স্থানীয় 'নারী অধিকার রক্ষা কমিটির' প্রায় শ'দুই সদস্যা জমায়েত হয়েছিল কোর্ট চত্বরে। বিচারাধীন কয়েদীদের নিয়ে কখন গাড়ী ঢুকবে— সেই অপেক্ষায় ছিল জনতা।

সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরম। বেলা দশটা বাজবার আগেই মাথার ওপর খর সূর্য। কিন্তু জনতার আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। দূর দূর জায়গা থেকে আসা মানুষ ঘিরে রেখেছে কোর্ট চত্বর। কাছেপিঠে ঠাণ্ডা সরবতের দোকানগুলোয় ভিড় থিক্‌থিক্ করছে। দু'আনার সরবৎ অনায়াসেই বেশী বরফ দিয়ে তিন আনা চার আনায় বিকোচ্ছে। নেত্রীস্থানীয়া একজন মহিলা ততক্ষণে উঠে পড়েছেন একটি জিপ গাড়ীর ওপরে। বিনা মাইকে চিৎকার করে সমবেত মহিলা জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন— "তোমরা সকলে আমার সাথে প্রতিবাদ করো। আসামী নাসরিনকে জজসাহেব যেন ফাঁসির সাজা দেন। ঐ মেয়েটা খুনী। জঘন্য অপরাধ করেছে। সমস্ত নারীসমাজকে, সমস্ত মায়েদের মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ও। ঐ কলঙ্কিনী, ভ্রষ্টা নাসরিনকে আমরা কেউ ক্ষমা করবো না।"

জ্বালাময়ী ভাষণে ততক্ষণে উদ্বেল জনতা। অনেক পুরুষও ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে মেয়েদের আশেপাশে। কয়েকটা কনস্টেবল লাঠি হাতে তৈরী হয়ে আছে, যে কোনো অবস্থাকে সামাল দেবার জন্যে। আপাতত তারাও লাঠি মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে হাঁ করে শুনছে উত্তেজিত ভাষণ।

পুলিশ ভ্যানটা গেট দিয়ে ঢোকামাত্রই কেমন করে যেন খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল বাতাসে। ভাষণ শোনা ছেড়ে রেখে মহিলাদের দল ছুটে এসে ঘিরে ধরেছে ভ্যানটিকে। এতক্ষণে সচল হয়েছে কনস্টেবলরাও। লাঠি উঁচিয়ে তারা ছুটে এসেছে ভ্যানের জন্য রাস্তা করে দিতে। পুলিশ আর মহিলাদের খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে কোনো রকমে গাড়ীটা কোর্ট বিল্ডিং-এর পিছনের দিকে চলে গেল— যেখান দিয়ে এজলাসের পিছনের ঘরে বন্দীদের জন্য অস্থায়ী অপেক্ষার জায়গায় যাওয়া যায়। কিছু উৎসাহী মানুষ চত্বর থেকে সংগ্রহ করা ইঁট পাটকেল তুলে ছুঁড়ে মারলো গাড়ীটার দিকে। পুলিশ তাদের পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। এরই মধ্যে বন্দীরা নামছে ভ্যানের দরজা খুলে। লাঠি হাতে হাতে ধরে জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে পুলিশ। দু'তিনজন বন্দী নেমে

BanglaBook.org

যাওয়ার পরে নামলো নাসরিন। আঁচলটা দিয়ে মাথা মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা। সঙ্গে একজন নারী পুলিশ। নাসরিনকে নামতে দেখে জনতা আবার উদ্বেল। চিৎকার হচ্ছে— "ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। বিচার আমরা করবো।" কেউ বলছে — "দেবীর সামনে হাড়কাঠে ওকেও বলি দাও, তবেই এর বিচার হবে।" সমস্ত জায়গাটা ততক্ষণে যেন এক অদ্ভুত অস্থিরতা, হিংসা আর ঘৃণার বাতাবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মাথার ওপর খর সূর্য, বাতাসে তপ্ত গুমোট ভাব— কিছুই যেন আর কারো স্মরণে নেই। শুধু প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর প্রতিহিংসা।

বন্দীদের ভিতরে নিয়ে যাবার পরও বেশ অনেকক্ষণ ধরে বাইরে চত্বরে চলতে থাকলো ভাষণ, প্রতিভাষণ। পুলিশ চেষ্টা করছে বিক্ষোভকারীদের কোর্ট চত্বর থেকে সরিয়ে দিতে।

বেলা এগারোটা বাজতেই এজলাসে উপস্থিত হয়ে গেছেন বিচারক। কোর্ট ঘর আগে থেকেই প্রায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মাথার ওপর দীর্ঘ দণ্ডে ঝোলানো দুই ব্লেডের কালো কালো পাখাগুলো আপ্রাণ ঘুরেও দূর করতে পারছে না ঘরের তপ্ত আবহাওয়াকে। এজলাসের ঠিক নীচে সারি সারি আসনে ভিড় করে আছেন আইনজীবীর দল। তাঁদের পরিধানে কালো গাউন, হাতে গোছা গোছা কাগজ। সকলেই একটু উত্তেজিত। ভিতর থেকে সম্পূর্ণ না হলেও অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বাইরের উত্তেজিত কলকণ্ঠের।

বিচারকের নির্দেশে আসামীদের হাজির করা হয়েছে কাঠগড়ায়। অন্যদের সাথে নাসরিনও হাজির সেখানে। নাসরিনের পরনে ছাপা একটা সুতির শাড়ী। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। মাথা নীচু করে সে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ার কাঠের রেলিংটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে।

ঘোমটার মধ্যে থেকেই সে একনজর দেখে নিতে চেষ্টা করে দর্শকাসনে উপবিষ্ট মানুষগুলোকে। না, যাকে সে আশা করেছিল সে আসেনি। এসেছে শাশুড়ী জুবেদা বেগম আর স্বামী ফিরদৌস। ছেলের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বসে আছে জুবেদা বেগম। উভয়েরই নীরব দর্শকের ভূমিকা।

মনটা একটা অস্বাভাবিক শূন্যতায় ভরে রয়েছে নাসরিনের। জেল থেকে হাইকোর্টে আসার সময়টুকু যেন তার কাছে এক অনন্তকাল। সেই কালটুকু যেন এই মুহূর্তে এসে ঠেকেছে সময়ের পাত্রের তলানীতে। এদিকে কোনো পাখা নেই। অসহ্য গরম। ঘোমটার মধ্যেই দরদর করে ঘাম গড়িয়ে নামছে

BanglaBook.org

তার মুখ বেয়ে, কণ্ঠ বেয়ে, দুই বাহুর অনাবৃত অংশ বেয়ে। আঁচল দিয়ে ভিতরটা একবার মুছে নেয় নাসরিন। কতক্ষণে বিচার শুরু হবে? নিম্ন আদালতে তার অপরাধ নিয়ে যেসব কথা দিনের পর দিন হয়েছিল— আবারো কি সেই সব কথা হবে এখানে? এতদিনে নাসরিন নিজেও বুঝে গেছে যে, তার অপরাধের যা মাত্রা— তাতে তার পুরনো দণ্ডই হয়তো আজ এখানেও বহাল থাকবে। আজ তার সাজা ঘোষণার দিন। যা হয় হয়ে যাক। আর পারছে না নাসরিন। ঘটনা ঘটেছিল ৩রা অক্টোবর, ১৯৫০ সালে। আজ ১৯৫১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। গত পাঁচ মাস তার কেটেছে পাটনা সেন্ট্রাল জেল আর পূর্ণিয়ার জেল হাজতে। এই ক' মাস মাঝে মাঝে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরদৌস এসে দেখা করেছে তার সঙ্গে। বেশীরভাগ সময়েই নীরব থেকেছে নাসরিন। ফিরদৌস দুহাতে নাসরিনের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলেছে— "কেন তুই এ কাজ করেছিলি, নাসরিন? তোর কি একবারও তার মায়ের কথা মনে পড়েনি? টাকার জন্য তুই এতবড় একটা পাপের কাজ করলি?"

দু' চোখে অঝোর ধারা নামতো ফিরদৌসের। কিন্তু কঠিন, উদাস দৃষ্টি মেলে নীরবে দূরের জেল পাঁচিলের দিকে চেয়ে থাকতো নাসরিন। কেন যে এ কাজে সে নামলো— তা জানতো শুধু একজন। কিন্তু সে-ও তো আর তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। নিম্ন আদালতে সে তো একদিনও আসেনি। যা কিছু করেছে এই ফিরদৌস। গাঁয়ের জমিজমা সব বিক্রি করে, মায়ের সামান্য সোনাদানা বিক্রি করে মামলা চালিয়ে গেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রক্ষা হলো না। আজ উচ্চ আদালতে দণ্ডাদেশ দানের দিন। মাকে সঙ্গে করে এখানে এসেছে ফিরদৌস।

সরকারী আইনজীবী মুখবন্ধ হিসাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। চোখা চোখা বাক্যবাণের শেষে বলতে ভুল করলেন না যে, এই আসামী যে জঘন্য অপরাধ করেছে তার জন্য মহামান্য আদালত যেন এতটুকু ক্ষমা প্রদর্শন না করেন। নিম্ন আদালতের রায়কেই যেন এখানেও বহাল রাখা হয়, যা দেখে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন অপরাধ করতে সাহস না পায়।

পাবলিক প্রসিকিউটারের বক্তব্য শেষ হয়েছে। এবার নিজের বক্তব্য শুরু করলেন প্রধান বিচারপতি। বত্রিশ পৃষ্ঠার রায়ের শেষে তিনি আসামীকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দণ্ডাদেশ শোনার জন্য বললেন।

উঠে দাঁড়ালো নাসরিন। মুখের অবগুণ্ঠন বিন্দুমাত্র অনাবৃত না করে কম্পিত হৃদয় নিয়ে বিচারপতির দণ্ডাদেশ শ্রবণ করলো সে। মাঝে মাত্র

BanglaBook.org

কয়েকটি মুহূর্ত। আদালত কক্ষের অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করে ঘুরে চলেছে দুই ব্লেডের কালো কালো পাখাগুলো। আরো শক্ত হাতে ছেলের হাতখানা জড়িয়ে ধরে জুবেদা বেগম। বিচারকের কণ্ঠস্বর আদালতের এজলাসের পিছনে টাঙানো দেওয়াল ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যায়—"মহামান্য জুরিগণের পরামর্শে আমি আসামী নাসরিন বিবিকে তিতলি হত্যাকাণ্ডে প্রধান অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করলাম। এই নিষ্ঠুর, অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড স্থির মস্তিষ্কে ঘটানোর জন্য এই আদালত তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছে। তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রাণ যায়।"

দণ্ডাদেশ শুনে থরথর করে কাঁপতে থাকে নাসরিন। তারপর কাঠগড়ার মধ্যেকার বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়ে সে। দর্শকাসনে বসে থাকা জনা কয়েক দর্শক বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। শুধু অঝোর ধার অশ্রু নিয়ে মায়ের কাঁধের ওপর মাথা রাখে ফিরদৌস। কিন্তু ততক্ষণে নাসরিনকে হাতকড়া পরিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুজন নারী পুলিশ ও দুজন পুরুষ কনস্টেবল। পিছনে একবারও ফিরে তাকালো না নাসরিন। সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফিরদৌস। ততক্ষণে আদালত কক্ষ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। ছেলের হাতটা ধরে এই প্রথম কথা বললো জুবেদা বেগম— "চল্ ফিরদৌস এই বোধহয় ভালো হলো। আল্লা ওর সব অপরাধ মাফ করে দেবেন। পরের জন্মে ও খাঁটি সোনা হয়ে আবার তোর কাছে ফিরে আসবে। আমি জানি।"

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ঠাকুর চিরঞ্জিলালের হাভেলির পাঁচিল পার হয়ে অথবা ফটক দিয়ে বাইরে না বার হলে নদীর জল দেখা যায় না। কোশি নদী আগে এই বাড়ীর প্রায় সম্মুখ দিয়েই বইতো। কিন্তু গত প্রায় ১০/১২ বছর ধরে নদীর ধারা পূর্ব দিকে সরতে সরতে এখন বেশ খানিকটা দূরেই সরে গেছে। বছর খানেক আগেও, ফটকের ওপারের দোকানগুলো তখনো গজিয়ে ওঠেনি, ফটকের বাইরে দাঁড়ালে কিছুটা দূরে হলেও নদীর ধারাটা দেখা যেত। এখন দোকানঘরগুলোর ফাঁক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হয় নদীর ধারাটাকে। দূরে হলেও বৃদ্ধা দেওকি রোজই স্নান করতে যায় কোশি নদীতে। কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ দেওয়ার পর বছর খানেক বাদেই দেওকি চলে এসেছে জামাতা চিরঞ্জিলালের হাভেলিতে। ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে সাবিত্রীকে নিয়েই ছিল তার সংসার। অবস্থা ভাল ছিল না দেওকির। পূর্ণিয়ার ভূষিমালের

BanglaBook.org

দোকানটা বিক্রি হয়ে যাবার পর স্বামী গোরক্ষনাথ স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে আরারিয়া গ্রামে এসে বিঘা দুই জমি কিনে বাস করতে শুরু করেছিল। মেয়ের বিয়ে দেবার মতো টাকা তার ছিল না। ভাবনা চিন্তা থেকে দেহ ক্ষয় হতে হতে একদিন দারিদ্র্যের সংসারে মেয়ে বউকে ফেলে রেখে চোখ বুজেছিল গোরক্ষনাথ। দেখতে খারাপ ছিল না সাবিত্রী। ডাগর মেয়েকে একা ঘরে রাখতে সাহস ছিল না দেওকির। কিন্তু করবেই বা কি? পয়সা নেই দুজনের খাওয়ার। দু'বিঘা জমি ভাগে দিয়ে চাষ করালেও দুটো পেট ভরে না। পরণের কাপড়ও তো দরকার। পাড়ার উঠতি বয়সের ছোঁড়াদের নানা মন্তব্যের ভয়ে দেওকি বাইরে পাঠাত না মেয়েকে। সেবার ছট পুজোয় সাবিত্রীকে দেখেছিল চিরঞ্জিলাল। সাবিত্রীর বয়স তখন উনিশ কুড়ি হবে। গায়ের রংটা শ্যামলা তবে মুখ চোখ সুশ্রী। চোখে পড়ে গিয়েছিল চিরঞ্জিলালের। পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে সে। ফর্সা গায়ের রং। মাংসল মুখমণ্ডলে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। পুরু অধরোষ্ঠে কামনার আভাস। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের ফলে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে সে। সেই সঙ্গে জুটেছে ইয়ারবন্ধুদের দল। বড় বাড়ী করেনি চিরঞ্জির বাবা সুখরাম ঠাকুর। একমাত্র ছেলের জন্যে যতটা পেরেছিল টাকা আর জমিজমা করে রেখেছিল। তাই বুড়ো সুখরাম চোখ বুজতেই দুহাতে জীবনটাকে ভোগ করতে উঠে পড়ে লাগলো চিরঞ্জিলাল।

লোক পাঠিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল পাত্র নিজেই। প্রথমটা বিশ্বাস করতে চায়নি দেওকি। মনে মনে প্রচণ্ড আশা নিয়েও মুখে সে বলেছিল— "আমি গরীব। বড়লোক জামাই কি আমার সাবির কপালে আছে? তোমাদের বন্ধু ঠাকুরকে বোলো— এ বিয়ে হতে পারে না।" কিন্তু প্রস্তাবক বন্ধুটি বারংবার চিরঞ্জিলালের হয়ে বলেছিল— "আপনি টাকার কথা ভাবছেন কেন, চিরঞ্জি জানে আপনার অবস্থা; সব জেনেই তো সে প্রস্তাব দিয়েছে। দরকার হলে সোনাদানায় মুড়ে দিয়ে সে সাবিত্রীকে ঘরে আনবে। মাসী, আপনি আর না বলবেন না।"

মনটা লোভী হয়েছিল দেওকির। এভাবে একেবারে নিখরচায় মেয়েটা উৎরে যাবে, তা ভাবেনি সে। তবু একবার কপট খেদের সুর গলায় তুলে বলেছিল— "সাবি আমার একমাত্র সন্তান। সে চলে গেলে এ বাড়ীতে আমি হাঁফিয়ে উঠে মরে যাব। শেষ সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক থাকবে না। আমার কি হবে, বলতো?"

BanglaBook.org

এসব কথা কানে গিয়েছিল নবযুবা চিরঞ্জিলালের। সে তখন সাবিত্রীর চিন্তায় সব শর্ত মেনে নিতে রাজী। বলেছিল— "মাসীকে বলো না, মেয়ের বিয়ে দিয়ে কিছুদিন একা থেকে দেখুক। আমি তো বড় করে হাভেলি বানাবো শিগগির। তখন না হয় মাসী এখানে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

এরপর অবশ্য আর 'না' বলার উপায় ছিল না। ১৯২০ সালে কোশি নদীর বন্যার প্রায় তিন মাসের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাওয়া হাভেলিতে বৌ আর শাশুড়ীকে নিয়ে তুলেছিল চিরঞ্জিলাল। এত বড় বাড়ীতে পয়সাওয়ালা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল দেওকি। বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে হবে বলে ছেলে সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর নেয়নি মা। চিরঞ্জির বাপের জমিদারী ছড়ানো ছিটানো ছিল পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে। আরারিয়া থেকে উত্তর দিকে নেপালের সীমান্তবর্তী গ্রাম যোগবাণীতে ছিল করাত কল। পূর্ব দিকে ফরবেশগঞ্জ আর গড়বানাইলিতে ছিল বেশ কয়েক বিঘা জমি। এসব জায়গা থেকে খাজনা আদায়ের জন্যে চিরঞ্জিলালকে মাঝে মধ্যেই যেতে হতো ৪/৫ দিনের জন্যে। সঙ্গে যথারীতি যেতো জনাকয়েক ইয়ারবন্ধু। কদিন প্রজাদের বাড়ীতে মুরগী আর খাসি সাঁটিয়ে বাড়ী ফিরতো সকলে। ঐ কদিন মেয়েমানুষ আর মদও যে না চলতো এমন নয়। কিন্তু এসব দেখেও না দেখার ভান করে চোখ বুজে থাকতো দেওকি। মাঝে মাঝে মেয়ের শোবার ঘরের বন্ধ দরজার ওপার থেকে তার কানে আসতো মেয়ের চাপা কান্নার আওয়াজ। হঠাৎ দরজা খুলে ধুতির গিঁটটা বাঁধতে বাঁধতে বার হয়ে আসতো চিরঞ্জি। সে দূরে সরে গেলে ভিতরে ঢুকে দেখতো শুধু সায়া আর ব্লাউজ গায়ে শুয়ে আছে সাবিত্রী। পাশে একটা খোলা বাক্সে এক জোড়া সোনার দুল পড়ে আছে। বোধহয় অবাধ অত্যাচারের মূল্যবান ঘুষ।

সবই বুঝতে পারতো দেওকি। কিন্তু পাশার দান পড়ে গেছে। এখন হারের এই খেলায় জেতার পালা শেষ হয়ে গেছে তার। যত দিন যাচ্ছে, ততই বাইরে মন পড়ে থাকে জামাই চিরঞ্জিলাল ঠাকুরের। যখন ঘরে থাকে, তখন চুটিয়ে ভোগ করে সাবিত্রীর যৌবনকে। বেশী আপত্তি করলে ছোটখাটো উপহার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বজায় রাখে স্বামীত্বের অধিকার। প্রায় কিনেই নিয়েছে সে সাবিত্রীকে। সাবিত্রী তার নিছক স্ত্রী নয়, তার দুর্দান্ত লাম্পট্যের শিকার;তার একজন ক্রীতদাসী মাত্র।

দেওকি জানে যে, হাভেলির কাজের লোকদের মারফৎ অন্দরমহলের

BanglaBook.org

এসব খবর বাইরে চলে যায়। এখনো উত্তর বিহারের এই সমাজে মেয়ে জামাইয়ের সংসারে মেয়ের মায়ের থাকাটা ভাল চোখে দেখে না কেউ। কুড়ি সালের বিহারে এখনো এতটা আধুনিকতার হাওয়া বয়নি।

বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে হঠাৎই অন্তঃসত্ত্বা হয় সাবিত্রী। এ বাড়ীতে বয়স্কা মহিলা বলতে একমাত্র দেওকি। আর যারা আছে তারা দাসদাসী। কেউ কেউ থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। কেউ বা ঠিকে, আসা যাওয়া করে এবেলা ওবেলা। সাবিত্রীকে অসুস্থ জেনেও বাইরে যাওয়ার কামাই নেই চিরঞ্জিলালের। এখন সাবিত্রীকে নিয়ে তার ফুর্তিকরা যাবে না। তাই নারী সঙ্গ পিপাসু চিরঞ্জি নিয়মিতই বন্ধুদের নিয়ে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ইত্যাদি জায়গায় ঘুরতে যায়— খাজনা আদায়ের অজুহাতে।

তখন বর্ষাকাল। যে কোশি নদী বছরে ৮/৯ মাস বালি আর পাঁকের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বটুকু রক্ষা করে চলে— বর্ষার মাস দুই সেখানে জলের ঢল নামে। হাভেলির ফটকের ওপারেই তার জলের গর্জন শোনা যায়। এমনই এক বর্ষারাতে সাবিত্রীর প্রথম সন্তান সুধার জন্ম হয়েছিল। বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত সাবিত্রীর কোনো সন্তান হয়নি বলে মনে মনে বড়ই শঙ্কিত ছিল দেওকি। যদি জামাই তাদের দুজনকেই বাড়ী ছাড়া করে দেয়— তবে দেওকির বিপদের আর শেষ থাকবে না। বিয়ের প্রায় দু'মাস যেতে না যেতেই একবার অবশ্য অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল সাবিত্রী। কিন্তু কলতলায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে সে গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার। এরপরে কি এক জটিল শারীরিক কারণে বেশ দীর্ঘকাল তার আর কোনো সন্তান হয়নি। নানা মাদুলি, তাবিজ, পীরের থানে সুতো বাঁধা— অনেক কিছু গোপনে চেষ্টা করেছিল দেওকি। এমন কি জামাইকে দুধের সঙ্গে অজানা শিকড় বেঁটেও খাইয়েছিল। কিন্তু কিছু কাজ হয়নি তাতে।

এবারে বাচ্চা হবে শুনে স্বামীর কাছে কদর বেড়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর। বৌকে ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্যে ভার দিয়েছিল শাশুড়ীকে। বাড়ীর বাইরে থাকাটা অবশ্য বন্ধ করেনি সে। আরারিয়া গাঁয়ে কোনো প্রসূতি সদন ছিল না। গোরুর গাড়ীতে করে পূর্ণিয়া গেলে তবেই হাসপাতাল। তাই বাড়ীতেই সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল দেওকিকে। বৃদ্ধা ধাইয়ের হাতেই এমনি এক বর্ষার রাতে জন্ম নিল সুধা।

কন্যাসন্তান বোধহয় আশা করেনি চিরঞ্জিলাল। মহাল থেকে ফিরে মেয়ে হয়েছে শুনে প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল সে। রাগে মেয়ের মুখও

BanglaBook.org

দেখতে চায়নি চিরঞ্জি। নিতান্ত দেওকির অনুরোধে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একবার সাবিত্রীকে দেখে গিয়েছিল মাত্র। কাঁথায় মোড়া সুধাকে দেখার প্রবৃত্তিও ছিল না তার। এরপর প্রায় ১০ দিন বাইরে ছিল সে। ১০ দিন পর বাড়ী ফিরেও বৌ বা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করেনি চিরঞ্জি। হাভেলির বাইরের দিকের একটা ঘরে বন্ধুদের নিয়ে থাকতো সে। এখানে বিদ্যুৎ তখনো আসেনি বলে ঘরে টানা পাখা একটা লাগিয়ে নিয়েছিল চিরঞ্জিলাল। এখন বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরম। এদিকে তবু মাঝে মাঝে নদীর হাওয়াটা পাওয়া যায়।

এসবে মনে মনে অপমান বোধ করলেও এখন কিছু করার উপায় নেই দেওকির। দু'এক সময় কথা প্রসঙ্গে জামাইয়ের কাছে একথা তুলে শুধু তার বিরক্তিরই কারণ হয়েছে দেওকি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

পরের বছরই আবার সন্তানের জন্ম দিল সাবিত্রী। এবারও কন্যাসন্তান, সুমা। পরপর দুই কন্যার জন্ম হওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তেই থাকে চিরঞ্জির। মাঝে মাঝে এক আধ দিন বেশী রাতে বাড়ী ফিরলে সেদিন রাতটা কাটায় সাবিত্রীর ঘরে। একদিন মনে যথেষ্ট সাহস এনে জামাইকে কিছু প্রশ্ন করেছিল দেওকি — "মেয়ের জন্ম দিয়ে আমার সাবি কি এমন অপরাধ করেছে যে, তুমি তার মুখ দেখো না? মেয়ের জন্ম কি সে একা করেছে? তুমি তাতে ছিলে না? দোষ যদি সাবির হয়ে থাকে, তবে সে দোষ তো কিছু তোমারও! একথাটা কোনোদিন ভেবে দেখেছ?"

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ফেলে হাঁফাচ্ছিল দেওকি। কথাগুলো শুনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল চিরঞ্জিলাল। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছিল— "আমার বংশ রক্ষার জন্য ছেলের জন্ম দিলে ওকে আমি মাথায় করে রাখবো। ততদিন সবুর করতে হবে আপনাকে।"

নিজের টাট্টু ঘোড়াটাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল চিরঞ্জিলাল। সেবার ফিরেছিল দু'সপ্তাহ পরে।

তৃতীয় সন্তান সুজাতার জন্মের পরে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল সাবিত্রী। এক বছর অন্তর সন্তান জন্ম দিতে দিতে ক্লান্তিও এসেছিল তার। চিরঞ্জিলালের এ-অত্যাচারও সে মাথা পেতে নিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল, এবারে যদি সে স্বামীকে পুত্রের মুখ দেখাতে পারে, তবে স্বামীর কাছে সোহাগিনী হবে সে। কিন্তু তার সে আশা মেটেনি।

—"বল্ তো মা, আমি কি করবো? ও আমার মুখ দেখতে চায় না,

BanglaBook.org

অন্ধকারে ঘরে ঢোকে। বলে তোর ও মুখ দেখে আমার স্বর্গে যাওয়া হবে? ছেলের হাতের আগুন না পেলে তোর আর তোর মায়ের মতো আমাকেও নরকে পচতে হবে। রাতের জন্যে তুই ঠিক আছিস, দিনে আমায় দেখতে পাবি না। এখন আমি কি করবো রে মা?" অঝোরে কাঁদছিল সাবিত্রী। প্রতিবেশী মনসুরের দাদি জোহরা বলেছিল, "মেয়েকে একবার আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও বড় পীরবাবার দরগায়। ওখানকার মাটি দিয়ে মাদুলি একটা পরবে। পাঁচ পয়সা সালামি দিলেই হয়ে যাবে। দেখবে, জামাইও ঘরে ফিরবে, আর মেয়েও ছেলের চাঁদপানা মুখ দেখাতে পারবে বাপকে।"

মেয়েকে পীরের দরগায় পাঠিয়েও কোনো লাভ হয়নি দেওকির। তৃতীয়া কন্যা সুজাতার জন্মের এগারো মাসেই এসেছে চতুর্থা কন্যা স্নেহা। অবহেলার মাত্রা শুধু বেড়েই চলে সাবিত্রীর। আর কিছু হয় না। আগে তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ সাবিত্রীর ঘরে আসতো চিরঞ্জি। কিন্তু ইদানীং সে প্রায় আসেই না। দুপুরে বা রাতে খাওয়ার জন্য অন্দরে আসে মানুষটা। অন্ধকার ঘরে এসে বসে যায় পিঁড়ির সামনে। যতক্ষণ না সাবিত্রী বা দেওকি ঘরে আলো নিয়ে আসে— ততক্ষণ কাউকে ডেকে একটা আলো আনতেও বলে না।

সেদিনও এমনি করে ঘরে ঢুকে একা বসে গেছে খাওয়ার জায়গায়। সাবিত্রী স্বামীর পায়ের আওয়াজ বুঝতে পেরে কোনো আলো না নিয়ে অন্ধকারে একা এসে পাশে দাঁড়ালো চিরঞ্জির। হেঁট হয়ে নরম গলায় বললে — "আপনি আমাকে না ডেকে একা একা অন্ধকারে এসে বসেন। কেন, আমাকে কি ডাকতেও আপনার ইচ্ছে করে না?"

প্রথমে কোনো জবাব দেয়নি চিরঞ্জি। দ্বিতীয়বার স্ত্রীর ঐ একই প্রশ্নে হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজে পায় না সে। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলে— "মেয়েগুলো বুঝি ঘুমিয়েছে? কি যেন সব নাম ওদের?"

ম্লান হেসেছিল সাবিত্রী। বলেছিল— "ওরা তো আমার একার সন্তান নয়, আপনারও। আপনি ওদের নামও জানেন না। আমরা কি আজ এতই দূরে সরে গেছি আপনার?"

একথার জবাব দেওয়ার আগেই ওদের কথাবার্তা দূর থেকে শুনতে পেয়ে চলে এসেছিল দেওকি। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে দুজনকে দেখে মেয়েকে ডেকে দেওকি বলেছিল —"ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়— এটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? এ বাড়ীতে যেটা আমি নিজে না করবো সেটা আর হবে না?"

BanglaBook.org

ঝাঁঝের সুর দেওকির কণ্ঠে। আসলে সে নিজে আজকাল প্রচণ্ড অশান্তিতে থাকে মেয়ের এই অবস্থা দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা এরকম একটা জায়গায় এসে দাঁড়াবে— তা আশা করেনি দেওকি। বিরক্ত বোধ করছিল চিরঞ্জিলালও। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল— "এবার থেকে ঘরে আলো জ্বালিয়ে খাবার দিয়ে ডেকো আমাকে। এতক্ষণ ধরে নাটক দেখার সময় আমার নেই।" ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো দেওকি। এতদিন কখনো সে যা করেনি— এবার তা-ই করে বসে সে। মেয়ের চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে ঘা কতক কিল বসিয়ে দিয়ে সে বলে — "এসব তোর জন্যেই তো হচ্ছে! কেন, একটা মরদ বেটার জন্ম দিতে পারিস না তুই? স্বামী ঘরে থাকে না তো তোরই জন্যে! তুই মর, তুই মর।" বলতে বলতে ঘর থেকে বার হয়ে যায় দেওকি। অন্ধকারে মেঝের ওপর একা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সাবিত্রী। সেই অসহায় কান্নার আওয়াজ দেওকি বা চিরঞ্জি কারো কানেই পৌঁছায় না।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

সমস্ত বিহার জুড়ে গোলমাল চলছে। নিম্নবর্ণের পিছিয়ে পড়া মানুষদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ আর ঠাকুররা। পাকুড়, কিষাণগঞ্জ, মোকামা, রাজমহল, কাটিহার— সব জায়গা থেকে দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর আসছে। হরিজনরা গান্ধীজীর সমর্থন ও নেতৃত্বে মাথা তুলছে। নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করার জিগির তুলেছে হরিজন সম্প্রদায়। এদের মধ্যে রয়েছে মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতিরা। অনেক জায়গা থেকে খবর আসছে— ঠাকুররা এদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ক্ষেত খামারে এদের দিয়ে জোর করে চাষ করাচ্ছে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিচ্ছে না। দেশে ইংরাজের রাজত্ব। কিন্তু তাদের কথা শুনছে কে ? কোনো কোনো জায়গায় তো ইংরাজের পুলিশ দাঙ্গা থামাতে গুলিও চালাচ্ছে। পূর্ণিয়া জেলার এই উত্তরাংশে অবশ্য এখনো এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবু ঠাকুর চিরঞ্জিলাল একটু সাবধানেই থাকে। এর মধ্যে একদিন জেলা সদর পূর্ণিয়াতে গিয়ে কালে*রের অফিসে বন্দুকের জন্য একটা দরখাস্ত দিয়ে এসেছে সে। তার বড় বাড়ী, সহজেই লোকের চোখে পড়ে। তার অর্থ আর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের গল্পও এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে। বাড়ীর কাজের লোকেরা হরিজন না হলেও মধ্যম বর্গের

BanglaBook.org

মানুষ। কে জানে কখন তারা দল পাকিয়ে হরিজনদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মেয়েরা বড় হচ্ছে। চতুর্থা কন্যা স্নেহার পরে আবারও এক মেয়ে হয়েছে সাবিত্রীর। বড় মেয়ে এখন প্রায় ১০ বছরের। পরপর অন্যেরা কেউ নয়, কেউ আট, সাত, ছয়। প্রায় পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে পুত্রের মুখ দর্শন করা হয়ে উঠলো না চিরঞ্জিলালের। মেয়েদের নিয়ে কোনোরকম আগ্রহই নেই তার। বিহারের এই অঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। তাছাড়া, যে গ্রামে ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটা মিড্‌ল স্কুল মাত্র আছে-— সেখানে মেয়েদের জন্য স্কুলের কথা ভাবাই যায় না। ছেলে হয়নি বলে বারবার চেষ্টা করেও যখন পরপর পাঁচটি কন্যাসন্তান জন্মালো— তখন তাদের ওপর চিরঞ্জিলালের কি রকম মনোভাব থাকতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ দোষী করে বসে আছে সাবিত্রীকে।

মেয়েরা বেশীর ভাগ সময়েই দিদিমার কাছে থাকে। সংসার দিনে দিনে বড় হয়েছে। কাজের লোকজনকে বাদ দিলে প্রথম দিকে সংসারে ছিল শুধু স্বামী-স্ত্রী। তারপর এলো শাশুড়ী দেওকি। তারও পরে গত পাঁচ বছরে বছর ঘুরে ঘুরে এসেছে পাঁচ মেয়ে— সুধা, সুমা, সুজাতা, স্নেহা আর নেহা। কাজের লোকজনও বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় পাঁচ-ছয়জন হয়েছে। সুতরাং এতগুলো মানুষের খাওয়া দাওয়ার বিলিব্যবস্থা করতে সারাদিনই প্রায় সংসারের কাজে কেটে যায় সাবিত্রীর। দেওকি দেখাশুনা করে মেয়েদের। ফলে মেয়েরাও বেশী জানে দিদিমাকেই। অসুখ-বিসুখ হলেও তারা মায়ের চেয়ে নানী-র ওপরই বেশী নির্ভরশীল। দেওকির নিজের তেমন লেখাপড়া নেই। নিতান্ত অক্ষর পরিচয়ের গণ্ডিটুকু কোনো রকমে পার করেছিল সে। কিন্তু চর্চার অভাবে আজ সেটুকুও ভুলে বসেছে। ফলে এ বাড়ীতে লেখাপড়ার কোনো আবহাওয়াই নেই। চিরঞ্জি নিজেও যে বিশেষ পড়াশুনো করেছে এমন নয়। যে বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ তার শুরু হয়েছিল— তারই মধ্যে আরো নানা সদ্‌গুণের পাঠও সে ধরে নিয়েছিল। ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই বিড়ি, সিগারেট এবং সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পৌঁছানোর মধ্যেই বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ জায়গায় যাতায়াত তার শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন তার কতই বা বয়স? বড় জোর চোদ্দ কি পনেরো। অল্প অল্প মদ ধরেছিল কুড়িতে পৌঁছানোর আগেই। ত্রিশ বছর বয়সে নিয়মমাফিক বিবাহিত জীবন শুরু করার ঢের আগে থেকেই ঐ জীবনের স্বাদ তার বহুবার নেওয়া হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। এমনকি, পাঁচ মেয়ের জন্মের পর পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে এখনো মাঝে মাঝে তার নতুন নারীসঙ্গ না হলে চলে না।

সকাল থেকেই আজ প্রচণ্ড গরম। এখন সবে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি। ঋতু হিসাবে এটা বসন্তকাল। কিন্তু এখনই আশেপাশের পুকুরগুলোয় জল কমতে শুরু করেছে। মাঠগুলোতে বীজধান ফেলা হলেও ধানের চারাগাছগুলো যথেষ্ট জলের অভাবে এরই মধ্যে কিছু কিছু শুকিয়েও যেতে বসেছে। কাছাকাছি যে খালটা ছিল— কোশি নদীর জলই ছিল যেগুলির একমাত্র সম্বল— সেই খালেও জল এখন প্রায় তলানীতে ঠেকেছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলিতে স্থানে স্থানে সবুজের স্পর্শটুকু বাদ দিলে বাকি সবটাই পিঙ্গ লাভ ধূসর। জমির বিভাজক আলগুলো রুক্ষ শিরদাঁড়ার মতো মাঠের শরীরের ওপর এঁকেবেঁকে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে। কোথাও একটা দুটো শিমূল গাছ, নিষ্পত্র, শাখাপ্রশাখা মাত্র সার। ঐ গাছে কোনোদিন সবুজের সমারোহ অথবা রক্তিমতার উচ্ছ্বাস জাগতে পারে— তা যেন আজ ভাবাই যায় না।

নিজের ঘরে বসে একা একা বিশাল একটা কাঁথা সেলাই করছিল দেওকি। উঠোনের ওপাশে একসারি মাটির ঘর, খাপরার চাল— এগুলো চিরঞ্জির বাবা— ঠাকুর সুখরামের আমলের। এখন ঐ ঘরগুলোয় সংসারের যত সব অপ্রয়োজনীয় জিনিসের গুদাম। সুজাতা আর সুমা ওরই মধ্যে খুঁজছিল কিছু। যদি খেলার মতো পুরোনো জিনিস কিছু পাওয়া যায়। নিতান্ত আটপৌরে জামা প্যান্ট ওদের পরণে। ধনী পিতার সন্তানের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যাবে না ওদের পোশাকে। ওদের বাবার মতে মেয়েদের জন্যে বেশী অর্থ ব্যয় করা অর্থহীন। স্নেহা আর নেহা দিদিমার পাশে মেঝের ওপর বসে দেখছিল তার সেলাই করা। অনেকক্ষণ পরে তাদের দিকে নজর পড়ে দেওকির। এক মুখ হাসি তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে শুধায়— "এখানে বসে কি করছিস তোরা? তোদের মা কোথায় রে?"

চুপ করে থাকে নেহা। স্নেহা জবাব দেয়— "মা বলেছে নানীর কাছে বসে থাক্। খাবার হলে ডেকে নেবো।" হাসলো দেওকি। সে জানে, খাবার তৈরী হলে প্রথমে তা খাবে জামাই চিরঞ্জিলাল। কিছুটা খাবে, কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যাবে বন্ধুবান্ধবদের জন্যে। আজ ভোর থেকেই সে সবের তোড়জোড় চলছে। সে সদলবলে যাত্রা করবে মুঙ্গেরের দিকে। তারপর সেখান থেকে জামালপুরে। কাটিহার থেকে নেপালের সীমান্তবর্তী গ্রাম যোগবাণীকে সংযুক্ত

BanglaBook.org

করা মিটার গেজ রেলপথ মাত্র কয়েক বছর তৈরী হয়েছে। একেবারে শেষের একটা অংশ এখনো বাকি আছে। রেলের স্থানীয় কর্তাদের ধরেছে চিরঞ্জিলাল, যদি ঠিকাদারীর কাজ কিছু পাওয়া যায়। নিতান্তই যদি সরাসরি সে কাজ না-ও জোটে, তবু অন্য ঠিকাদারের অধীনে যা হোক কিছু যোগানদারীর কাজ যদি পাওয়া যায়— এই আশা। তাদের গ্রাম আবারিয়ার পাশ দিয়ে ঐ রেল লাইন চলে গেছে। সুতরাং ভূমিপুত্র হিসাবে তারও যে একটা অধিকার আছে সেটাই সে সাব্যস্ত করার জন্যে জামালপুরে যাচ্ছে। আপাতত জামালপুরেই রেলের সদর দপ্তর। তবে, মুঙ্গের যাবার একটা অন্য উদ্দেশ্যও আছে। মুঙ্গেরে গঙ্গা বেশ চওড়া। দু-চারদিন গঙ্গার ওপরে বজরা নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মজা করা যাবে। আজই সকালবেলা রওনা হবে চিরঞ্জি, তারই প্রস্তুতি চলছে রান্নাঘরে।

স্নেহাকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে দেওকি। তখন আলুর পরোটা তৈরী করছিল সাবিত্রী। একজন দাসী পরোটাগুলো বেলে দিচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেওকি বলে— "বাচ্চাগুলো সকাল থেকে খালি পেটে ঘুরছে, কেমন মা তুই সাবি? এদের জন্যে দু-চারখানা পরোটাও আগে করে দেওয়া যায় না?" ঝাঁঝিয়ে ওঠে সাবিত্রী। বলে, "কার জন্যে আগে করলে কে যে খুশী হবে, তাই তো জানি না। সেই কোন্ সকালে উঠে কাজে হাত দিয়েছি, তবু কাউকে খুশী করতে পারি না। সব আমার শত্তুর, সব, সব।"

—"যে বাপ মেয়েদের দেখে না, বৌকে মানুষ বলে মনে করে না, তার জন্য এত সোহাগ না-ই দেখালি! সে তো তোকে বাচ্চা বিয়োনোর কাজে লাগিয়ে রেখেছে। একদিনের জন্যে বৌ বলে কিছু একটা এনে দিয়েছে? আগে তুই তোর বাচ্চাগুলোর মুখে খাবার দে। জামাইয়ের একটু দেরী হলেও চলবে।"

জামাইয়ের ওপর ভীষণ চটা দেওকি। এমন চটা কিন্তু সে গোড়া থেকে ছিল না। নিজের চোখের সামনে মেয়ের এমন হেনস্থা তার আর যেন সহ্য হয় না। তাছাড়া, জামাই যতই কেন কাজ বলে বাইরে যাক না, দেওকি জানে, তার মধ্যে মজা মারাটা একটা বড় ও প্রধান কাজ তার। তাই আরোই চটে থাকে সে চিরঞ্জির ওপরে।

খাবার আসতে দেরী দেখে চিরঞ্জিলাল নিজেই ঢুকে পড়েছে রান্নাঘরে। "এখনও খাবার তৈরী হয়নি? কি বলেছিলাম আমি? বলিনি সকাল আটটার মধ্যে আমি বেরিয়ে যাবো?" প্রায় চিৎকার করে কথাগুলো বলে সে।

BanglaBook.org

—"আস্তে আস্তে একটা দুটো করে পরোটা ভাজতে তো সময় লাগবেই। সাবির হাতে তো কোনো যাদু নেই যে, কাঠি ছোঁয়ালেই খাবার তৈরী হয়ে যাবে।" ঠাণ্ডা হিম কণ্ঠে জবাব দেয় দেওকি। ততক্ষণে একটা ছোট রেকাবিতে একখানা পরোটা নিয়ে খেতে বসে গেছে স্নেহা। হঠাৎ পা দিয়ে থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় চিরঞ্জিলাল। চিৎকার করে বলতে থাকে— "আমি সকাল সন্ধ্যে খেটে মরবো, আর আমার পয়সায় বাড়ীসুদ্ধ লোক গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবে? আমার জন্যে সময়মত খাবার তৈরী হবে না?"

এতক্ষণ অনেকটা চেষ্টা করেই স্থির হয়ে ছিল দেওকি । এবার আর তার সহ্য হলো না। সেও চিৎকার করে বলে ওঠে— "রোজগার তো সব মরদই করে আনে। বাড়ীর মেয়েছেলেরা কবে আবার রোজগার করতে বার হয়? তুমি কি চাও আমার মেয়ে নিজের ভাত জোগাড় করতে নিজে বার হবে? তাতে মান থাকবে তোমার? খাবার তৈরী হতে দেরী হচ্ছে তো বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। তোমার মাতাল ইয়ারবন্ধুদের জন্যে পেটের মেয়েকে উপোসী রেখে সাবি খাবার করতে পারবে না। এই আমি শেষ কথা বলে দিলাম।"

এতটা ভাবতে পারেনি চিরঞ্জি। এ বাড়ীতে এতকাল তার কথার ওপরে কেউ কথা বলেনি। সাবিত্রী তো নয়ই, এতকাল দেওকিও কিছু বলতে সাহস পায়নি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে পরক্ষণেই সে বলে— "আমার সংসারে আমার ওপর কথা বলার সাহস তোর হয় কি করে? এ বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছি বলে জামাইয়ের ওপর চোখ রাঙাবি তুই? বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে। হাভেলির আশেপাশে তোকে দেখলে দারোয়ান দিয়ে দূর করে দেবো।"

তারপর এগিয়ে এসে সাবির চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে বলে— "তোর মায়ের সঙ্গে তোর মেয়েগুলোকে নিয়ে তুইও দূর হয়ে যেতে পারিস। আমি আবার বিয়ে করবো, যে বউ আমায় ছেলের মুখ দেখাবে— তুই এখানে থাকলে তোকে বাঁদী করে দেবো।"

মায়ের আর দিদিমার লাঞ্ছনা দেখে স্নেহা আর নেহা উচ্চৈস্বরে কাঁদতে থাকে। রাগে দুম দুম করে পায়ের আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বার হয়ে গেল তাদের জন্মদাতা ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী।

ছড়িয়ে পড়া থালা আর পরোটার টুকরোটা কাঁদতে কাঁদতে আবার মেয়ের হাতে কুড়িয়ে তুলে দেয় সাবিত্রী। হাউ হাউ করে একই সাথে কাঁদছিল দেওকি নিজেও।

BanglaBook.org

"আমি আজই চলে যাব আমার শ্বশুরের ভিটেয়। এত অপমান সহ্য করে এখানে পড়ে আছি শুধু তোর জন্যে, সাবি, শুধু তোর জন্যে। নাহলে কবেই চলে যেতাম। তোর যেন ছেলে না হয় সাবি। তাহলে সে-ও তো হবে তার বাপের মতো, নীচ, স্বার্থপর আর শয়তান। জামাইয়ের মায়েরও তো ছেলে হয়েছিল— কিন্তু কেমন ছেলে জন্ম দিয়েছিল তার মা? তোরও তো এই হবে!"

আকুল হয়ে কাঁদছিল দেওকি। নেহাকে বুকে নিয়ে সাবিত্রীও ছোট্ট একটি বালিকার মতো মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে এই অপমানের জীবন থেকে যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিল।

জামাইয়ের সংসারে থাকতেআসাটা যে তার মস্ত একটা ভুল হয়েছিল— সেটা এতদিনে বুঝতে পারছে দেওকি। দিনের পর দিন এ বাড়ীতে তার, সাবিত্রীর, সাবিত্রীর পাঁচটা মেয়ের— কারো জীবনই যে সুখে থাকছে না— সেটা আজকের মতো এমন করে আর কোনোদিন তাকে বুঝতে হয়নি। অথবা বুঝেও আর কোনো পথ খোলা নেই বলে দেওকি চলে যেতে পারেনি। কিন্তু আজ দেওকি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে— এখান থেকে চলে যাবে সে। সাবিত্রী বা তার মেয়েদের তো কোনো উপায় নেই। ধরে মারলেও তাদের এখানে পড়ে থাকতে হবে পেটের দায়ে। কিন্তু দেওকির তো শ্বশুরের একটা ভিটে এখনো রয়েছে। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চাল যা নষ্ট হয়ে গেছে তা সারিয়ে নিলে মোটামুটি তার চলে যাবে। পেট না চললে লোকের বাড়ী রান্নার কাজ করলে পেটের ভাতের জোগাড়ও হয়ে যাবে। লোকের বাড়ীতে কাজ করলে তার নিজের যত না অসম্মান তার চেয়ে ঢের বেশী বদনাম হবে জামাই চিরঞ্জিলালের। ঠাকুর চিরঞ্জিলালের শাশুড়ী লোকের বাড়ীতে কাজ করে— বেশ জোর একটা ধাক্কা দেওয়া যাবে জামাইকে। লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবে না জামাই। একটা প্রতিহিংসার মতো মনের ভাব তৈরী হয় দেওকির।

চিরলঞ্জিলাল কবে ফিরবে কেউ জানে না। আজই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে দেওকি। অবশ্য জিনিসপত্র বলতে গোটা তিন চার শাড়ী, গামছা, একটা পাটি, একটা চাদর, একটা বালিশ। বাড়ী ছেড়ে চলে আসার সময়ে তার বাসনপত্রগুলো পড়শী যমুনার কাছে রেখে এসেছিল। তখন কিছু না ভেবেই বলেছিল— "যমুনা বোন, জামাইবাড়ী কেমন কাটবে জানি না। এগুলো তোর কাছে রেখে গেলাম। দরকার হলে ব্যবহার করিস।

BanglaBook.org

যদি কোনোদিন ফিরে আসতে হয়, তখন ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। না হলে এসব তোরই হয়ে গেল।"

কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবেনি দেওকি, যে চলে যাবার ১৩-১৪ বছর বাদে আবার তাকে ফিরে আসতে হবে শ্বশুরের ভিটেতে। মাকে এভাবে ছেড়ে দিতে মোটেই সম্মত ছিল না সাবিত্রী। কিন্তু তার জোরই বা কোথায় এ সংসারে? তার স্বামী এই এত বছরে এরকম চরম ব্যবহার তার মায়ের সঙ্গে কখনো করেনি। উভয়েই উভয়ের ওপর যে মোটেই সন্তুষ্ট নয়— এ কথাটা জানা থাকলেও এমন অশালীন ঘটনা যে মেয়েদের সামনে একদিন ঘটে যাবে— সেটা কখনো ভেবে দেখেনি সাবিত্রী। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের জিনিষসগুলো গুছিয়ে দিচ্ছিল সে। প্রায় পনেরো বছর আগে পড়শীর ঘরে রেখে আসা বাসনপত্র ফিরে পাবার আশা আর যেই করুক, সাবিত্রী করে না। তাই একজনের রান্না করার মত কিছু বাসন নিজের সংসার থেকেই তুলে দিল সে মায়ের জিনিসপত্রের সঙ্গে। একবার মনে করেছিল চিরঞ্জিলাল ফিরে এলে তবেই মায়ের যাওয়াটা ভালো। কিন্তু আবার নতুন কোনো ঘটনার আশঙ্কায় সে সাহস তার হলো না। বাড়ীর ঠিকে ঝি সরমা বলেছিল— "তোমার মাথা খারাপ বলে তুমি উঠেছিলে মেয়ের সংসারে। নিজের ঘরদুয়ার ছেড়ে এসে এমন ভুল কেউ করে? আজ তো সেই চলে যেতেই হচ্ছে। শুধু রয়ে গেল মাঝের এই অশান্তিটুকু।"

সত্যিই, আগে যতই অশান্তি হোক না কেন, আজকের মতো এমন 'তুই তোকারি' শুনতে হয়নি তাকে এর আগে। এত সবের পরে আর এখানে থাকা যায় না। এই সত্যটুকু বুঝতে দেওকির লেগে গেল প্রায় তেরো বছর।

একটা এক্কা গাড়ী ডেকে আনা হয়েছে। পুঁটুলিগুলো তাতে তুলে দিল সরমা। বাইরে রাস্তায় আসা নিষেধ সাবিত্রীর। অন্দরের দুয়ারে অপরাধীর মতো নিথর দাঁড়িয়ে আছে সে। মেয়েগুলো তখনো তাদের নানীর হাত ধরে কাঁদছে। হঠাৎ এই মুহূর্তে মনের ভিতরটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে দেওকির। পিছনে কি সে ফেলে এলো, সামনে কেমন হতে চলেছে তার নিঃসঙ্গ একক জীবন— এ সমস্ত কিছুই আর আজ তার চিন্তায় আসছে না। চলে যাবার আগে জামাইয়ের সাথে দেখা হওয়াটাও তার উচিৎ ছিল কিনা— কিছুই সে এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুধু সাবিত্রীর হাতটা ধরে নিমেষের জন্যে কেঁদে ফেলে দেওকি। তারপর শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে মেয়ের চিবুক স্পর্শ করে ধরা গলায় বলে— "তোর সংসারে

BanglaBook.org

ভালোমন্দ নিয়েই তুই থাক, সাবি। আমি মা হয়েও তো তোর সুখ তৈরী করে দিতে পারিনি। দেখ্, যদি এখন থেকে নিজের সুখ তুই নিজে করে নিতে পারিস।"

বাড়ীর কাজের লোকেরা ততক্ষণে একজন দুজন করে এসে গেছে। তারা এসব ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ভোর ভোর এসে কাজ করে দিয়ে তারা চলে যাবার পর এত কাণ্ড হয়ে গেছে। অবাক চোখে তারা নীরবে চেয়ে রয়েছে দেওকির দিকে। নিজে থেকে দেওকি কোনো কথা তাদের বললো না। একজন জিজ্ঞাসা করলো — "মা কি তীর্থে যাচ্ছেন? কিন্তু সঙ্গে যাচ্ছে কে?" কোনো জবাব দিল না দেওকি। এক্কা গাড়ীর গাড়োয়ান ব্যস্ত হচ্ছিল। ঘোড়াটার মুখে একটা ঘাসভর্তি চটের থলি বাঁধা ছিল। সেটাকে খুলে একবার অস্থির দৃষ্টি মেলে বুঝিয়ে দিল— তার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দেওকিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল গাড়ীটা। গ্রামের ধুলো ভরা পথে, কোশি নদীর কোল দিয়ে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার ঠুং ঠাং আওয়াজ তুলে এগিয়ে চললো এক্কা গাড়ীটা। পিছন দিকেই বসে ছিল দেওকি। কিন্তু তবু সে দ্রুত অপসৃয়মান চৌধুরী হাভেলির দিকে একবারও দৃষ্টি মেলে তাকালো না।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

এবারে পাঁচদিন পর ফিরে এসেছে চিরঞ্জিলাল। জামালপুরের কাজটা হয়নি। রেলের যে অফিসারের সাথে চুক্তি করে কাজটা করার কথা ছিল — সে অস্বাভাবিক একটা অংকের টাকা চেয়ে বসলো। অতটা না হলেও, অনেকটা পর্যন্ত এগিয়েছিল চিরঞ্জি। কিন্তু লোকটা অসম্ভব একগুঁয়ে ও জেদি। ফলে ফিরে আসতে হয়েছে শূন্য হাতেই। মুঙ্গেরের নৌকাবিহারটাও এবার আশানুরূপ হয়নি। মুঙ্গেরের ইংরাজ কালেক্টর নতুন নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। বজরায় মেয়েমানুষ নিয়ে গানবাজনা বা মদের আসর বসানো যাবে না। পাটনা থেকে মোটা টাকার ব্যবস্থায় নিয়ে আসা বাঈজিকে শেষ পর্যন্ত আধা টাকায় ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। এমন করে ইয়ার দোস্তদের কাছে এর আগে বেইজ্জত হতে হয়নি ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরীকে। "শালা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে পূর্ণিয়া জেলায় পেলে দেখে নিতাম।" দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল চিরঞ্জি। চোট পাওয়া বাঘের মতো তখন তার অবস্থা।

BanglaBook.org

বাড়ী ফিরে ঘোড়াগাড়ী থেকে নামবার আগেই দারোয়ান শের সিংয়ের কাছে শুনেছে মাইজী চলে গেছেন। কেন চলে গেছেন, কবে, কখন চলে গেছেন — সে সব প্রশ্ন কিছু না করে সোজা অন্দরের দিকে চলে গেল চিরঞ্জিলাল।

ভিতরে ঢোকার মুখে মেয়েরা বাপকে দেখে এক অজানা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে ছুটে চলে গেল মা কোথায় আছে দেখতে। কিছুটা আন্দাজ করেছিল চিরঞ্জি। সেদিন তার চলে যাবার আগের মুহূর্তে যে সব ঘটনা ঘটেছিল— মাঝের সময়টাতে তার কিছুই চিরঞ্জির মনে ছিল না। এতদিন বাদে বাড়ীতে ফিরে আবার সব কিছু যেন চলমান ছবির মতো হয়ে তার সামনে এসে হাজির হলো। না, কোনোরকম অপরাধবোধ তার নেই। বনিবনা হচ্ছে না? বেশ, সোজা হিসাব — যে যার নিজের জায়গায় চলে যাও। আর কোনো গোলমাল নেই। ঝগড়াঝাঁটি? গালমন্দ? এক জায়গায় কটা বাসন থাকলেও তো ঠোকাঠুকি হয়। চিরঞ্জি স্থির করে নেয় — সাবিত্রী কিছু না বললে নিজে থেকে সেও কিছু জানতে চাইবে না।

স্বামীকে আসতে দেখে ধীর পদে এগিয়ে সামনে আসে সাবিত্রী। প্রথমে কোনো কথা বললো না সে। বৈঠকখানা ঘরে একটা চারপাইতে বসে গলার চাদরটা হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল চিরঞ্জিলাল। সাবিত্রীকে দেখে নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো— "বাড়ীর সব খবর ভালো তো?"

এক মুহূর্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফুঁসিয়ে ওঠে সাবিত্রী। স্বামীকে ছোবল দিতে সে ছাড়ে না। বলে— "আপনি না থাকলেই বাড়ীর খবর সব ভালো থাকে। এবারও সব ঠিক আছে। আপনি আরো কদিন দেরী করে এলে খবর আরোই ভালো হতো। আমোদ আহ্লাদ সব এত শিগ্গিরি শেষ হয়ে গেল?"

পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় চিরঞ্জিলালের। বাড়ীতে ঢোকার পর দেওকির চলে যাবার খবরটা মোটামুটি বুঝেও সে ঠিক করেছিল, মেজাজটা কিছুতেই খারাপ করবে না। কিন্তু স্ত্রীর এই খোঁচা দেওয়া কথাটা সহ্য করতে পারলো না সে। স্ত্রীর গলাটা সজোরে দুহাতে চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে চিরঞ্জিলাল— "তোর গলা ঠিপে শেষ করে দেবো। আমাকে অপমান করা, যত ভাবি কিছু বলবো না .....।"

চিরঞ্জি ভেবে দেখেনি এসময়ে বাড়ীর কাজের লোকেরা রয়েছে। মেয়েরাও ছুটে এসেছে চিৎকার করতে করতে। তার দুহাতের মধ্যে দিয়ে মূর্চ্ছিতাপ্রায় সাবিত্রীর দেহটা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে হঠাৎ দুলে

BanglaBook.org

উঠলো গোটা হাভেলিটা। ঝোলানো আলোগুলো দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো এদিকে ওদিকে দুলছে। দুটো বড় আলমারি দেওয়ালে দাঁড়ানো জায়গা থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে সশব্দে। হাভেলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান শের সিং হঠাৎ দেখতে পেলো, কোশি নদীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা যেন আর সমান নেই। ঢেউ তুলে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে জলের স্রোতের মতো। ধান কেটে নেওয়া মাঠের জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফাটল তৈরী হয়ে সমস্ত মাঠটাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সেইসব বড় বড় ফাটলের মধ্যে দিয়ে ফুঁসে বেরিয়ে আসছে গরম জলের ফোয়ারা। মাঠের কিনার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি খাপরার ঘর আর কয়েকটা পাকা বাড়ীকে কে যেন এক লহমায় অদৃশ্য একটা বড় ক্ষুর দিয়ে চেঁছে মাটির সাথে সমান করে দিল। কোনো কিছু বোঝার আগে চৌধুরী হাভেলির সম্মুখভাগের অংশটি হুমড়ি খেয়ে দোতলাসুদ্ধ এসে পড়লো দু'মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের ওপর।

চিৎকার করতে করতে ছুটে ভিতরে যাবার চেষ্টা করলো শের সিং। কিন্তু অন্দরে ঢোকার আগেই অন্দরমহলের ছাদের সামনের দিকটা ভেঙে পড়ে তার ভিতরে যাবার পথটাকে রুদ্ধ করে দিল! ভিতরে কে কি অবস্থায় আছে তা বুঝবার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো শের সিং।

১৯৩৪ সালের বিহারের সেই মহা ভূমিকম্পে অনেক মানুষকেই সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। বাড়ীঘর, অর্থসম্পদ, আপনজন — সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে বহু মানুষ। সেই হিসাবে ঠাকুর চিরঞ্জিলালকে বড় রকমের একটা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়নি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে দুই কন্যা স্নেহা আর নেহা। আর হারিয়ে গেছে সাবিত্রীর মা দেওকি। হাভেলির বেশ কিছুটা ধ্বসে গেলেও বেশীর ভাগটাই ছিল অটুট। সাবিত্রী আর তার তিন মেয়েকে আহত অবস্থায় তুলে এনেছিল উদ্ধারকারীর দল। হাসপাতালে পাঁচ দিন থেকে বেঁচে ফিরেছে তারা। অক্ষত ছিল শুধু চিরঞ্জিলাল নিজে। ঘটনা ঘটে যাবার পরে আজ চোদ্দ বছর পর্যন্ত সেই স্মৃতি ভুলতে পারে না ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। ভেঙে পড়া হাভেলির অংশগুলোকে আবার নতুন করে তৈরী করেছে সে। গত চোদ্দ বছরে কোশি নদীর গতিপথে অনেক জল বহে গেছে। দেশের ইতিহাস ভূগোলেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেকখানি।

BanglaBook.org

ইংরাজরা এদেশকে স্বাধীন করে দিয়ে ফিরে গেছে নিজের দেশে। স্বাধীনতার বিনিময়ে ভারতবাসীকে মূল্য দিতে হয়েছে এ দেশের দুই প্রান্তের দুই টুকরোকে অন্য নামে, অন্য জাতের হাতে তুলে দিয়ে। তবু জীবন থেমে নেই; থেমে থাকে না। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। প্রায় ৬০ বছর ছুঁই ছুঁই ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরীর আজ অন্য রূপ। পেশী শিথিল হয়ে গেছে, মাথার ক্ষয়িষ্ণু কেশরাশির অর্ধেকটাই সাদা, যৌবনের সেই উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক কারণে হারিয়ে গেলেও আজও কিছু কিছু পুরানো অভ্যাসের জন্য মাঝে মাঝে অস্থির হয় চিরঞ্জিলাল চৌধুরী।

চৌধুরী হাভেলির আশেপাশেও পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক কিছুর। কোশি নদীর গতিপথ আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। প্রতি বছরই স্পষ্ট বোঝা যায় নদী সরছে। এপাশে নতুন করে চর জাগছে— ওপাশের ধানের আর মকাইয়ের ক্ষেত চলে যাচ্ছে জলের মধ্যে। এপাশের চরে কিছু কিছু জায়গায় আখ লাগিয়েছে কৃষকেরা। দোকানদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায় কৃষকদের। নতুন জেগে ওঠা নদীবক্ষের অধিকার নিয়ে দুই একবার রক্তারক্তিও হয়ে গেছে। নতুন নতুন মানুষ এসেছে। নতুন নতুন বাড়ী, দোকান বাজার বসে গেছে হাভেলির সামনে, দুপাশে কোশি নদীর কিনারে যাবার পথের উভয় পাশে। এখন আর হাভেলির ফটকে দাঁড়ালে দেখা যায় না, কোশির জলধারা। দু-একটা দোকান টপকে, ডাইনে বাঁয়ে দুবার ঘুরে, অন্তত কয়েক মিনিট হাঁটলে তবে চোখে পড়বে নদীটাকে।

দূরের জমিগুলোতে এখন আর নিয়মিত খাজনা আদায় করতে যায় না চৌধুরী। লোক পাঠিয়ে যতটা যা আদায় হয়। ব্যবসাগুলোর অবস্থাও সেইরকম। তবে মাঝে মাঝে সেগুলো সে নিজে গিয়ে দেখাশুনা করে। মনের মধ্যে তার আজও একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে পুত্রসন্তান না হওয়ার। কিন্তু চেষ্টা তো করেছিল সে। পাঁচ পাঁচবারই কন্যাসন্তান দিয়েছে সাবিত্রী। পুত্র থাকলে এতদিনে ২৫-৩০ বছর বয়েস হয়ে যেত তার। বাপের পাশে পাশে থেকে দেখতে পারতো জমিজমা, ব্যবসা। বংশ রক্ষাও হতো। কিন্তু এখন আর এসব ভাবার কোনো অর্থ হয় না।

সাবিত্রীর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। শরীর ভারী হয়ে গেছে। হাত-পা আগের মতো চলে না। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাতব্যাধি ধরেছে। তার নিজের কাজের জন্য বেশীর ভাগই নির্ভর করতে হয় বেতনভোগী দাসদাসীর ওপর। বিহারের ভূমিকম্পের পরেও স্বামীর অত্যাচার তার রাতের ঘুমকে নষ্ট করে

BanglaBook.org

দিতো। স্নেহা আর নেহার মৃত্যুর পরেও ক্রমাগত চেষ্টা করেছে চিরঞ্জিলাল একটা পুত্রের জন্যে। এর পিছনে তার কামুক চরিত্র না, বংশ রক্ষার তাগিদ — তা জানে না সাবিত্রী। পুরানো অভ্যাসটা হয়তো ভুলতে পারেনি স্বামী। কিন্তু নিজের অক্ষমতা অথবা ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্যে কিছু বলতে পারতো না সাবিত্রী। হাত পায়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রচণ্ড ব্যথার জন্য একজন দাসীকে ঠিক করেছে সে। গুলাবী সুন্দরী না হলেও তাকে ঘিরে যে কোনো পুরুষের একটা দুর্দান্ত দেহজ আকর্ষণ জেগে থাকে। বিশ বছরের গুলাবী শ্যামলী, কিন্তু সুগঠনা। প্রাণোচ্ছলা এই তরুণীটি মন হরণ করে নিয়েছে সাবিত্রীর। সাবিত্রীর ঘরে কোনোকালেই দিনের বেলা প্রবেশ করতো না চিরঞ্জিলাল। নতুন করে তৈরী দোতলার একেবারে শেষের ঘরটায় সাবিত্রী থাকে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকের প্রথম ঘরটা চিরঞ্জিলালের। তার পাশে পরপর তিনটি ঘরের মধ্যে দুটি রাখা আছে মেয়েদের জন্যে। বাপের বাড়ীতে তারা তিন জন এক সঙ্গে কখনো আসে না। দৈবাৎ যদি দুজনে একসাথে এসে যায় তাই দুটি ঘর এজন্য বরাদ্দ। তৃতীয়টি সাবিত্রীর পূজার ঘর। এঘরেও আসে না স্বামী চিরঞ্জিলাল।

গুলাবীকে এই চৌধুরী হাভেলিতে এনেছে রঘুনাথ। বছর পঁচিশের এই শ্যামলা সুঠাম ছেলেটি বলিষ্ঠ এক জোয়ান। আরারিয়া স্টেশনের কাছে একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করে সে। একবার তারই মোটর ভাড়া নেওয়া এক উত্তরপ্রদেশীয় মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গিনী গুলাবীর সাথে পরিচয় হয়েছিল তার। সেও আজ থেকে বছর দুই আগে। লোকটা চাকরীর খাতিরে ট্যুরে পূর্ণিয়াতে এলে রাত কাটাতো গুলাবীর সঙ্গে। তারপর গুলাবীর বেসামাল অবস্থা করে দিয়ে একদিন ভেগে যায় সে। সেদিন এই রঘুনাথই আশ্রয় বলো, চিকিৎসাই বলো — সব করেছিল গুলাবীর জন্যে।

গুলাবীর বাপের দুই বিয়ে। প্রথম মায়ের দ্বিতীয় সন্তান গুলাবী। বড় দিদি একটা আছে — বিম্‌লি। বছর ত্রিশ বয়েস। বিয়ে হয়ে চলে গেছে রাজমহলে। ওর স্বামী কন্ট্রাকটর। সৎমা জান্‌কী বয়সে গুলাবীর দিদির চেয়ে সামান্যই বড়। তার একটা বছর আটেকের মেয়ে আছে, শাম্‌লি। গুলাবীর বাবা দশরথ স্থানীয় কালী মন্দিরের পুরোহিত। সংসার চলে না বলে গুলাবীর রোজগারের দিকেই তার নজর। শীর্ণ, কৃষ্ণকায় দশরথের চোখ দুটি ধূর্ততায় ভরা। গায়ের নামাবলীটা না থাকলে তাকে দুষ্ট লোক বলে ধরে নিতে কারো অসুবিধা হয় না।

BanglaBook.org

গুলাবী রাত্রে চৌধুরী হাভেলিতে থাকে না। সকাল বেলা এ বাড়ীতে চলে আসে। সারাদিন থাকে। সন্ধ্যার মুখে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। গুলাবী আসা পর্যন্ত বিছানায় শুয়েই থাকে সাবিত্রী। ঘুম অবশ্য সেই কাকভোরেই তার ভেঙে যায়। ভোরের আধো অন্ধকার আবছায়ার মধ্যে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর এ-সংসারে বড় দায়িত্বই একটা তার শেষ হয়ে গেছে। অন্য সাংসারিক কাজকর্মের জন্য ঠিকা জনাকয় দাসদাসী আছে। কয়েকজন আছে সর্বক্ষণের জন্যে। স্বামী বেশীর ভাগ সময়েই বৈঠকখানা ঘরে অন্য লোকেদের সঙ্গে কাটায়। ফলে নিজের একান্ত কিছু ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া সাবিত্রীর অন্য কাজ বিশেষ থাকে না। বেলা প্রায় নটার সময় আসে গুলাবী। ওষুধ মেশানো তিসির তেল গরম করে সাবিত্রীর হাতে পায়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে মালিশ করে দেয় সে। তারপর গরম জলে গামছা ভিজিয়ে অতিরিক্ত তেলটুকু মুছে দিয়ে চলে গেলে বিছানা ছেড়ে নামে সাবিত্রী। বড় একটা পিতলের গ্লাসে চা এনে গুলাবী দেয় তাকে। ভিজে গামছা দিয়ে গ্লাসটাকে তার হাত থেকে ধরে নেয় সাবিত্রী।

আজ একটু দেরীই করে ফেলেছে গুলাবী। ঘরে ঢুকে দেখে তখনো মশারী তোলা হয়নি। বিছানার মধ্যেই চোখ বুজে শুয়ে আছে মালকিন সাবিত্রী। গুলাবীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে তাকালো সাবিত্রী। বল্লে— "তোর দেরী কেন রে, গুলাবী? কাল একাদশী ছিল, ব্যথায় সারারাত ঘুমাতে পারিনি। কেবলই ভেবেছি, তুই কখন এসে মালিশ করে দিবি।"

লজ্জা পেয়ে গেল গুলাবী। মশারীটা খুলে দিয়ে সাবিত্রীর পা'টা কোলের কাছে নিয়ে বললো— "কাকী, কাল মায়ের শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল। আমাকেও রাত জাগতে হয়েছে। ভোরের দিকে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল। আপনি আগে চা-টা খেয়ে নিন। মালিশ করতে তো সময় লাগবে। আজ আরো বেশী সময় ধরে তেল লাগিয়ে দেবো আপনাকে।"

গুলাবী দেরীতে আসায় যতটুকু রাগ হয়েছিল সাবিত্রীর, তার সবটুকুই চলে গেল এই মেয়েটার অকপট আন্তরিকতায়। একটু তৃপ্তির হাসি মুখে টেনে সাবিত্রী বল্লে— "যে সৎমা তোকে দু চোখে দেখতে পারে না— তার সেবার জন্যে রাত্রে ঘুমালি না? তুই পারিস বটে গুলাবী। আমি নিজে হলেও বোধহয় পারতাম না।"

— "কি করবো কাকী, আমার মা'টা ভারী বজ্জাত। বাপটাকে একেবারে কব্জা করে রেখেছে। সত্যিই, নিজের পেটের মেয়ে শাম্‌লীটাকে ছাড়া আমাদের

BanglaBook.org

দু বোনকে দেখতে পারে না সে। যাক ওসব, এখন আর কথা বলবো না। চা-টা করে এনে তেলটা উনুনে বসিয়ে দিই।"

ঘর থেকে চলে গেল গুলাবী। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই এই মেয়েটার ওপরে বড় মায়া পড়ে গেছে সাবিত্রীর। তার জন্যে এমন করে তো এ বাড়ীতে কেউ ভাবে না। স্বামী তো নয়ই। হয়তো একজন কিছুটা ভাবতো। কিন্তু সেই মা দেওকিও তো আজ চোদ্দ বছর আগে মারা গেছে। গুলাবী বয়সে সাবিত্রীর মেয়েদের সমান। তাই গুলাবীর ওপর বড় মায়া সাবিত্রীর। তাছাড়া, মেয়েটাও বড় অভাগা। জন্মের পরই ওর মা-টা মরে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বজ্জাত বাপ দশরথ একটা নতুন বউ ঘরে নিয়ে এলো। দশরথের বড় মেয়ের চেয়ে বড় জোর বছর পাঁচেকের বড়। খুকি বৌ নিয়ে সোহাগের সংসার দশরথের। মেলা থেকে টিপ, বেলোয়ারি চুড়ি আর আলতা নিয়ে আসে জান্‌কীর জন্যে। অথচ মেয়ের জন্যে কিছু না। বন্ধ ঘরে রং তামাশা, হাসাহাসির আওয়াজ শোনা যায়। পাশের ঘরে বাচ্চা বোনকে নিয়ে দশ বছরের বড় দিদি বিম্‌লি শুয়ে থাকে। ককিয়ে কেঁদে উঠলে বিম্‌লি তাকে ঘুম পাড়ায় পিঠে চাপড় দিয়ে।

গুলাবী যখন বড় হয়েছে, তখন দিদি বিম্‌লির বিয়ে হয়ে চলে গেছে রাজমহলে। ততদিনে ছোট একটা বোন হয়েছে শাম্‌লি। শাম্‌লিকে দেখাশুনার কাজ বেশীর ভাগই করতে হয় গুলাবীকে। কাজে ভুল হলে জুতো দিয়ে তাকে মারতে পর্যন্ত ছাড়ে না জান্‌কী। একটু বড় হতেই গুলাবীর সারা শরীরে উদ্ধত যৌবন এসে বাসা বেঁধেছে। বিনা অন্তর্বাসেই একপর্দা শাড়ীর শাসন অমান্য করে তার যৌবনপুষ্ট দেহটা পাড়ার বজ্জাত ছোঁড়াদেরও অস্থির করে তোলে। রাতের নিদ্ হারাম হয়ে যায় সদ্য গোঁফ ওঠা পাড়ার ছেলেগুলোর।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো গুলাবী। অন্যদিনের মতো আজও ভেজানো গামছাটা গ্লাসের তলায় ধরে চায়ের গ্লাসটা মালকিনের দিকে এগিয়ে ধরলো সে। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। এমন অসময়ে, বিশেষ করে কোনোরকম জানান না দিয়ে সাবিত্রীর ঘরে আসে না চিরঞ্জি। মালিককে দেখে থতমত খেয়ে যায় গুলাবী। কোনোরকমে গ্লাসটা খাটের বাজুর ওপরে ছেড়ে রেখে সে বলে— "আমি তেলটা উনুনে বসিয়ে দিয়ে এসেছি, কাকী। দেরী হলে জ্বলে যাবে।"

ঘর থেকে দ্রুত বার হয়ে গেল গুলাবী। কিন্তু তার আগেই সে বুঝে নিয়েছে তার উদ্ধত যৌবন যেন দৃষ্টি দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে তার বাপবয়সী

BanglaBook.org

একটা লম্পট কামুক বৃদ্ধ। বুকের কাপড়টা সামলে নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায় গুলাবী।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

পুবের জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে গায়ে লাগে রঘুনাথের। আজ ওর ছুটির দিন। সাত সকালে তৈরী হয়ে গ্যারেজ ঘর খোলার দায় নেই। মালিক হরিবিষ্ণু খারাপ লোক নয়। ভালো মেকানিক বলে রঘুনাথকে একটু তোয়াজ করে চলে সে। ওভারটাইমের টোপ ফেলে ছুটির দিনগুলোয় তাকে সে গ্যারেজের কাজে টানে না। অবশ্য ওভারটাইমের জন্য গরজও নেই রঘুনাথের। সংসারে থাকার মধ্যে এক বিধবা মা। ছেলের সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না বুড়ি। দুহাতের ওপরের অংশ জুড়ে ঘন নক্সায় উল্কি আঁকা। দুগাছা মোটা পেতলের রুলি দুই হাতে। মুখময় কুঞ্চনের রেখা। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বড় কষ্টে মানুষ করেছে ছেলেকে। চাহিদা প্রায় নেই বললেই চলে। বছরে খানতিনেক কালো ফুল আঁকা পাড়ের সস্তার মোটা সাদা শাড়ী। জামার বালাই নেই। শীতকালে একটা সুতি আর পশমে বোনা চাদরই যথেষ্ট। তার বয়সে এতটা বুড়ো হয়ে যাবার কথা নয় সত্যবতীর। প্রবল দারিদ্র্য আর জীবনের সাথে সুদীর্ঘ লড়াই করতে করতে আজ তার এই দশা।

রঘুনাথের গ্যারেজ 'আরারিয়া মোটরস্' স্টেশনের পিছন দিকে। সাইকেলে করে গেলে দশ মিনিট বড় জোর লাগে। হেঁটে গেলে আধঘণ্টা। কাজের দিনগুলোয় রঘুনাথই প্রথমে গিয়ে গ্যারেজঘর খোলে। ছোটকু, দীনু, ব্রিজ আর ধানুকা আসে বেলায়। তার আগে গত দিনের যে কাজগুলো করতে না পেরে ফেলে রেখে গেছে দীনুরা— সেগুলোতে প্রথমে হাত লাগায় রঘু। অবশ্য তার আগে কালীমাতা, গণেশ আর বিশ্বকর্মার ছবিতে ধূপ দেখায় সে। গ্যারেজের দরজার দুটি কড়ার ফাঁকে ফুলওয়ালা রামবিলাসের শালপাতার প্যাকেটে করা গুঁজে রাখা ফুলের থেকে মালাগুলো নিয়ে সে পরিয়ে দেয় ছবিগুলোতে। ধূপটা ধরিয়ে চোখ বুজে, গোল গোল করে ছবিগুলোর সামনে নাড়িয়ে সে কিছু বলে বিড়বিড় করে। তারপর ধূপটা ফটোর ফ্রেমের নীচের কোণায় চেপে গুঁজে দিয়ে চপ্পলটা আবার পায়ে গলিয়ে নেয় রঘুনাথ। রোজ এমনটাই হয়। শুধু ছুটির দিনগুলো ছাড়া। ছুটির দিনে ঐ কাজটা নিজেই করে

BanglaBook.org

নেয় হরিবিষ্ণু। অন্য কাউকে সে ডাকে না। তারপর দরজা বন্ধ করে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরে যায় সে।

রোদ্দুরটা গায়ে এতক্ষণে বেশ চড়া লাগছে। তবু বিছানা ছাড়ে না রঘুনাথ। মা বোধহয় গোরু দুইতে গেছে। দুধ নিয়ে এলে চা বসাবে। বিছানায় বসে বসেই চা-টা আয়েস করে খাবে রঘুনাথ। কান পেতে সে শুয়ে থাকে মায়ের ফেরার আওয়াজের জন্যে। রঘুনাথের অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গটা পেশীবহুল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তাতে। রোদের আলোয় হীরকখণ্ডের মতো সেগুলো চক্‌চক্ করছে। তার কালো কষ্টিপাথরের মত শরীরটায় যৌবনের যেন অবারিত আবির্ভাব। গলায় লাল রঙের কার দিয়ে ঝোলানো রুপোর বড় তাবিজটাও যেন নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে সেই উদ্ধত যৌবনের কাছে। ডান হাত দিয়ে তাবিজটাকে ভেজা বুকের সামনের দিক থেকে পিছন দিকে ঠেলেব সরিয়ে দিয়ে আগের মতই চোখ মেলে আর কান সজাগ করে শুয়ে থাকে রঘুনাথ। পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে 'রা' কাড়েনি ছেলে। মায়ের ভারী আফশোস। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় না সে। বলে— "আরো টাকা জমুক। নিজে একটা গ্যারেজ খোলার মতো টাকা হোক, তখন দেখা যাবে।"

দুধের ঘটিটা নিয়ে ঘরে ঢুকলো সত্যবতী। ছেলের বিছানার কাছে এসে এক দণ্ড দাঁড়ায় সে। দুচোখ ভরে তা রিয়ে তারিয়ে দেখে রঘুনাথের ঘামে ভেজা সুঠাম শ্যামলা দেহটাকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই ছেলেটাই একদিন ছোট্ট হয়ে তার কোলে ঘুমিয়ে থাকতো! সেদিন ঐ শিশুটা ছিল কত অসহায়। আজ সেই শিশুটাই তার দুর্দম যৌবন নিয়ে এক পূর্ণ যুবা। যে কোনো নারীর চোখে ঈর্ষণীয় শিকার! ছেলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর যেন আশ মেটে না সত্যবতীর। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল স্বামী সুরেশ যাদব। তখন রঘুনাথ সবে তার কোলে এসেছে। স্বামীর মৃতদেহ দেখতেও পায়নি সত্যবতী। পুলিশ লাশ গুম করে দিয়েছিল। অন্য লোকের মুখে সে শুনেছিল— ভাগলপুর জেলে পুলিশ দাহ করে দিয়েছিল মৃত সুরেশ যাদবের বেওয়ারিশ লাশ। তারপর থেকে লোকের বাড়ী কাজ করে, মুড়ি ভেজে, জনমজুর খেটে ছেলেকে বড় করেছে সত্যবতী। তারই চোখের সামনে অন্যের কাছ থেকে মেগে আনা জামাপ্যান্ট পরে বড় হয়েছে রঘুনাথ। বালক রঘুনাথ তারই চোখের সামনে একদিন কৈশোর পার হয়ে আজকের যুবা হয়ে উঠেছে। রঘুনাথের শরীরের প্রতিটি বাঁকই চেনা সত্যবতীর।

BanglaBook.org

স্বামীকে সে বিশ বছর দেখেনি। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে তিল তিল করে এক বালক কেমন করে দুর্দম যৌবনের দুয়ারে এসে, এক সুঠাম যুবাপুরুষে পরিণত হয়েছে।

— "চা কর মা। আজ একটু অন্য কাজে যাবো।" শুয়ে শুয়েই মাকে বলে রঘুনাথ। ঘটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সত্যবতী। চা খেয়ে তবে বিছানা ছাড়বে রঘুনাথ। জানালা দিয়ে আসা রোদ্দুরটা এখন সরে গেছে। পাশের নিম গাছটার হাল্কা সবুজ নতুন পাতাগুলো সকালের বাতাসে ঝিরঝির করছে। হাওয়ায় মৃদু দুলছে গাছটা। কচি সবুজ পাতাগুলোর স্বচ্ছতা ভেদ করে যেন রোদটা নীচে নামতে চাইছে। আকাশের একটা টুকরো যেন জানালার ফ্রেমে সাঁটা। ওখানে নীলের মৃদু আভাস। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথ। শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখাটা তার আকৈশোরের এক বিলাস।

নিজের জন্য ঘটিতে, আর ছেলের জন্যে শিরাওঠা সস্তা কাচের গ্লাসে করে চা আনলো সত্যবতী। চায়ের গ্লাসটা পাশের ভাঙা তেপায়া টুলটার ওপর রেখে ছেলের বিছানার এক পাশে এসে বসে সত্যবতী। কুঞ্চিত চর্মে আবৃত শীর্ণ আঙুলগুলো একবার ঘুরে আসে রঘুনাথের পেশল বুকের ওপর দিয়ে। মায়ের হাতটা সরিয়ে দেয় না রঘু। চোখটা বুজে রাখে। মনে পড়ে যায় আর-একজনের কথা। তার ঘরে চৌকির ওপরে পাতা শীতলপাটির ওপর শুয়ে থাকার সময়ে সে-ও এমনি করে ওর ঘামে ভেজা বুকে তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো বুলিয়ে দিত। ওকে পূর্ণিয়ার বাজার থেকে তুলে এনেছিল রঘুনাথ যাদব। বজ্জাত মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভটা ওকে বিপদে ফেলে কেটে পড়েছিল। তিন চার মাস ধরে মস্তি মেরে যখন দেখলো অবস্থা বেসামাল— তখন একদিন শেষ রাতে হোটেলে মেয়েটাকে একা ফেলে পালিয়েছিল লোকটা। তার কোনো ঠিকানা জানতো না মেয়েটা, তাই বাজারে বসে কাঁদা ছাড়া তার আর কোনো রাস্তা ছিল না।

— "তোকে চেনা লাগছে যেন? আমার গাড়ীতে তোকে একবার নিয়েছিলাম না? সেই লোকটা কোথায়, যে তোকে নিয়ে এখানে হোটেলে রাত কাটাতো?" সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল রঘুনাথ। কোনো জবাব দিচ্ছিল না মেয়েটা। শুধু কাঁদছিল অঝোরে। "তোর বাপ মা, ঘর দুয়ার— সব কোথায়? ঘরে যাবি তো বল্, পৌঁছে দিচ্ছি। এখানে পড়ে পড়ে কাঁদলে কিছু হবে?"

মেয়েটা ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল— ঘরে সে যাবে না। এ অবস্থায় ঘরে গেলে তার পুরুত বাপ তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। সৎমাও লাথি মেরে

BanglaBook.org

তাড়িয়ে দেবে। বরং কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে হাতে পায়ে ধরে সে খালাস হতে পারবে। তারপর যা হবার হবে।

সেই রকমই হয়েছিল। একবেলা ডাক্তারের চেম্বারে তাকে রেখে বিস্তর পয়সা খরচ করেছিল রঘুনাথ। কেন যে করেছিল — তা সে নিজেও জানে না। মন বলেছিল, করেছে। রঘুনাথ এমনই মানুষ। মহত্ত্ব কিনা বোঝে না। দয়া কিনা তাও জানে না। মন বলেছে করতে, করেছে। বড় সরল প্রাণের মানুষ রঘুনাথ। মেয়েটাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে কিনা সে চিন্তাও মনে আসেনি। বিপদে পড়েছে, সাহায্যের হাত যতটুকু বাড়ানো উচিৎ, ততটুকুই করেছে সে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভেবেছিল রঘুনাথ। তারপর হাতের বিড়িটায় একটা লম্বা টান দিয়ে বলেছিল — "নাঃ, তোকে রেখে দিয়ে আসি তোর বাড়ীতেই, তারপর যা হয় হবে। যদি তোকে ঘরে না নেয়, তবে আমার ঘরেই নিয়ে যাব।" বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত ধরে টেনে তুলেছিল মেয়েটাকে। তারপর একটা ভ্যান রিক্সায় করে পৌঁছে দিয়েছিল তার নিজের বাড়ীতে। আপত্তি সত্ত্বেও না বলতে পারেনি সৎমা জান্‌কী। ঘরে তুলে নিয়েছিল গুলাবীকে।

গুলাবীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো ঠাকুর চিরঞ্জিলাল। বারান্দার শেষে বাঁক নিয়ে সিঁড়ির দিকে ঘুরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল চিরঞ্জি। তারপর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো সাবিত্রীকে— "এত বেলা অবধি শুয়ে থাকিস, সংসারে কাজ নেই?"

গা জ্বালা করছিল সাবিত্রীর। যত কাজের দায় এ বাড়ীতে যেন তার একার। বাড়ীর কর্তা হিসাবে কোনো দায়ই কি নেই ওর? তাছাড়া, গুলাবীর দিকে তার অমন করে তাকিয়ে থাকাটা ভালো লাগেনি সাবিত্রীর। সাবিত্রী জানে তার স্বামীর চরিত্রের এই দিকটার কথা। প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সেও মেয়ের বয়সী কোনো যুবতী বা তরুণীকে রেয়াৎ করার মতো মানুষ নয় চিরঞ্জিলাল। এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সাবিত্রী বলে — "কাজের জন্যে তো লোক আছে। তাছাড়া বিশ বছর ধরে সংসারের জোয়াল টেনেছি। পাঁচটা মেয়েকে মানুষ করেছি। এখন আমাকে দিয়ে আর এর বেশী কিছু হবে না।" কথাগুলোর মধ্যে যতটা ঝাল দেওয়া যায়, তা দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সাবিত্রী। — "হ্যাঁ, ঐ পাঁচটা মেয়ের জন্ম দেওয়া ছাড়া ঠাকুর চিরঞ্জিলালের

BanglaBook.org

সংসারে আর তো কিছু দিতে পারিসনি। একটা ছেলে দিলে চিরদিন মাগের আঁচল ধরে থাকতাম।" চিরঞ্জির কণ্ঠেও কম ঝাঁজ নয়। — "ও মেয়েটা কে রে? কই আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। নতুন বুঝি ?"

—"আপনি দিনের বেলা আমার ঘরে আসেন যে দেখবেন? ও আমার কাজ করে। আমাকে সব কিছু করে দেয়।" উত্তর দেয় সাবিত্রী।

কি বলতে এ ঘরে এসেছিল তা আর মনে করতে পারে না ঠাকুর চিরঞ্জিলাল। শুধু অস্পষ্ট একটা 'হুঁ' শব্দ করে আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সাবিত্রী এতক্ষণে খাটের বাজুর ওপর গুলাবীর রেখে যাওয়া চায়ের গ্লাসটা দেখতে পায়। ভিজে গামছা আর দরকার নেই। চা-টা প্রায় ঠাণ্ডাই হয়ে এসেছে। ঢকঢক করে একসঙ্গে পুরো চা-টুকু গিলে ফেলে সাবিত্রী। তারপর আঁচলে মুখটা মুছে বিছানা থেকে নীচে নামে সে।

তেল গরম করে এনেছে গুলাবী। একটা মাটির থালার ওপরে গরম তেলের বাটিটা বসানো। ঘরে ঢুকে থালাসুদ্ধু বাটিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে গুলাবী ডাক দেয় সাবিত্রীকে— "কাকী, আসুন, তেলটা মাখিয়ে দিই।"

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে সাবিত্রী। মেঝেতে বসে গুলাবী বাটি থেকে গরম তেল নিয়ে দুহাতে ঘষে ঘষে সেটা মাখাতে শুরু করে সাবিত্রীর পায়ে।

— "তোর মা তোর বিয়ের চেষ্টা করছে না? তোর বয়সে তো অন্য মেয়েরা দুই তিন ছেলের মা হয়ে যায় । বিয়েতে তোর মত নেই, না, বিয়ে দেওয়ার পয়সা নেই তোর বাপের?" প্রশ্ন করে সাবিত্রী। হঠাৎ এরকম প্রশ্ন আসবে, ভাবেনি গুলাবী। অন্যান্য দিন তেল মালিশ করার সময়ে অন্যরকম কথা হয় মালকিনের সঙ্গে। আজ কেন মালকিন সাবিত্রী এসব কথা বলছে বুঝতে পারে না গুলাবী। সাবিত্রী কিন্তু জানে। কারণ এই সংসারে তার তিরিশ বছর প্রায় কেটেছে। পুরুষমানুষ চেনা হয়ে গেছে সাবিত্রীর।

—"আমার বাপটা যেন কেমন! বড় দিদির বিয়েটা যদি জামাইবাবু নিজে চেষ্টা করে না করতো, তবে বোধহয় হতোই না। রাজমহল থেকে ঠিকাদারীর কাজে আরারিয়ায় এসে জামাইবাবু দিদিকে দেখেছিল মেলায়। তারপর লোক লাগিয়ে খোঁজখবর করে বিয়েতেরাজী করায় বাবাকে। একটা পয়সা খরচা হয়নি বাবার। যজমানদের বাড়ী থেকেই কাপড় জামা এসেছিল, বাকি যা দেবার তা শ্বশুরবাড়ী থেকেই দিয়েছে। আমার জন্যে চেষ্টা করবে ঐ বাপ?"

BanglaBook.org

নিজের কলঙ্কের গল্পটা বললো না গুলাবী। ওটা তার জীবনে একটা ভুলের মাশুল। হয়তো সেই কারণেই বাপ দশরথ কোনো পাত্রর সন্ধান করে না। এ পাড়ায় সে ঘটনাটা সকলে জানে। সম্বন্ধ এলে ভাংচি দিতে পারে। রঘুনাথ যাদব এ অঞ্চলের ছেলে নয়। আগে পূর্ণিয়ায় ভাড়ার ট্যাক্সি চালাতো। সেখানেই মালিকের বাড়ীতে থাকতো, হোটেলে খেতো। মা থাকতো দেহাতে, মাটির খাপরার ঘরে। মালিক গাড়ী বেচে দেওয়াতে কাজ খুঁজতে খুঁজতে আরারিয়ায় এসে পৌঁছায়। স্টেশনের ঠিক পিছনেই হরিবিষ্ণু যাদবের মোটর গ্যারেজ। ট্রেন থেকে নেমে সেখানেই প্রথমে ভাগ্য পরীক্ষা করতে ঢুকেছিল রঘুনাথ। ট্যাক্সি চালানোর সুবাদে গাড়ীর কাজ জানতো সে। কাজ পছন্দ হয়ে যাওয়ায় রঘুনাথকে নিয়ে নিয়েছিল হরিবিষ্ণু। বলেছিল— "তুইও যাদব, আমিও যাদব। পটবে ভাল। তুই লেগে যা কাজে। আশি টাকা মাইনে পাবি। পরে টাকা বাড়াবো।"

সেই প্রথম এখানে থাকার শুরু। দেহাতের জমিজমা, ঘর বেচে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা আর বুড়ি মাকে নিয়ে আরারিয়ায় এসে ঘর নিয়েছিল সে। অনেক পরে জেনেছিল, গুলাবীর বাড়ীও এই গ্রামেই।

— "তোর বাপকে একবার বলিস, কাকী ডেকেছে। আমি ওকে বলবো। কবে ছেলে বয়সে কি হয়েছিল, তাই কি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে? তাছাড়া বুড়ো বাপ চোখ বুজলে তোর কি দশা হবে? বড় দিদির সাহায্য কিছু আশা করিস না। এখন যার যার, তার তার-এর দিন। ছোট একটা বোন আছে না? তারই বা কি হবে?"

কোনো জবাব দেয় না গুলাবী। নীরবে তেল মালিশ করে চলে সে। দাসী ময়না বলে গেল— "বাজার এসেছে, কাকী। মিশিরজী জিজ্ঞাসা করছে, আজ কি রান্না হবে।"

একটু বাদেই গুলাবীকে ছেড়ে দেয় সাবিত্রী। ওকে কাছে ডেকে বলে "কাল থেকে তুই আরো সকাল সকাল এসে মালিশ করে চলে যাবি। বেশী বেলা অবধি এখানে কাটাবি না। আর, ওবেলা আসতে হবে না। একবেলা হলেই চলবে।"

সাবিত্রী জানে, ঠাকুরসাহেব বেলা ৯টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। দৈবাৎ যদি সাবিত্রীর ঘরে আসার দরকারও হয়, তবু বেলা ১২টার আগে এদিকে আসে না। সুতরাং চিন্তা কম থাকবে সাবিত্রীর। তেলের বাটি আর মাটির থালাটা গুছিয়ে নেয় গুলাবী।

BanglaBook.org

— "বাড়তি তেলটা চানের সময় আমি নিজেই তুলে নিতে পারবো। বেলা প্রায় ১০টা বাজতে চললো। তুই এবার বাড়ী যা, গুলাবী" — বললো সাবিত্রী। কোনো জবাব না দিয়ে নীরবে ঘর থেকে বার হয়ে গেল গুলাবী।

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

বেশ বেলা করে বাড়ী ফিরেছে দশরথ। গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে যে পুরানো কালী মন্দিরটা দীর্ঘকাল ধরে এ-গ্রামের মানুষের কাছে বলতে গেলে একমাত্র দেবমন্দির— সেই দেবালয়েরই পুরোহিত দশরথ। বহুদিন আগে এ গ্রামেরই এক ঠাকুর পরিবার তৈরী করেছিল মন্দিরটা। কিন্তু কোনো কারণে ঐ ঠাকুর পরিবারের সব সদস্যই এক সময়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেকালে দেবীর পূজা অর্চনার দায়িত্ব ছিল সীতাপতি পুরোহিতের। মূল মন্দির নির্মাতা পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সময় সীতাপতিকেই দেবীর সেবার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে চলে গিয়েছিল। নিত্য সেবার জন্যে মন্দির সংলগ্ন কিছু ধানী জমি আর একটা ফুলের বাগিচা ছিল। তাছাড়া সীতাপতির পরিবারের জন্য কাঠা তিনেক বাস্তু জমিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ঠাকুর শ্রীনাথ চৌধুরী। এরপরে দুই পুরুষ কেটে গেছে। সীতাপতির মৃত্যুর পর তার ছেলে উদয়নারায়ণ পেয়েছে মন্দিরের ভার। উদয়নারায়ণের পরে এখন দেবসেবার দায়িত্ব বর্তেছে দশরথের ওপর। যে ধানী জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল দশরথ— তার অনেকটাই বর্গাদারদের দৌরাত্ম্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন যতটুকু রয়েছে, তার ভাগের ফসলে দশরথের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কুলায় না। গ্রামে কয়েক ঘর যজমান আছে। পাশের গ্রামেও দু একজন । এইসব করে কোনোরকমে চলে যায় দশরথের। বড় মেয়ে বিম্‌লির বিয়েটা কোনো ভাবে উৎরে গেছে। গুলাবী কাজ করে ঠাকুর চিরঞ্জিলালের হাভেলিতে। যেটুকু টাকা ওখান থেকে সে আনে তাতে তার নিজের খরচটুকুই হয়ে যায়। ছোট মেয়ে শাম্‌লি আর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ জান্‌কীকে নিয়ে তার যত সমস্যা। কিন্তু আয় বাড়ানোর রাস্তাই বা কোথায়?

মাথার ওপর এক আকাশ রোদ নিয়ে ঘরে ফিরে দাওয়ার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে দশরথ। হাতের পুঁটুলিটা নিতে কেউ বাইরে আসেনি ঘর থেকে। বিরক্ত, ক্লান্ত দশরথ চিৎকার করে দুবার ডাকে— 'শাম্‌লি, এই

BanglaBook.org

শাম্‌লি।' কোনো সাড়া নেই। বাস্তুর ওপাশ থেকে ঘুঘুর ক্লান্ত ঘু-ঘু রব শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-একটা দমকা হাওয়া নিম আর কলাগাছগুলোর মধ্যে হুস্ হুস্ শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে বাতাসে শীতলতার স্পর্শও নেই। তাই ঘামের ক্লান্তি যায় না। এবার একটু অধৈর্য কণ্ঠেই হাঁক দেয় দশরথ— "ঘরে কেউ নেই নাকি? জান্‌কী— এই জান্‌কী।"

সম্ভবত পিছনের খিড়কির পুকুরে চান করতে গিয়েছিল জান্‌কী। পরণের উঁচু করে রাখা ছাপা শাড়ীটা ভেজা। সর্বাঙ্গে জল, খোলা চুল বেয়ে এখনো জল ঝরছে। হাতের ঘটিটার ওপর ভেজা গামছাটা কুণ্ডলি করে জড়ানো।

স্বামীর চিৎকারেও কোনোরকম উত্তেজনা নেই জান্‌কীর। আস্তে করে হাতের ঘটিটা নামিয়ে ঘটিটা কাতকরে এক ঘটি জল দিয়ে পায়ের কাদামাটিটা ধুলো সে। তারপর গামছাটা সামনের উঠোনে খাটানো দড়িতে টেনে টেনে শুকোতে দিতে দিতে ঠাণ্ডা গলায় বললো— "বাড়ী ফিরেই চেঁচাতে শুরু করেছ? আমি ভাবলাম — বেশ কিছু চাল-ডাল, কলাটা মুলোটা, কাপড়টা গামছাটা নিয়ে বুঝি ফিরলে। হরি বলো! ঐ এক রত্তি একটা পুঁটুলি! ওতে আর থাকবে কি!"

ঘটিটা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল জান্‌কী। কাপড়টা বদলে চিরুনী দিয়ে চুলটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার বাইরে এলো সে। — "শাম্‌লি কই ? তাকেও তো দেখছি না! মেয়েটা বাড়ীতে থাকে না কেন?" হুঙ্কার দিল দশরথ।

— "কি করবে ঘরে থেকে, শুনি? ঐ তো আরেকজন ভোর হতেই বেরিয়ে চলে যায়, ঘরের কোনো কাজে দুপুরের আগে পাওয়া যায় না। কই, তাকে তো কিছু বলো না? যত দায় বুঝি শুধু আমার শাম্‌লিরই? ওকে আমি ওর সইয়ের বাড়ী যেতে দিয়েছি। বিয়ে থা সময়ে না দিলে যে কার কি হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার যজমানদের ঘরে তেমন ছেলে নেই— যে শাম্‌লিকে নিতে পারে?"

কোনো জবাব দেয় না দশরথ। কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখের আর শরীরের ঘামটা মুছে দাওয়ায় বসেই পুঁটুলিটা খুলতে শুরু করে। খানিকটা আতপ চাল, দুটো কাঁচকলা, ছোট একটা গামছা আর দুটো রুপোর টাকা। সবগুলো আবার একত্র করে নিয়ে জানকীকে বলে— "একজনকে বিয়ের লগ্ন বলে দিয়েছি, তাই প্রণাম করে এগুলো দিলো। লোকটার মেয়ের বিয়ে সামনের মাসের চার তারিখে। বলেছে, কাজটা আমাকে দিয়েই করাবে। তখন তোর আশা পুরিয়ে দেবো।"

BanglaBook.org

মুখের ভাবে কোনো আশার সঞ্চার হলো না জান্‌কীর। সে নীরবে পুঁটুলিটা ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর একঘটি জল এনে স্বামীর সামনে রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জান্‌কী। এমন সময়ে পাঁচিলের ভাঙা দরজাটায় খচ্‌খচ্‌ শব্দ তুলে ভিতরে ঢুকলো গুলাবী। খর রৌদ্রে তার শ্যামলা বরণ যেন রক্তিমাভ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। আঁটোসাঁটো করে শরীরে জড়ানো শাড়ীটার জায়গায় জায়গায় ঘামে ভেজা। ফলে তার শরীরের সমস্ত ভূগোল যেন জানান দিচ্ছে যে, গুলাবী এখনো পুরুষের চোখে সমান আকর্ষণের দাবী রাখে।

বাবাকে দেখে কষ্ট হয় গুলাবীর। এগিয়ে এসে ঘটিটা হাতে তুলে নিয়ে বাবাকে সে বলে — "তুমি ওখানেই দাঁড়াও বাবা, জলটা আমি ঢেলে দিচ্ছি পায়ে।" নীরবে একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল দশরথ। মাটিতে নীচু হয়ে বাবার পা দুটো ঘসে ঘসে ঘটির জল দিয়ে ধুয়ে দিতে লাগলো গুলাবী। ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে আবার বার হয়ে এসেছে জান্‌কী। বাপ আর মেয়ের কাজ দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠে মন্তব্য করে সে— "নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য খোঁজ নেই, উনি লগন দেখে দিচ্ছেন অন্যের মেয়ের। চোখের সামনে দু-দুটো মেয়ে রয়েছে সেদিকে নজর নেই। একজন তো অনেক কেলেঙ্কারী করে ঘরে ফিরলেন। সময়ে বিয়ে না দিলে এসব হবে বৈকি। জানি না, আমার শাম্‌লির কপালে কি আছে।"

মায়ের দিকে একবার কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল গুলাবী। তারপর বাবাকে বললো— "তুমি কিছু খেয়েছ বাবা? তোমায় একটু ছাতু মেখে দিই গুড় দিয়ে। তুমি ভিতরে গিয়ে চৌকিতে বোসো। আমি আসছি।"

খাপরার ঘর। তেতে গেছে প্রখর রৌদ্রে। ভিতরে ঢুকলে মনে হয় কারখানার চুল্লিতে ঢুকলাম। তবু ভিতরে ঢুকে চৌকির ওপর একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে দশরথ। একটা হাতপাখা নেড়ে নেড়ে নিজেই হাওয়া খেতে থাকে সে। গ্রামের এদিকটায় জনবসতি কম। এককালে মন্দিরটা ঘিরে যাদের বসবাস এখানে জমে উঠেছিল, তারা চলে যাওয়ায় এদিকে আর বসতি হয়নি। মাত্র দু এক ঘর মানুষ ঐ ফেলে যাওয়া জমির ওপর ঝোড়ার ঘর তুলে বাস করছে। তা নয়তো বেশীটাই পড়ে আছে খালি। এদিককার মাটি একটু পাথুরে, তাই চাষবাসেরও সম্ভাবনা নেই। গাছপালাও তেমন নেই। তাই গরমটা একটু বেশীই এদিকে।

— "হ্যাঁরে গুলাবী, রঘুনাথের সঙ্গে তোর দেখা হয়?" একটু সঙ্কোচ নিয়েই মেয়েকে প্রশ্ন করে দশরথ। প্রথমটায় বাপের প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা ঠিক

BanglaBook.org

ধরতে পারেনি গুলাবী। রঘুনাথ তাকে নিজে চৌধুরী হাভেলিতে নিয়ে গিয়ে কাজে ঢুকিয়েছে। নিশ্চয়ই মেয়ের দিকে তার একটু নেকনজর আছে। তা নইলে আজকের দিনে কার এত গরজ? আর তাছাড়া, যে মেয়ের নামে একবার কেলেঙ্কারীর দাগ লেগেছে, তাকে কি আর অন্য কেউ নেবে? যদি কেউ নেয় তো ঐ রঘুনাথই ভরসা। রঘুনাথ যাদব সম্প্রদায়ের। তবু কোনো আপত্তি নেই দশরথের। কোনোরকমে মেয়েটা পার হলে সে বাঁচে। বিম্‌লির কাছেও যাবার মুখ নেই দশরথের। ঐ সব ঘটনার পরে তার কন্ট্রাক্টর স্বামী বৌকে বাপের বাড়ীতে আসতে দেয় না। কেলেঙ্কারীর ছাপ লাগা পরিবারের সাথে সে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চায় না। হোক না কেন, তা শ্বশুরবাড়ী। রাজমহলে পাকা দোতলা বাড়ীতে তার সংসার। দুই ছেলে, এক মেয়ে। সকলেই কলেজে পড়ে।

— "আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সময় কোথায়, বাবা! স্টেশনের কাছে তার গ্যারেজ। চৌধুরী হাভেলি সেখান থেকে অনেক দূর। কিন্তু হঠাৎ তার কথা কেন?" প্রশ্ন করে গুলাবী।

হঠাৎ কেন যে তার কথা মনে হয়েছে, তা শুধু দশরথই জানে। বিশ বছরের জোয়ান মেয়ে একালের বিহারে বাপের গলার যে কত বড় কাঁটা— তা হয়তো গুলাবী নিজেও বোঝে। কিন্তু তবু টোপটা সহজে গেলে না সে। কাপড় আর গামছা নিয়ে পিছনের পুকুরের দিকে চলে গেল গুলাবী। মেয়ের মাখা ছাতুর বাটিটা টেনে নিতে নিতে সেই দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দশরথ। তারপর বড় একটা ছাতুর দলা গোল করে পাকিয়ে তার বিশীর্ণ, কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিত মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিল সে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় দু বছর হলো। কিন্তু এতে কি যে লাভ হলো তা বুঝতে পারে না সাবিত্রী। স্বাধীনতা পাবার পর নতুন নতুন সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে — ততই কেমন একটা হতাশার ভাব দেখা দিচ্ছে সকলের মধ্যে। গত বছর দেশের কোথায় কোথায় যেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে বলে জানতে পেরেছে সাবিত্রী। মানুষ যে খুব একটা সুখে রয়েছে বলে মনে হয় না তার। এখনই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে যথেষ্ট। এরপরে না জানি কি হবে!

সকাল থেকে বসে বসে এইসব কথা-ই ভাবছিল সাবিত্রী। সংসারের কাজ করা বেশীরভাগই সে ছেড়ে দিয়েছে। তার সর্বটা-ই যে শরীরের কারণে,

BanglaBook.org

তা নয়। সমস্ত কিছুর ওপরই কেমন একটা অনীহা হয়ে গেছে তার। অনেকটা সময়ই একা একা নিজের মনে থাকে সে। মেয়েরাও সকলে যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাদের পরিবারে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বছর বছর বাড়ছে। প্রথম প্রথম সন্তান প্রসবের জন্য সাবিত্রী আনিয়ে নিত তাদের। কিন্তু এখন আর ও সমস্ত ঝক্কি নেওয়ার মতো মন নেই সাবিত্রীর। বৎসরান্তে কখনো কখনো খবর আসে সুধা আবার মা হয়েছে। কখনো বা সুজাতা। নাতি নাতনিদের মুখ দেখার জন্য সে কাউকে দিয়ে হয়তো কিছু একটা জিনিস পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু নাতি নাতনিসহ মেয়েদের এখানে আনার মতো উৎসাহ তার হয় না। মনের কথা বলার মতন মানুষ এ বাড়ীতে কেউ নেই। স্বামী চিরঞ্জিলাল আছে, ঐ পর্যন্তই। তাকে কতটুকু নিজের কাছে দেখতে পায় সাবিত্রী? দু'এক সময়ে বলেও কোনো লাভ হয়নি। ঝগড়া বেধে যায়। আর, তারপরেই ঘুরে ফিরে আসে সেই একই কথা, "ঘরে থাকবো কিসের টানে? ছেলে আছে? ছেলের বৌ আছে? নাতি নাতনি একটা আছে? তোর মতো মেয়েকে বিয়ে করে আমি নির্বংশ হলাম।"

এসব কথা সে এত শুনেছে, এতবার শুনেছে যে সাবিত্রীর ক্লান্ত লাগে। অনেকদিন আগে একবার বড় জামাইয়ের মা তাকে বলেছিল— "ডাক্তার দিয়ে দেখালে নাকি কাজ হতে পারে। কিন্তু ডাক্তার দিয়ে কাকে দেখাতে হবে— তাকে, না তার স্বামীকে— সেটা বলতে পারেনি তার বেয়ান। বিহারের গাঁয়ের বৌ সাবিত্রী। পুরুষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে কোন্ লজ্জায় এসব বলবে সে? স্বামীকে বলবে— সে সাহস তার নেই। তাই কিছুই আর হয়নি। কিন্তু এসব দুঃখের কথা তার সকালের সঙ্গী গুলাবীকেও বলা যায় না। যদিও, গুলাবীর সাথে তার সুখদুঃখের অনেক কথা হয়। মেয়েমানুষের অনেক লজ্জার কথা থাকে। সে সব কথা মনে চেপেও যেমন রাখা যায় না, তেমনি, বলবার মতো, বলে মন হাল্কা করার মতো মানুষও সকলের থাকে না। বললে নিজেকে ছোট মনে হয়। তাই, গুলাবী চলে গেলে অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়েই থাকে সাবিত্রী। তারপর চিনিকলের বারোটা বাজার বাঁশী শুনে তবে উঠে চান করতে যায় সে। গুলাবীর মাখানো তেলের বাড়তি তেলটা সাবান আর ধুঁধুলের খোসা দিয়ে ঘসে ঘসে তুলে চান সেরে নেয় সাবিত্রী।

একটু আগে গুলাবী চলে গেছে। ঘরের দুয়ারের সামনে পা ছড়িয়ে বসে দূরের দিকে তাকিয়েছিল সাবিত্রী। সকালের যে রোদ্দুরটা সামনের লম্বা

BanglaBook.org

একহারা নিমগাছটার ছায়াটাকে পশ্চিমে লম্বা করে রেখেছিল— সেই ছায়াটা এখন যেন ভীতু কচি ছেলের মতো গুটি গুটি পায়ে আস্তে আস্তে নিমগাছটার গোড়ায় চলে আসছে। ঠিক যেমন করে দুষ্টু শিশু মায়ের কোলের কাছে পালিয়ে আসে— দূরে চলে গিয়েও। আরো কিছুক্ষণ নিমগাছটার পায়ের কাছে থাকার পরে ঐ ছায়াটা আবার রওনা দেবে পুবের দিকে। শুধু নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকবে একহারা লম্বা উঠে যাওয়া স্বল্পপত্র নিমগাছটা, একা— ঠিক সাবিত্রীর মতো। কিন্তু অমন দুষ্টু একটা শিশুপুত্র আর কখনোই সাবিত্রীর কোলে এসে আশ্রয় নেবে না। সাবিত্রী তা জানে। এই বয়সে তা আর হয় না। শরীরী আকাঙ্ক্ষা সাবিত্রীর আর নেই। এই বয়সে বোধহয় আর থাকেও না। কিন্তু ঠাকুর চিরঞ্জিলাল তো পুরুষ, পুরুষের ঐ আকাঙ্ক্ষাটা নাকি আমৃত্যু থেকে যায়। মেয়েদের মনের কথা তারা মানে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যায় সাবিত্রী। পুরুষমানুষ তার জন্মগত অধিকার চিরটা কালই মেয়েমানুষের ওপর খাটিয়ে যায়। অন্য হাজারো দুঃখের কথা, অশান্তির কথা গুলাবীকে গল্প করা যায়, কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। হাজার হলেও গুলাবী তার মেয়েদের বয়সী যে!

চিনিকলের ১২টা বাজার বাঁশী বেজে গেছে। কিন্তু তবু কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না সাবিত্রীর। উঠে হবেই বা কি ? সেই তো রোজকার একই কাজ। চান সেরে নিয়ে পুজোর ঘরে ফুল জল দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে প্রণাম করবে। তারপর এক থালা ভাত এনে দিয়ে যাবে শনিচারী। আলু বেগুনের সব্জি, অহরের ডাল, কাটা মাছের ঝোল আর টক দই। সাবিত্রী খোঁজ রাখে না কোন্ দিন কি রান্না হয়। এসব নিজের বুদ্ধিতেই করে শনিচারী। শনিচারীর বয়েস হয়েছে। মালকিন সাবিত্রীর চেয়ে ঢের বেশী। সুতরাং তার ওপরেই এসব ছেড়ে দিয়েছে সাবিত্রী। দুপুরে সকলের খাওয়া হলে নিজের ভাতটা বাড়ীতে নিয়ে যায় শনিচারী। ঘরে ছোট্ট একটা নাতনী আছে শনিচারীর, তিত্‌লি। মা মরা মেয়েটাকে বাপের কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে সে। শনিচারী যতক্ষণ চৌধুরী হাভেলিতে থাকে— ততক্ষণ তাকে দেখাশুনা করে ছোট মেয়ে ফুলমোতিয়া। ফুলমোতিয়া খুব যত্ন করে তিত্‌লিকে। তাকে চান করায়, খাওয়ায়, বিকেলে সাজিয়ে নিয়ে খাপরার ঘরের দাওয়ায় বসে বসে গাড়ী ঘোড়া, লোকজন দেখায়। লোকে বলে মা মরুক, মাসী জিয়োক। সত্যিই নিজের পেটের মেয়ের মতো করে পনেরো বছরের মাসী দু বছরের তিত্‌লিকে যত্ন করে। জামাইবাবুকে আগে থেকেই

BanglaBook.org

চিনতো ফুলমোতিয়া। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ছোট্ট স্বপ্ন কুঁড়ির মতো তার মনের তরুশাখায় ফুটে ছিল। কিন্তু বড় বোন ফুলবর্ষিয়া রয়েছে। বিয়ে হলে আগে তারই হবে। তাই.....। এখন আর ওসব মনে আনে না ফুলমোতিয়া। তিত্‌লিকে নিয়েই সময় কাটে তার। শত হলেও সুরেন্দ্রর আত্মজা তো তিত্‌লি। তিত্‌লি তো তার কোলেই আসতে পারতো!

শনিচারী ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এখনো মালকিনকে বাসী কাপড় পরে দেখতে পেয়ে সে বলে— "দেখতো কাণ্ড। আমি তোমার ভাত নিয়ে এলাম, আর, এদিকে তোমার এখনো চানও হয়নি মেয়ে? আমি বসছি, তুমি চানটা সেরে এসো। বারোটা তো কখন বেজে গেছে। গুলাবীও তো কখন তোমাকে মালিশ করে চলে গেছে। এতক্ষণ তোমার চানও সারা হয়নি — বুঝতে পারিনি আমি। তুমি চট্ করে চানটা সেরে এসো। রোগা শরীর, অনিয়ম করলে ঠিক থাকবে?"

এত দুঃখেও হাসি পেলো সাবিত্রীর । রোগা শরীর বলতে বোধহয় অসুস্থ বা রুগ্ন শরীর মনে করেছে শনিচারী। বাতব্যাধিতে হাত পা, শরীর বেশ ভারীই হয়ে গেছে সাবিত্রীর। তাই 'রোগা' কথাটায় হাসি পেলো তার। এবারে উঠে পড়ে সে। আলনা থেকে একটা শাড়ী তুলে নিয়ে কলঘরের দিকে চলে যায় সাবিত্রী। ওখানে কাজের লোকেরা সকাল থেকে জল তুলে রেখে দিয়ে গেছে তার চান করার জন্যে।

ভাতের থালাটা মেঝের ওপর রেখে একটা পাখা নিয়ে মাটিতে বসে যায় শনিচারী। অলস হাতে পাখাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাছি তাড়ায় সে। 'মেয়ে'র খাওয়া হলে তবে বুড়ি ফিরবে নিজের ডেরায়। সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ছোট মেয়ে ফুলমোতিয়া আর মা মরা নাতনী তিত্‌লি।

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।।

গরম অনেকটা কমে গেছে। বৃষ্টি পুরো বন্ধ না হলেও আগের মতো দাপট নেই। ভোরের দিকের বাতাসে ঠাণ্ডার ছোঁয়া। শিউলি গাছে এখনই একটা দুটো করে ফুল আসছে। হঠাৎ হঠাৎ শিরশিরে হাওয়ায় ফুলগুলো ঝরে পড়ে মাটিতে । আখের খেতের বিস্তীর্ণ বিস্তার পার হয়ে যেখানটায় কোশি নদী একা একা বয়ে চলেছে — সেইখানে নদীর উঁচু বাঁধের কোলে কোলে কাশফুলের শুভ্র আভাস জাগতে শুরু হয়েছে।

সকালের দিকটা সাইকেলে চেপে আসতে ভালই লাগে রঘুনাথের। রাস্তায় এখনো তেমন লোক চলাচল শুরু হয়নি। কিছুটা আনমনে সাইকেল

BanglaBook.org

চালালেও দুর্ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা নেই। এক মাথা ঘন কালো চুল, তেল দিয়ে চান করে নিয়েছে সাত সকালে। সকালের আলো তার তেল মাখা চুলে ঠিকরোচ্ছে। তার পরণে কালো রঙের প্যান্ট আর বুকের কাছে ঢাকনা দেওয়া দুটো পকেট লাগানো খাকি শার্ট। সারাদিন তেল কালি নিয়ে কাজ। সৌখিন পোশাক পরলে চলে না। দুপুরটায় ঘরে ফেরে না রঘুনাথ। স্টেশনের গায়েই একটা ভাতের হোটেল আছে। ছ'আনায় মাছ ভাত খাওয়া হয়ে যায়। ভাত খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হোটেলের বেঞ্চিতে বসে বসেই একটু বিশ্রাম করে নেয় রঘুনাথ। কোনো কোনোদিন ভরপেট খাওয়ার পরে একটা দোক্তাপান মুখে দিয়ে একটা বিড়ি ধরায় সে। বিলাসিতা বলতে ঐটুকুই। ভারী সরল প্রাণ ছেলে রঘুনাথ। মানুষের জন্যে মুখ বুজে করে যায়। কেউ তাকে মনে রাখলো কিনা তা ভেবে সময় নষ্ট করে না। গুলাবীর সঙ্গে কবে প্রথম দেখা হয়েছিল, কিংবা গুলাবীর বিপদের দিনে কেনই বা সে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে তাকে বিপদমুক্ত করেছিল, সেসব নিয়ে কোনোদিন মাথাও ঘামায়নি রঘুনাথ। কিন্তু কেন জানি না, আজ ঐ গুলাবীর কথা বড় মনে পড়ছে তার। ধীরে ধীরে সাইকেল চালাতে চালাতে তার মনে ভেসে উঠছিল গুলাবীর মুখখানা। মা সত্যবতীর কথাও মনে পড়ছিল তার। কদিন আগে চৌধুরী হাভেলির কে একজন এসে সত্যবতীকে বলেছিল ওখানে একটা কাজ খালি আছে। যে শনিচারী চৌধুরী হাভেলির মালকিনের কাছে কাজ করতো, কদিন ধরে সে খুব অসুস্থ হয়ে থাকায় ওদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। শনিচারীর বদলী একজন কাউকে আপাতত দরকার। পরে শনিচারী সুস্থ হলে তখন দেখা যাবে সে আর কাজ করবে কিনা। ছেলে রঘুনাথ ভোর ভোর বার হয়ে গেলে সত্যবতীর বিশেষ কোনো কাজ থাকে না বাড়ীতে। রঘুনাথ কাজের জায়গার কাছে হোটেলেই খেয়ে নেয় দুপুরে। বিধবা সত্যবতীকে শুধু একার জন্যে চুলা জ্বালিয়ে দুটো সিদ্ধভাত ফুটিয়ে নিতে হয়। চৌধুরী হাভেলিতে কাজের খবর পেয়ে বুড়ি জিজ্ঞাসা করেছিল ছেলেকে— "আমি যদি কদিন ওদের কাজটা চালিয়ে দিই — তবে তোর কি মান যাবে? ঘরে তো দিনভর একা একা বসেই দিন কাটে আমার। কাজটা কিছু খারাপ নয়, ভারীও নয়। তাছাড়া নগদে দুটো পয়সাও তো ঘরে আসবে। কি বলিস তুই?"

— "আমি আর কি বলব? ঘরে তো বৌ এনে দিইনি যে, তোর সঙ্গী হবে। কিন্তু লোকে যেন না বলে যে— স্বাধীনতার শহীদ সুরেশ যাদবের ছেলে তার মাকে টাকা রোজগারের জন্যে বাড়ীর বাইরে বার করেছে। মাকে

BanglaBook.org

খাওয়াতে পারে না। এমন কুসন্তান রঘু যাদব। কথা যা ঐটাই।"

কথাটা সারা রাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল সত্যবতী। হয়তো রঘুনাথও। শেষমেশ রাজী হয়েছিল দুজনেই। তবে, শর্ত একটাই। পাকাপাকিভাবে নয়। যতদিন না ও বাড়ীর কাজের লোক শনিচারী সুস্থ হয়ে আসে, ততদিন।

সাইকেলে যেতে যেতে এসব মনে হচ্ছিল রঘুনাথের। মা রাতে ছোলা আর বাদাম ভিজিয়ে রেখেছিল। খালি পেটে সেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে রঘু সাইকেল নিয়ে। এতক্ষণে হয়তো মা-ও বেরিয়ে পড়ে থাকবে চৌধুরী হাভেলিতে যাবার জন্যে।

গ্যারেজে এসে দেখে, সকালবেলাই আজ চলে এসেছে মালিক হরিবিষ্ণু যাদব। — "কাল রাতে অনেকগুলো গাড়ীর কাজ এসে গেছে রে রঘু। ভেবে দেখলাম, একা তোর দ্বারা সময়মতো সব গাড়ী রেডি করা সম্ভব হবে না। ছোটকু, দীনু, ব্রিজ— সব শালা হারামীর বাচ্চা, রাম ফাঁকিবাজ। দেবো শালাদের একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে। নিজে হাত না লাগালে হবে না। ব্যবসাটা তো আর ওদের বাপের নয়।" বিরক্ত গলায় কথাগুলো রঘুনাথকে বললো হরিবিষ্ণু।

কোনো জবাব দিল না রঘু। খাকি সার্টটা খুলে দেওয়ালে টাঙানো একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে কালো প্যান্টের পায়ের দিকটা খানিক গুটিয়ে নিল সে। তারপর একটা স্লাই রেঞ্চ নিয়ে মুখ হাঁ করে থাকা একটা গাড়ীর ইঞ্জিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভিতরটা দেখতে লাগলো। কাজের ছোঁড়াগুলো এখনো কেউ এসে পৌঁছায়নি। এত আগে ওরা কেউ আসেও না। সকাল দশটার আগে তো নয়ই। রঘুকে কাজ করতে দেখে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল হরিবিষ্ণু। রঘুকে বললো— "একটু খৈনি তৈরি করতো আগে। তারপর হাতে কালি মাখিস।"

প্যান্টের পকেট থেকে পিতলের ছোট দুমুখো কৌটোটা বার করে রঘুনাথ। কৌটোটার এক দিকে খৈনি পাতা, অন্য দিকে আছে চুন। খানিকটা চুন আর একটু খৈনি পাতা বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে চেপে ডলতে থাকে রঘুনাথ। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে ঝেড়ে হাতের পাতায় চাপড় মেরে ফুঁ দিয়ে গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে একটা ডেলা হরিবিষ্ণুকে দিল সে। বাকিটা নিজের ঠোঁটের ফাঁকে ভরে নিল রঘুনাথ। তারপর রেঞ্চটা আবার তুলে নিয়ে গাড়ীর হাঁ-য়ের মধ্যে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল সে। হরিবিষ্ণু নিজেও অন্য একটা গাড়ীর নীচে শুয়ে পড়েছে দুখানা রবারের ম্যাট তলায়

BanglaBook.org

পেতে নিয়ে।

দু-ঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণে ছোটকু, দীনুরা এসে গেছে। গাড়ীর নীচে থেকে বেরিয়ে এসেছে হরিবিষ্ণু। ছেলেগুলোকে কয়েকটা পার্টস্ কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে দিয়ে একটা হিসাবের খাতা নিয়ে হিসাব কষতে বসলো সে। একবার চেঁচিয়ে রঘুনাথকে বল্লে— "দেখ্ তো রঘু, শালপাতার প্যাকেটে মালা আর ফুল আছে। ফটোগুলোয় লাগিয়ে দে। ধূপটা আমি দেখিয়ে দেবো।"

রঘুনাথ হাতটা ন্যাকড়ায় মুছে হরিবিষ্ণুর দেরাজটার কাছে আসে। ফুলের প্যাকেটটা ঠাকুর মশাই ওখানেই রেখে গেছে। হঠাৎ হরিবিষ্ণু রঘুকে জিজ্ঞাসা করে— "তোর মাকে নাকি কোথায় একটা কাজে লাগিয়েছিল তুই? কাজটা ভালো করলি? যা শুনছি, তা ঠিক?"

এমন একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না রঘুনাথ। কদিন মা ওখানকার কাজটা চালিয়ে দিয়ে ওদের একটু সাহায্য করবে এমনটাই মনে ভেবেছিল সে। তার কোনো জবাব দেবার আগেই আবার প্রশ্ন করে হরিবিষ্ণু— "তোর বাবা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিল। স্বামীর গর্বে তোর মায়ের গর্ব। সেই গর্বের এই প্রতিদান তুই দিলি, ছেলে হয়ে?"

— "ব্যাপারটা ওভাবে ভাবছো কেন, কাকা। মানুষকে সাহায্য করলে, মানুষের একটু সুবিধা করে দিলে কি কেউ ছোট হয়ে যায়? তাছাড়া মা তো চিরকাল ওখানে কাজ করবে না। আমি দু-চার দিন বাদে নিজে গিয়ে দেখে আসবো, মাকে ওখানে কি কাজ করতে হয়। কোনো ছোট কাজ আমি মাকে করতে দেবো না।" জবাব দিল রঘুনাথ। —"বাপের সম্মান কি আমি জানি, কাকা। তুমি ও নিয়ে ভেবো না।"

—"যা ভালো বুঝিস করিস। তোকে তো আমি আর পাঁচজনের মতো এক ভাবে দেখি না। তুই শহীদ সুরেশ যাদবের ছেলে রঘু যাদব। তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে।" চুপ করে যায় হরিবিষ্ণু।

মায়ের কাজ করা নিয়ে এরকম কথা উঠতে পারে এমন একটা আশঙ্কা যে রঘুনাথেরও না ছিল এমন নয়। কিন্তু এত দূরে, তার গ্যারেজেও খবরটা কেমন করে পৌঁছে গেল— তা বুঝতেপারে না রঘুনাথ। দু-একদিনের মধ্যেই একদিন মায়ের কাজের সময়েই সকাল সকাল চৌধুরী হাভেলিতে গিয়ে মায়ের সাথে দেখা করে আসবে বলে স্থির করে সে।

BanglaBook.org

শনিচারীর অসুখ বেড়েই চলেছে। তার ছেলে এসে খবর দিয়ে গেছে— মায়ের হাত, পা, পেট সব ফুলে গেছে, ডাক্তার বলেছে— জল জমেছে। রোজ পালা করে ঘুরে ঘুরে জ্বর আসছে। গ্রামের ডাক্তার বলেছে, দরকার হলে কাটিহার কি পূর্ণিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং এখন শনিচারী আর কাজ করবে না বলেই মনে হচ্ছে। ফলে, সত্যবতীকে হয়তো পাকাপাকি ভাবেই চৌধুরী হাভেলিতে কাজ করতে হবে। কথাটা জেনে নেওয়া দরকার মনে করে সাবিত্রীই শেষে জিজ্ঞাসা করলো সত্যবতীকে— "দিদি, সবই তো শুনতে পাচ্ছ। এ অবস্থায় তোমার মতামতটা একটু জানাও, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। কাজে লাগানোর সময় কাজটা কদিনের জন্যে বলেছিলাম। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, শনিচারী মাসী হয়তো আর কোনোদিনই কাজ করতে পারবে না। তাছাড়া, সে সুস্থ হয়ে ফিরলেও তার ছেলেরা কি আর মাকে কাজ করতে দেবে?"

বয়সে ৪-৫ বছরের ছোট হলেও সাবিত্রী সত্যবতীকে দিদি বলে। সত্যবতীর স্বামীর কথা জানে সে। তাই বয়সে ছোট হলেও মান্য করে সত্যবতীকে সে দিদি বলেই ডাকে। দু একবার আপত্তি করেছিল সত্যবতী। কিন্তু আস্তে আস্তে সে-ও মেনে নিয়েছে। স্বামীর গৌরবে সত্যবতী নিজেকে গর্বিতা মনে করে।

— "অবস্থাটা তো আগে এরকম ছিল না। তখন তো তোমার অসুবিধার কথা ভেবেই আমি খানিকটা রাজী হয়েছিলাম। এখন যদি বরাবরের জন্যে থাকতে হয়, তবে ছেলের সঙ্গে বোধহয় একটু কথা বলা দরকার।" বললো সত্যবতী।

— "তোমার ছেলেকে একবার ডেকে পাঠাও না। আমার সঙ্গে কথা বলুক। আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি। মনে তো হয় না সব শুনে সে কোনো আপত্তি করবে।" বুদ্ধি জোগায় সাবিত্রী।

ঘাড় নাড়ে সত্যবতী। আজ রাত্রে সে ছেলের সঙ্গে একবার নিজে কথা বলবে। তারপর যদি ছেলে মনে করে মালকিনের সঙ্গে কথা বলা দরকার তখন না হয় এসে দেখা করবে। সাধারণ ভাবে তার কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সকাল থেকে সারাদিন ছেলে থাকে না। দুপুরে তার বাড়ীতে খাওয়ার কোনো পাটও নেই। মায়ের একার জন্যই রান্না। রাতে মা ছেলে দুজনের। দিনের বেলা চৌধুরী হাভেলিতে মায়ের খাওয়াটা হয়ে গেলে যা বাকি থাকলো তা রাতের ব্যাপার। সন্ধ্যার মুখে ঘরে ফিরে সেই রান্নাটুকু সহজেই করে

BanglaBook.org

নিতে পারবে সত্যবতী।

এ বাড়ীতে কাজ করলেও সত্যবতী নিজেকে কাজের লোক বলে মনে করে না। খানিকটা সেবামূলক মানসিকতা নিয়েই সে এ বাড়ীতে এসেছিল। মায়ের কাছে এই ধরনের শিক্ষা চিরকাল পেয়ে এসেছে রঘুনাথ। সেই সুবাদেই একদিন একটা বিপন্ন মেয়েকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল সে। শরীর ঘিরে যতই তার দুর্মদ যৌবন থাকুক না কেন— নারীদেহের প্রতি আবিলতাযুক্ত মোহ তার নেই কোনোদিন। তা থাকলে সে অতি সহজেই মেয়েটাকে নিয়ে ঘরে তুলতো বৌ করে। বরং ঘেন্না করেছে সেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ লম্পট লোকটাকে— সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস বা শক্তি যার নেই।

বাড়ীতে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল রঘুনাথের। সন্ধ্যের আগেই ঘরে চলে এসেছিল সত্যবতী। আঁধার হয়ে যাবার আগে থেকেই লণ্ঠনের চিমনিগুলো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় লম্ফগুলোর কোন্‌টাতে তেল কমে গেছে। ছেলে যেন ঘরে এসে আঁধার না দেখে। সে বড় অলক্ষণের। সন্ধ্যা প্রদীপটা যেন সময়মতো উঠানের তুলসীতলায় জ্বালানো থাকে। এসব নিয়ম বহু বছর ধরে মেনে আসছে সত্যবতী। মানলে কি হয়— তা সে জানে না। কিন্তু তবু সে মানে।

— "তোর ফিরতে রাত হলো কেন রে রঘু?" জিজ্ঞাসা করলো সত্যবতী। গায়ের জামাটা ঘামে জড়িয়ে গিয়েছিল। সাবধানে জামাটা খুলতে খুলতে জবাব দিল রঘুনাথ— "কাজ যে কখন কিভাবে এসে যায়, তার কি হিসাব থাকে। তাছাড়া ওভারটাইম হলে ঘণ্টা পিছু ডবল পয়সা পাওয়া যায়। টাকারও তো দরকার।"

কি ভাবে কথাটা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না সত্যবতী। টাকার দরকার— ছেলের মুখে এই কথাটায় একটা জুতসই সূত্র খুঁজে পেল সে। বললে— "মিছে কথা নয় রে রঘু। দেখলে লোকে বলবে, মা ছেলের সংসার। কিন্তু সেটা তো চিরকালের নয়। তুই বড় হয়েছিস। আজ বাদে কাল তোর বিয়ে দিলে বৌ আসবে ঘরে। তারপর ছেলে পিলে। টাকার দরকার তো দিন দিন বাড়বে ছাড়া কমবে না। এখন তুই একা রোজগার করছিস। দরকার হলে আমিও পাশে থাকবো বই কি।" কোনো রকমে প্রাথমিক প্রস্তাবনাটুকু করে ফেলে সত্যবতী।

— "তার মানে, এই কাজটা তুমি বরাবর করেই যাবে নাকি? না, না,

BanglaBook.org

তা হয় না মা। আজও আমার মনিব তোমার কাজের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল। আমি বলেছি চৌধুরী হাভেলিতে মালকিনের খুব অসুবিধা হচ্ছে বলে মাকে ওখানে পাঠিয়েছি। আমি বরং কালই গিয়ে চৌধুরী মালকিনের সঙ্গে কথা বলে আসবো। তুমি ইচ্ছে হলে তখন সেখানে থাকতে পারো। না হলে, যা বলার আমি একাই বলে দেবো।" উত্তর দিলো রঘুনাথ।

এবারে আর কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না সত্যবতী। সে জানে, এখন শনিচারী আসবে না। ফুলমোতিয়া ছেলেমানুষ। মাকে আর বোনঝিকে নিয়ে তাকে এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। আর তেমন কেউ নেই যাকে মায়ের বদ্‌লি কাজে ফুলমোতিয়া ওখানে পাঠাতে পারে। খুব জানাচেনা লোক না হলে বিশ্বাস করে কোথাও দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে, কাজে স্বীকার হয়ে এসে আবার পিছিয়ে যাওয়াটা ভাল মনে হচ্ছিল না সত্যবতীর। এ প্রসঙ্গে আর না এগিয়ে সত্যবতী প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললো — "রান্না এখনো বসাইনি, তোকে দুটো মুড়ি দেবো? চায়ের জোগাড়ও করছি। হাতে মুখে জল দিয়ে আয়, রঘু।"

দড়িতে ঝোলানো গামছাটা নিয়ে বেরিয়ে যায় রঘুনাথ। স্টোভটাতে আগুন দিয়ে একটা পাত্রে দু'কাপ জল দিয়ে বসিয়ে দিল সত্যবতী। তারপরে রঘুর ঘরে একটা লণ্ঠন রেখে এসে উনুনটার সামনে একটা ছোট চৌপাই নিয়ে বসে আগুন জ্বালানোর যোগাড়যন্ত্র করতে লাগলো।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা সুরে। চৌকিটার ওপর এসে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে রঘু। রাস্তার কল থেকেই হাত পা ধুয়ে এসেছে সে। পাশের জানালা দিয়ে বাইরের খোলা আকাশটা দেখা যাচ্ছে। কোন্ তিথি কে জানে। আকাশে দু চারটে ছোট বড় তারা ছাড়া আর কিছুই নেই। মনে হচ্ছে, মেঘ জমছে একটু। আজ যদি বৃষ্টি হয়তো বেশ হবে। মা যেন কি বলছিল? ঘরে বৌ আসবে? মন্দ হয় না। কিন্তু কাকে আনবে সে? মায়ের পছন্দ করা কেউ? ছোট্টখাট্টো একটা মেয়ে। শ্যামলা রং, পায়ে রুপোর মল। ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি। এই ঘরে, এই খাটে, এই অন্ধকার ঘরে— বাইরে তারা ভরা রাত, ঝিঁঝি পোকার ডাক। ওপাশের ঘরে মা। মাঝের দরজাটা বন্ধ। .....

কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব এসে যাচ্ছে রঘুর। রান্না হতে এখনো অনেক দেরী। রান্না হলে ডাকবে মা। কি বলবে? কি বলবে মা? — "রান্না হয়ে গেছে, আর কত ঘুমাবে গো? আমারও যে ঘুম এসে যাচ্ছে, সারা দিন একা

BanglaBook.org

একা আর কত কাটাবো..... বল না গো...

মাথাটা ঝাঁকানি দেয় রঘুনাথ। মা তো এ ভাষায় কথা বলে না। তবে? চোখটা আবার আয়েসে বুজে যায় রঘুনাথের। কলঙ্ক? কলঙ্ক কার না থাকে গো? রাধার, চাঁদের— কার কলঙ্ক নেই? ও কথা না হয় নাই ভাবলাম। কলঙ্কের দাগ কি ভালোবাসা দিয়ে মুছে দেওয়া যায় না? একবার সে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? কলঙ্কের চেয়ে মানুষ কি আরো বড় নয়? এসব ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যায় রঘুর। সত্য হোক, মিথ্যা হোক— চোখ দুটো আর খুলতে ইচ্ছা হয় না রঘুনাথের, আঠাশ বছরের দুর্দম জোয়ান রঘুনাথ যাদবের। জেগে জেগেই ঘুমিয়ে থাকতে চায় সে।

।। অষ্টম পরিচ্ছেদ ।।

অন্য দিনের মতো আজও সামনের খোলা দরজার মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে একা একা বসে ছিল সাবিত্রী। গুলাবী এখনো আসেনি। আসবার সময় হয়ে গেছে। সকালে বিছানায় বসে চা খাওয়ার যে অভ্যাসটা ছিল, সেটা আর সাবিত্রী করে না। বরং গুলাবী —যত শীগ্গির এসে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে যায়, সেটাই চায় সে। এরই মধ্যে দুই একবার চৌধুরী চিরঞ্জিলালের চোখে পড়ে গেছে গুলাবী। তাই মনে মনে শঙ্কিত হয় সে। কিন্তু মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিতেও পারে না । কোথায় যেন একটা মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে সে গুলাবীর সঙ্গে। মায়ের মতো যত্নে ওকে সামলে রাখতে চায় সে। এমন সময়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ে একজন ছেলে তার কাছে আসছে; তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এ বাড়ীর আর-একজন কাজের লোক।

সামনে এসে পায়ের চপ্পলটা বাইরে খুলে নীচু হয়ে প্রায় পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সাবিত্রীকে প্রণাম করলো রঘুনাথ। সাবিত্রী প্রথমে চিনতে পারেনি তাকে। সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে কাজের লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

— "আমি রঘু, মা। রঘুনাথ। আমার মা এখানে আপনার সেবার জন্যে রোজ আসে।" এবারে বুঝতে পারে সাবিত্রী। বলে —"ও, তুমিই দিদির ছেলে? দিদি বলেছে বটে তোমার কথা। কিন্তু আমি তো দেখিনি তোমাকে কোনোদিন। তুমি বসো, বাবা।"

তবু দাঁড়িয়ে থাকে রঘুনাথ। কাজের লোকটি একটা ছোট চৌপাই এনে সামনে রাখলো। তবু বসলো না রঘুনাথ। চৌধুরী হাভেলির খুব সম্মান। সকলে মান্য করে এ বাড়ীর মালকিন সাবিত্রী দেবীকে। সাবিত্রী খাটে এসে বসলো। পানের বাটা থেকে পানের সরঞ্জাম নিয়ে একটা পান সাজতে সাজতে বললো— "তোমার মা বড় ভাল মানুষ, রঘু। আমার খুব সেবাযত্ন করে। ও

BanglaBook.org

চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। মা এখানে আসে বলে তোমার কি পছন্দ নয়? বোনের বাড়ীতে এলে দিদির কি মান চলে যাবে বলে তোমার মনে হয়, রঘু? তা হলে অবশ্য আমি ওকে ধরে রাখবো না।" মুখটা বিষণ্ণ হলো সাবিত্রীর।

কি জবাব দেবে তা খুঁজে পায় না রঘুনাথ। এদিক ওদিক চাইতে থাকে সে। হাভেলির এই বিশাল শয়নকক্ষটির মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার হাহাকার ঘুরে ফিরছে। বড় বড় মেহগনি কাঠের ভারী টেবিল আর পালঙ্কগুলো সেই নিঃসঙ্গতার ওজনকে আরোই যেন গুরুভার করে তুলেছে বলে মনে হলো রঘুনাথের।

—"তোমার মা কাল থেকে কি আর আসবে না? তুমি কি দিদিকে আজই নিয়ে যাবে বাবা?" কেমন একটা আর্তনাদের মতো শোনালো সাবিত্রীর কণ্ঠ। হঠাৎ মালকিনের জন্যে কেমন করে উঠলো রঘুনাথের মনটা। মাথা নীচু করে সে বললো— "মাকে আপনার কাছেই রেখে দেবো মনে করছি। বাড়ীতে মা সারাদিন একা থাকে। আমি দিনের বেলা তো হোটেলেই খেয়ে নিই। রাত্রে গোটা চার-পাঁচ চাপাটি আর বেগুন পোড়া করে নিলে আমার খাওয়া হয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি আর ভাববেন না, মাসী। মা এখানেই থাকতে পারে, যদি আপনি অসুবিধা না মনে করেন।" মাথা না তুলেই বলে রঘুনাথ। তার মায়ের জীবনের নিঃসঙ্গতার কথাটা যেন আজ হঠাৎ করে তার মনে এসে গেল। তার শৈশব থেকে বাল্যকালের কয়েকটা দিন সারাক্ষণ সে তার মায়ের কাছে কাছেই থাকতো। কিন্তু ১৩-১৪ বছর বয়স হতেই সারাটা দিন অন্যের ক্ষেতে দিন মজুরের কাজ করে এসেছে সে। সকালে বেরোতো, ফিরতো সূর্য ওপারে ঢলে গেলে। বিধবা মা সারাদিন সংসার সামলাতো, একা। এখন সে যুবক, কিন্তু মায়ের একাকিত্ব তাতে বেড়েছে বই কমেনি। যতদিন না সে মাকে একটা বৌ এনে দিতে পারে, ততদিন থাকুক না মা চৌধুরী হাভেলিতে। মাঝে মাঝে সে মায়ের সাথে দেখা করে যাবে বরং।

— "আমার অসুবিধার কথা তুমি ভাবছো, বাবা? আমার আর কি অসুবিধা? তোমাকেই বরং রোজ হাত পুড়িয়ে রাতের খাবার করে নিয়ে খেতে হবে। যদি তোমার কোনো অসুবিধা না হয় তবে দিদি থাকুক এখানে। আমার তো ভালই হবে।"

কথার মাঝে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল সত্যবতী। সে নিজে কোনো কথা

BanglaBook.org

বলছিল না। মালকিন বোনকে সে নিজেও মান্য করে। বোনের জন্যে তারও কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে। চৌধুরী ঠাকুর এমনিতে বোধ হয় তেমন খারাপ লোক নয়, কিন্তু স্বামী হিসাবে সে হয়তো তার নিজের স্বামী সুরেশ যাদবের মতো নয়, এমনটাই মনে হয় সত্যবতীর।

—"তাহলে ঐ কথাই রইল, মাসী। আমি চলি। মাঝে মাঝে মাকে দেখে যাবার অনুমতি দিলে এসে দেখে যাব।"

দুজনকে প্রণাম করে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছিল রঘুনাথ। হঠাৎ দরজার বাইরে দেখতে পেলো গুলাবী ঢুকছে ঘরে। এক মুহূর্তদুজন দুজনকে দেখতে পেলো। রঘুর সাথে কোনো কথা না বলে গরম তেলের বাটিটা একটা মাটির থালায় বসিয়ে নিয়ে হাতে করে ঘরে ঢুকে এলো গুলাবী। মনে হলো, রঘুকে যেন সে চেনেই না।

কালীমায়ের সেবার জন্যে যে তিন বিঘা জমি ছিল দশরথের হাতে, তার অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে তার দখল থেকে। বিশ্বাস করে তার দু বিঘা ভাগে চাষ করতে দিয়েছিল গিরিধারী যাদবকে। গত চার বছর ধরে গিরিধারী দশরথকে তার ধানের ভাগ ঠিক ঠিক দিয়েও যাচ্ছিল। কিন্তু কোন্ ফাঁকে গত বছর নতুন রেকর্ডের সময়ে ভাগচাষী থেকে মালিক হিসাবে নিজের নাম বসিয়ে নিয়েছে সে, তা জানতো না দশরথ। আরারিয়া কোর্টে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করেছে সে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। পূর্ণিয়া জেলা সদরে না গেলে এখান থেকে কোনো কাজ হবে না। গাঁয়ের গরীব পুরোহিত মানুষ সে। এমনিতে স্বভাবে ধূর্ত হলেও শহরে গিয়ে ওসব করিয়ে আনবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তার নেই। আর, এসব জমিজমার কাজে কাউকে বিশ্বাস করবার মতো মন নেই দশরথের। কে যে কখন কাকে ঠকাবে জানা যায় না। চার বছর ভাগচাষের পরে গিরিধারীই যে দশরথের দেবত্র জমি ঠকিয়ে নিজের নামে রেকর্ড করে নেবে, তা কি কোনোদিন সে নিজে ভেবেছিল? রঘুর কথা দু একবার মনে হয়েছিল তার। ভেবেছিল, গুলাবীকে দিয়ে একদিন রঘুর কাছে বলবে— পূর্ণিয়ায় গিয়ে যদি রঘু তার এ-কাজটা করে দেয়। কিন্তু রঘুর কথা তুললে গুলাবী যে ভাবে কথা বলে— তাতে দশরথ ঠিক বুঝতে পারেনি রঘুর সম্বন্ধে গুলাবী কি ভাবে। রঘু সাহায্য করেছিল গুলাবীকে তার বিপদের দিনে। কিন্তু গুলাবীর বাপের জন্যেও কি সে করবে? কে জানে!

একা একা বসে এই সব ভাবছিল দশরথ। একটু একটু করে গরমটা বাড়ছে। মন্দিরের নিত্য সেবা শেষ করে দূরের যজমানদের বাড়ীতে গিয়ে

BanglaBook.org

পূজা পাট করা আজকাল তার কষ্ট হয়। গত ফাল্গুনে তার বয়েসও তো ষাট পেরোলো। এমনিতেই তার দেহ শীর্ণ। কঠোর পরিশ্রমের জীবন আর পর্যাপ্ত আহার না পাওয়ায় দেহটা যেন দিন দিন দড়ির মতো পাকিয়ে যাচ্ছে। গায়ের রংটা হয়তো কোনো কালে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আজ আর বোঝা যায় না। খাটো একটা তসরের ধুতি, গায়ে একটা নামাবলী। বুকের ওপর বিলম্বিত যজ্ঞোপবীত। খালি পা। এই হলো তার পোশাক। পুজোর কাজে যাবার সময়েই তসরের ধুতিটা পরে সে। অন্য সময়ে একটা বড় গামছাই তার পরিধেয়। অন্য কোনো রোজগার তার নেই। যেটুকু আনে তা গুলাবীই। শাম্‌লিকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে দশরথ। সকাল বেলাটায় রান্নার কাজটা সে-ই করে। বিকেলে একটা বাড়ীতে রান্নার কাজে তাকে লাগিয়ে দিয়েছে সে। জান্‌কী আবার মা হয়েছে। গুলাবী চৌধুরী হাভেলি থেকে বেলা ১০টার মধ্যে ফিরে এলে ছোট ভাইটাকে সে-ই দেখাশোনা করে। ঐ সময়টা জান্‌কী পান্তা খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দেয়। সারা রাত বাচ্চাটা নাকি তাকে বড় জ্বালায়। একটুও চোখের পাতা এক করতে পারে না জান্‌কী। বিকালে বচ্চাটাকে গুলাবীর কাছে দিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে ছোট আয়নাটাকে খুঁটির গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে পাতা কেটে চুল বাঁধে সে। মুখে একটা পান পুরে জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে চেটে সে চেষ্টা করে ঠোঁটটাকে রাঙাতে। যথেষ্ট রাঙা না হলে হাঁক দেয়— "গুলাবী, একটু খয়ের নিয়ে আয় তো। কি খয়ের তোর বাপ হাট থেকে নিয়ে আসে জানি না! এগুলো কি খয়ের না কাঠকুচো?"

খানিকটা খয়ের আর পানের বোঁটায় করে এক দলা চুন চেটে চেটে খায় জান্‌কী। তারপর জিভটা বার করে আবার আয়নায় দেখে, কতটা লাল হলো। ঘরের কাজ কোনোদিনই সে খুব একটা করে না। গুলাবীই যা করার করতো। এখন তো তার ছেলে হয়েছে, তাই জান্‌কী সব কিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে রেখে দিয়েছে।

'চৌধুরী হাভেলি' থেকে গুলাবী ফিরে এলে দশরথ তাকে বললো— "রঘুর সঙ্গে দেখা হয় তোর চৌধুর, হাভেলিতে? ওর মা তো শুনেছি ওখানেই থাকে! রঘু মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় না ওখানে?"

কোনো জবাব দিল না গুলাবী। দড়ির ওপরে রাখা ময়লা জামা কাপড়গুলো জড়ো করতে থাকে সাবান কাচার জন্যে। এবার আরো কাছে এগিয়ে এসে শুধায় দশরথ— "রঘুকে একবার আসতে বলিস তো। আমার দরকার আছে ওকে। ওর ঘর অথবা ওর গ্যারেজটা অনেক দূরে। আমার

BanglaBook.org

যাওয়া হয়ে ওঠে না। ওকে চৌধুরী হাভেলিতে দেখতে পেলে বলিস্, আমি ডেকেছি। ওকে ওখানে দেখতে পাস্‌না তুই?"

এতক্ষণে মুখ খোলে গুলাবী। বলে—"কবে কার জন্যে সে কিছু করেছে বলে তার বাড়ীর লোকের জন্যে সে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে— তুমি বুঝি সেই আশায় রয়েছ, বাবা? তাছাড়া, তুমি তো জানো, আজকাল চৌধুরী হাভেলিতে সকালে মোটে দু'এক ঘণ্টার জন্যে আমি যাই। মালকিন আমাকে ওখানে বেশীক্ষণ থাকতে দেয় না। কে কখন তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে, আমি সারাদিন তার জন্যে ওখানে চৌকি দিয়ে বসে থাকবো নাকি? তোমার শরীরে সময়ে কুলোলে নিজে তার বাড়ী গিয়ে কথা বলে এসো। আমায় দিয়ে ওসব হবে না।"

গুলাবীর কণ্ঠে একটা নিরাসক্তির সুর। হয়তো বা কিছুটা হতাশা আর আত্মসম্মান হারানোর বেদনা। গুলাবী কি মনে মনে আশা করেছিল যে, রঘু তাকে বৌ করে ঘরে তুলবে? কলঙ্কর ভয়েই কি রঘু তাকে মায়ের পুত্রবধূ করে নিয়ে আসার সাহস পায়নি? কত রাতে একা একা ঘুম না আসার সময়গুলোতে এসব ভেবেছে গুলাবী। তার চোখের জলে ভিজে গিয়েছে মাথার বালিশের একটা পাশ।

আর কথা না বাড়িয়ে নামাবলীটা গায়ের ওপর ফেলে ছেঁড়া লম্বা বাঁটের ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে যায় দশরথ। রঘুর গ্যারেজেই না হয় একবার গিয়ে দেখবে সে। এমন ভাল ছেলেটাকেও কেন যে তার মেয়ে সহ্য করতে পারে না—তা বুঝতে পারে না দশরথ। রঘুর চেয়ে আর ভালো পাত্র সে পাবে গুলাবীর জন্যে? কিন্তু মেয়েটা যে রঘুকে মোটে চায় না। রঘুর কথা তুললে ঝাঁঝিয়ে কথা বলে। কেন, একটু ভালো মুখে কি রঘুর সঙ্গে দুটো কথা বলা যায় না?

কাপড়গুলোকে সাবান জলে ভিজিয়ে দিয়ে ঘরে আসতেই জান্‌কী বলে গুলাবীকে—"তুই বাচ্চাটাকে একটু নে তো। রাতে ঘুমোতে দেয় না আমাকে। আমি এখন একটু শোবো। শাম্‌লি রান্নাঘরে কাজ করছে। তোর তো হাত এখন খালি। ছেলেটাকে একটু নে।"

ভাল লাগছিল না গুলাবীর। 'চৌধুরী হাভেলি'তে রঘুনাথ তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকে সে চিনতে পারলো না? নাকি, চিনেও চিনলো না? এত কিসের গর্ব তার? ওর বাপের জন্যে ভীষণ গৌরব রঘুনাথের। পুরুতের মেয়ে কি মেয়ে নয়? পুরুত কি মানুষ নয়? এ ভালোই হলো। এরপর

BanglaBook.org

কোনোদিন দৈবাৎ দেখা হলে সে-ও পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। চিনেও না চেনার ভাব করবে, যেন কোনো কালেই সে রঘুকে চেনে না, দেখেনি!

ঘরে ঢুকে কাঁথাসুদ্ধ ভাইটাকে মায়ের পাশ থেকে তুলে নেয় গুলাবী। তারপর লাল একটা কাঠের চুষিকাঠি নিয়ে বাইরে এসে বসে। ময়লা কাপড়গুলো সাবান জলে ভিজতে আরো সময় লাগবে। ততক্ষণ ভাইটাকে কোলে নিয়ে দাওয়ার মাটির সিঁড়ির ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে সে। উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর। শাম্‌লি কি যেন সব রান্না করছে সেখানে। ঝাঁঝালো একটা গন্ধ উড়ে আসছে এদিকে। আঁচলটা নিয়ে নাকে চাপা দিল গুলাবী।

বেশ বেলা করে বাড়ী ফিরলো দশরথ। গ্যারেজে গিয়ে দেখা পায়নি রঘুর। মালিক হরিবিষ্ণু তাকে পূর্ণিয়ায় পাঠিয়েছে গাড়ীর কাজের মাল কেনার জন্যে। গতকাল যদি রঘুর সাথে দেখা হতো তাহলে পূর্ণিয়ায় নিজের কাজটা সেরে দেবার জন্য তাকে বলতে পারতো দশরথ। কিন্তু কে জানতো যে, আজই রঘু ওখানে যাবে মালিকের কাজে। খানিকটা হতাশ মনেই ফিরেছে দশরথ। মালিক হরিবিষ্ণুকে বলে এসেছে—আজ হোক বা কালই হোক— রঘু যেন তাদের বাড়ীতে একবার আসে। অবশ্য রঘু যে আসবেই— সে বিশ্বাস রাখে না দশরথ। দুদিন দেখবে সে। তাতেও যদি না আসে তাহলে গুলাবীকে বলে কয়ে একবার পাঠাবে রঘুর বাড়ীতে। মনে মনে ভাবছিল দশরথ।

তিন দিন কেটে গেল, রঘু আসেনি। ওদিকে ভাগচাষী গিরিধারী সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, সে এবারে চাষের ভাগ কিচ্ছু দেবে না দশরথকে। এখন ঐ দু'বিঘা জমির মালিক সে নিজে, তাই দশরথের কোনো পাওনা এখানে নেই। অগত্যা এখন গুলাবীকেই ধরতে হবে। রঘু ফেরে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে। তখন তার বাড়ী যেতে পারবে না দশরথ। রাতে ভাল করে চোখে দেখে না সে, তার ওপর এখন কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়ে গেছে। জোছনার সময় আসতে কমপক্ষে পনেরো দিন বাকি। অতদিনে বেশ দেরী হয়ে যাবে। তাই আজ সন্ধ্যায় গুলাবীকে ডেকে বলে দশরথ—"তুই মা একবার দেখে আয় রঘুকে। ওর বাড়ীতে না গেলে ওকে পাবি না। গ্যারেজের চেয়ে রঘুর ঘরটা অনেক কাছে। সন্ধ্যের পর ওকে পাবি। গিয়ে ডেকে আনবি, বলবি জরুরি দরকার আছে আমার।"

বাবার "জরুরি দরকার"-টা বোঝে গুলাবী। আর কোনো উপায় নেই। গ্যারেজের মালিককে খবর দিয়েও কোনো কাজ হয়নি। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে, চিরুনীটা মাথায় বুলিয়ে ঘর থেকে বার হয় গুলাবী। রঘুর বাড়ী এখান

BanglaBook.org

থেকে হাঁটা পথে প্রায় আধঘণ্টার রাস্তা। অন্ধকারে একা-ই যেতে হবে। আজ হাটবার নয়। পথে লোক তেমন থাকবে না। তবু একা একা-ই রওনা হয় গুলাবী। শুধু কাজের কথাটা বলেই চলে আসবে। এক মিনিটও দাঁড়াবে না। আর, দাঁড়াবেই বা কেন? রঘুনাথ যাদব তার কে? বাবা না বললে সে যেতোও না ওখানে।

আঁধার ঘরে একা শুয়েছিল রঘু। আলোটাও জ্বালায়নি। কি হবে আলো? তার জন্যে আলো জ্বেলে কে-ই বা বসে থাকবে এ ঘরে। পেটের খিদেটা আরো জ্বালা দিলে তখন উঠে লম্ফ আর চুলাটা জ্বালাবে। চৌকিতে শুয়ে আঁধার আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে শুয়েই থাকে রঘুনাথ। দূরে আকাশে কোথায় একটা তারা খসে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রঘুর মনে পড়ে— ইস্কুলে পড়ার সময় তার বন্ধু সুজা তাকে বলেছিল— "তারা খসার সময় যে যা কামনা করে— তা নাকি পূর্ণ হয়।" আচ্ছা, এই মুহূর্তে রঘু কি কিছু চেয়েছে? কোনো কিছু? কাউকে? যাকে পেলে তার অচরিতার্থ যৌবন পূর্ণতা পাবে? দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়েও চোখ বুজে শুয়ে থাকে রঘুনাথ। দুবার আওয়াজ পেয়েও সে উঠলো না। অন্ধকারে দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকে এলো ভিতরে। চৌকির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তি। কে ও? মা তো নয়। ভেজানো দরজা দিয়ে অচেনা অজানা ও কে ঘরের ভিতরে ঢুকে এলো?

কাছে আসতে রঘু দেখতে পেলো—গুলাবী। কিছু না বলে, বিছানা থেকে না উঠে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রঘুনাথ। বাইরে ততক্ষণে আঁধার আরো ঘন হয়ে এসেছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

গুলাবী আজকাল সকাল সকাল এসে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে 'চৌধুরী হাভেলি' থেকে চলে যায়— একথা জানতে পেরেছে চিরঞ্জিলাল। তার কারণটা তাকে কেউ না বলে দিলেও কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না তার। মনে মনে একটা অপমানের জ্বালায় জ্বলতে থাকে সে। আর, এটা যে সাবিত্রীর ব্যবস্থাতেই হয়েছে— সেটাও বিলক্ষণ বোঝে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। অথচ মুখে কিছু বলার উপায় নেই। তাহলে পরোক্ষে নিজের চারিত্রদোষের

BanglaBook.org

অপরাধই কবুল করা হয়ে যায়। কিছু বলবো না বলবো না, করেও একদিন কথাটা সাবিত্রীকে বলে ফেললো চৌধুরী চিরঞ্জিলাল— "গুলাবীকে এখানে বহাল করা হয়েছিল দু'বেলা তোর মালিশ করার জন্যে। একবেলা কাজ করিয়ে তাকে ছেড়ে দিস্ কেন? সে কি আধা মাইনেতে কাজ করে এ বাড়ীতে?" একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্নটা সাবিত্রীকে করে চিরঞ্জি। সাবিত্রী পিছন ফিরে আলনায় শাড়ীগুলোকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে রাখছিল। স্বামীর কথায় প্রথমটা কোনো জবাব দেয়নি। অধৈর্য চিরঞ্জি আবার প্রশ্ন করে,— "আমার টাকাগুলো কি হারামের টাকা নাকি যে, যার ইচ্ছা নিয়ে খরচা করবে?"

এবার ঘুরে দাঁড়ায় সাবিত্রী। দিনের বেলায় প্রখর আলোয় বড় একটা স্বামীকে দেখতে পায় না সে। আজ এমন অসময়ে তাকে এঘরে দেখে পুরোটা অবাক হয়নি সাবিত্রী। এরকম একটা কিছু যে একদিন ঘটবেই সেটা খানিকটা আন্দাজ করেছিল সে। স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে সাবিত্রী। চোখের কোল ঘেঁসে কালো ছায়া নেমেছে। মাংসল গাল যেন ছোট বড় মাংসপিণ্ডর এক বিচিত্র সমাহার। পুরু ওষ্ঠাধর এই বয়সেও মানুষটার নারীদেহ লালসার ইঙ্গিত দেয়। ভারী হয়ে আসা ষাটোর্ধ্ব শরীর বয়সের সম্মাননার চেয়ে লাম্পট্যের ইশারাই জাগায় মানুষের মনে।

—"মালিশ আমার একবেলা হলেই চলে যায়। তা ছাড়া, এখন দিদি সত্যবতী তো রাতদিন রয়েছে। দরকার হলে গুলাবীকে একেবারেই ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। পরের ঘরের জোয়ান মেয়ে, আমি কি তাকে চৌপর দিন চৌকি দিয়ে বেড়াবো?" কণ্ঠস্বর কঠিন শোনালো সাবিত্রীর।

— "তার মানে? তুই কি বলতে চাইছিস?" হুঙ্কার দেয় চিরঞ্জিলাল। শিকার হাতে পাওয়া বুড়ো বাঘের আশাভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কার ছোঁয়া যেন চিরঞ্জিলালের কণ্ঠে।

— "আমি কিছুই বলতে চাই না। দুনিয়া চেনে মানুষকে। আমি আবার নতুন করে কাকে কি বলবে চাইব?" বললো সাবিত্রী।

— "পুরো মাইনে নিয়ে আধা কাজ আমি সহ্য করবো না। কেমন করে কাজ আদায় করতে হয় তা জানে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল।" বলে দুম্ দুম্ আওয়াজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

মালিশের তেল নিয়ে ঘরে ঢোকে গুলাবী। কাছে এসে বলে— "ওমা, আপনি এখনো তৈরী হননি, কাকী? তেলটা জুড়িয়ে যাবে যে। আমি না হয় ওটাকে আরো একটু গরম করে আনি, আপনি ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিন।"

BanglaBook.org

সাবিত্রীর কাছে এসে দাঁড়ায় গুলাবী। সাবিত্রী গুলাবীর হাত থেকে তেলের বাটিটা পাশের টেবিলের ওপর রেখে গুলাবীর হাতটা ধরে টেনে বিছানায় বসায় তার পাশে।

— "বাড়ী থেকে এত দূরে হেঁটে আসতে তোর খুব কষ্ট হয়, না রে গুলাবী? কটা টাকা বা পাস এখানে। আসা যাওয়াই সার। জানি তোদের সংসারে অভাব, কাজটা চলে গেলে দুটো পয়সা আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তোকে চলে যেতে বলতে পারি না। আচ্ছা, মনে কর, তোর এখানে কাজ করা বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু মাসে মাসে টাকাটা আমার কাছে এসে তুই নিয়ে যাবি? সেটা হয় না?"

এসব কথার অর্থ বুঝতে পারে না গুলাবী। সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মালকিন মায়ের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, মাথা নীচে নামিয়ে জবাব দিল— "আপনার যদি আমাকে দরকার না লাগে তবে রাখবেন কেন, কাকী? আর আমিই বা কাজ না করে মাস গেলে হাত পেতে টাকা নেবো কোন্ মুখে?"

সত্যি কথাই তো। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সাবিত্রীর মুখ দিয়ে। একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে সে বলে— "যা, তেলটা গরম করে নিয়ে আয়, গুলাবী। মালিশটা সেরে দিয়ে চলে যাস। আর, যেমন কাজ করছিস তেমনটাই করে যা। কারো সাতে পাঁচে যেন জড়িয়ে পড়িস না এ বাড়ীতে। মনে রাখিস কথাটা।"

আলতো করে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে গুলাবী। তারপর উঠে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাবিত্রী। একটু পরে আবার গরম করে আনা তেলের বাটিটা নিয়ে ফিরে এলো গুলাবী। ততক্ষণে মালিশের জন্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে সাবিত্রী। পায়ের কাছে বসে ঘষে ঘষে তেলটা পায়ে মাখাতে থাকে গুলাবী।

—"তোর সৎ মা-টা তোর ওপর অত্যাচার করে বুঝি? তোর বাপ কিছু বলে না?" হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে সাবিত্রী। —"বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে পুরুষ মানুষগুলো কেমন যেন বদলে যায়, না রে? এদের বিশ্বাস করা যায় না। নিজের জন্যে ওরা সব কিছু করতে পারে।"

কি যেন একটা আভাসে ইঙ্গিতে বোঝানোর জন্য আজ বোধহয় মরিয়া হয়ে আছে সাবিত্রী। অথচ সোজা সহজ কথাটা কিছুতেই পাড়তে পারছে না কন্যাসমা এই মেয়েটার কাছে। ঘুরে ফিরে, কাছাকাছি এসেও কিছুতেই আসল

BanglaBook.org

প্রসঙ্গটা আসতে পারছে না সাবিত্রী। এক মনে নীরবে তেল মালিশ করে যাচ্ছে গুলাবী।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে এসে ঢোকে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল। —"লোহার সিন্দুকে দু'হাজার টাকা রেখেছিলাম। ওটা বের করে দে তো।" গুলাবীর দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিটা আটকে রেখে কথাটা বলে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। সাবিত্রী কিছু বলার আগেই মেঝেতে বসা গুলাবীর উদ্দেশ্যে সে বলে— "যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাস গুলাবী। কথা আছে।"

কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকালো সাবিত্রী। উঠে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবি নিয়ে দেওয়ালে আঁটা লোহার সিন্দুকটা খুলে টাকাটা বের করে দিল সে। তারপর কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বললো —"মেয়েদের ব্যাপারে কথা বলবে মেয়েরা। বাড়ীর ব্যাটাছেলেদের কি দরকার? তোকে যা বলার তা আমিই বলে দেবো। কারো কাছে তোর যাবার দরকার নেই গুলাবী।"

কথাটা যে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো— তা বুঝতে বাকি থাকে না চিরঞ্জিলালের। তবু, পুরুষের অধিকার সাব্যস্ত রাখার চেষ্টায় সে বলে— "ব্যাপারটা মেয়েদের হলেও মাস মাইনেটা জোগায় ব্যাটাছেলেরাই। তাই, কথা বলার অধিকার তাদেরও কিছু কম নয়। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি, গুলাবী। আমি বার বাড়ীতে আছি।"

টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল চিরঞ্জিলাল। —"তুই ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে বার বাড়ীতে যাবি, গুলাবী?" প্রশ্ন করে সাবিত্রী। গুলাবী প্রথমে জবাব দেয় না। তারপরে আস্তে আস্তে বলে— "ঠাকুর সাহেব বাবার সমান। ভয় কি আমার? দেখিই না, কি বলেন।"

কোনো জবাব মুখে আসে না সাবিত্রীর। শুধু স্বামীকেই চেনার প্রশ্ন নয়, পুরুষ জাতটাকেও হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে সাবিত্রীর। কিন্তু তবু সে আর বারণ করতে পারলো না গুলাবীকে।

মালিশের কাজ সেরে সাবিত্রীকে চান করিয়ে দিয়ে এক-একদিন গুলাবী নিজেও এ বাড়ী থেকে চান করে বাড়ী ফেরে। ওদের বাড়ীর কাছের পুকুরে বেলা বাড়বার সময় থেকেই কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে যায়। গুলাবী চান করতে ঘাটে নামলে ওদের চার কেত যে মাছে খেয়ে যায়, তার হিসাব নেই। তাছাড়া ঐসব পুকুরে এখন গরমের দিনে জলও কমে এসেছে। সাবান মেখে ওরকম ঘোলা জলে চান করে তৃপ্তি হয় না গুলাবীর।

BanglaBook.org

চান সেরে গুলাবী এসে দাঁড়ায় বার বাড়ীর ঘরের সামনে। ভিতর থেকে তাকে দেখতে পায় চিরঞ্জিলাল। একটু কেশে নিয়ে বলে— "কে ওখানে? গুলাবী? ভিতরে আয়।"

ভিতরে ঢুকলো গুলাবী। ছোট একটা চৌকিতে সাদা ফরাসের ওপরে একটা গোদা মোটা তাকিয়া নিয়ে আধশোওয়া হয়ে বসে আছে চিরঞ্জিলাল। —"সামনে আয়।" বললো চিরঞ্জিলাল। একটু একটু করে এগিয়ে এলো গুলাবী। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত

—"তোর কাকী কিছু বলেছে তোকে? এখানকার কাজের ব্যাপারে? মনে হচ্ছে, ও তোকে আর কাজে রাখবে না। তুই গরীব ঘরের মেয়ে, দুম্ করে কাজটা চলে গেলে খাবি কি? এই টাকাটা তোর কাছে রেখে দে। খরচা হয়ে গেলে এখানে এ ঘরে এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। তোর কাকীর কাছে যাবারও দরকার হবে না। আমার এখান থেকেই টাকা নিয়ে চলে যাবি। বুঝলি?"

দু হাজার টাকার বাণ্ডিলটা চেনা ছিল সাবিত্রীর। সেটা থেকে গোটা কতক একশো টাকার নোট বের করে গুলাবীকে দেখায় চিরঞ্জিলাল। টাকাটা নিতে একটু কুণ্ঠা করছিল গুলাবী। —"কাকীকে জিজ্ঞেস করে দেখবো, যদি বলে তবে নেবো।" বললে সে।

—"না, না ওকে কিছু বলিস না। তাছাড়া তোকে তো ও আর হয়তো রাখবেই না। না রাখুক, দরকার হলে আমার কাছে আসবি। আমি কি মরে গেছি?" চোখ দুটো শিথিল মাংসপেশীর মধ্যে থেকে চক্‌চক্ করতে থাকে চিরঞ্জির। উঠে বসে সে। তারপর বাঁ হাতে গুলাবীর হাতখানা ধরে ডান হাতে নোটগুলো গুঁজে দেয় চিরঞ্জি। কিন্তু বাঁ হাতটা সে ছাড়ে না গুলাবীর। গায়ের মধ্যে কেমন একটা শিরশির ভাব জাগে তার। একটা আলতো ঝটকা দেওয়ার মতো করে গুলাবী। —"আচ্ছা, আজ চলে যা। তবে আবার ডাকলে আসবি তো গুলাবী? একা একা আমারও যেন দিন কাটে না আর। তুই বাড়ী যা। হ্যাঁ, তোর কাকী, বাপ অথবা সৎমা— কাউকে যেন টাকাটার কথা বলিস না। শেষ হলে আবার আসিস, আবার টাকা দেবো। বুঝলি?" বললো চিরঞ্জিলাল।

যা বোঝবার তা বুঝেছে গুলাবী। আর কোনো কথা না বলে দ্রুত সে বেরিয়ে গেল টাকাটা জামার মধ্যে গুঁজে নিয়ে।

BanglaBook.org

ঘরের বাইরে যেমন ঘন অন্ধকার, ঘরের ভিতরেও তেমনি। রঘুনাথ অনেকক্ষণ থেকে অন্ধকারে শুয়েছিল বলে তার চোখে সয়ে গিয়েছিল আঁধারটা। কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে তাকে ঠাহর করতে পারেনি গুলাবী। চৌকিটার কাছে এসে দেখলো, রঘু শুয়ে আছে।

—"একি, গুলাবী তুই? এমন সময়ে ? চৌধুরী বাড়ীতে তো আমাকে তুই চিনতেই পারলি না। কি ব্যাপার, এ সময়ে?"

চৌকির একধারে বসলো গুলাবী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বললো— "একটা আলোও জ্বালোনি দেখছি? এমন আঁধারে শুয়ে আছ একা?"

—"একা? হাসালি তুই! আমার আবার দোকা ছিল কোন্ কালে? এ যুগে চেনা লোক চেনা দেয় না দরকার মতো। দোকা খুঁজবো কোন্ ভরসায়?" হাসছিল রঘুনাথ। অন্ধকারেও রঘুর গলার স্বরটা কেমন যেন করুণ শোনালো গুলাবীর কানে।

—"চেনা তো তুমিও আমায় দাও নি রঘুদা। দোষ বুঝি আমার একার? আমি খারাপ মেয়ে, নোংরা বাজারী। আমায় তুমি চিনবে কেন?" গলার আওয়াজটা বুজে আসে গুলাবীর। উঠে বসে না রঘুনাথ। হঠাৎ গুলাবীকে সে জাপটে ধরে বুকের কাছে। বলে— "তোকে ভালবেসে আমার যদি কলঙ্ক হয় হোক, তোকে আমি রক্ষা করেছি কি আবার ভেসে যাবি বলে? তুই আমায় জোর করতে পারিস না, গোলাপ? বল্, পারিস না?"

নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে না গুলাবী। রঘুর অনাবৃত পেশল বুকে নিজের মুখটা সজোরে চেপে ধরে সে। সমস্ত শরীরে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরতা। তার দশ আঙুলের নখ যেন রঘুর বুকের দুপাশের কঠিন মাংসপেশী ভেদ করে বসে যাচ্ছে। রঘুর ধমনীতেও রক্ত দ্রুত ধাবমান। তার বলিষ্ঠ দুটি ঠোঁট তীব্র আসঙ্গ লিপ্সায় কামড়ে ধরেছে গুলাবীর ক্ষীণ দুটি অধর ওষ্ঠ। গুলাবীর ডান হাতটা তার অজান্তেই চলে গেছে রঘুনাথের প্যান্টের মাঝখানে। এক টানে বোতামগুলো খুলে ফেলে রঘুনাথের প্যান্টের ভিতরের অন্তর্বাসটার ওপর আঙুল বুলিয়ে তার হাতটা জাগিয়ে তুলতে চাইছে রঘুর শিথিল ইন্দ্রিয়কে। রঘু ওর হাতটা ধরে বার করে এনে গুলাবীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলে— "তোকে আমি আমার মতো করেই ভালবাসিরে, গোলাপ। সেই বদমায়েস ওষুধ বেচা লোকটার মতো করে নয়। যেদিন আমার ঘরে তুই বৌ হয়ে আসবি, সেদিন যা হবার হবে, আজ নয়।"

BanglaBook.org

নিজেকে সামলে নেয় গুলাবী। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে—"সে কবে হবে গো, রঘুদা, কবে?"

হেসে ফেলে রঘুনাথ। গুলাবীর চিবুকটা ধরে হাসতে হাসতে বলে—"সেদিনও কি তুই আমাকে রঘুদা বলে ডাকবি, গোলাপ? তাহলে তো আমি তোর ভাই হয়ে যাবো। আর তুই হবি আমার বোন। লোকে বলবে তোদের কি ভাই বোনে বিয়ে হয়েছে নাকি? বল, ঠিক বলিনি?"

হাসতে হাসতে আবার রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরে গুলাবী। বলে—"তোমার মা আমাকে নেবে?" "কেন নেবে না? ছেলে যাকে নিয়েছে মা তাকে নেবে না? তাছাড়া আমার মা তো চায় আমি একটা বৌ নিয়ে আসি। তা, সে বৌ না হয় তুই-ই হবি, গোলাপ।"

রঘুনাথের বুকের ওপর মাথা রেখে তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে গুলাবী। তার আঙুলের স্পর্শে রঘুর সারা দেহে যেন কেমন একটা করতে থাকে। হঠাৎ সে গুলাবীকে দুহাতে সজোরে জাপটে ধরে। তার শরীরের নীচে চাপা পড়ে যায় গুলাবীর শরীর। ভার লাগলেও কেমন যেন ভালো লাগে গুলাবীর। বালিশের ওপরে তার মাথাটা অস্থির হয়ে ডানদিকে বাঁদিকে বারে বারে যেতে আসতে থাকে। উদ্দাম যুবা রঘুনাথ তার দেহ নির্যাসটুকু আজ এই আঁধার রাতে বুঝি নিঃশেষে ফুরিয়ে দেবে গুলাবীর দেহ আঁধারে, তলানীটুকুও আজ বাকি রাখবে না রঘুনাথ যাদব। একটুখানিও নয়।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

শনিচারী সম্ভবত আর কাজ করতে পারবে না। বিছানা ছেড়েছে বটে, কিন্তু বেশী হাঁটাচলা করতে পারে না সে। শনিচারীর ছেলে যোগবাণীতে কাঠের কলে কাজ করে। ওখানেই থাকে। সপ্তাহ এক দুই বাদে বাদে আরারিয়ায় আসে। সে এসে 'চৌধুরী হাভেলি'তে খবর দিয়ে গেছে। ফলে সত্যবতীর আর ছুটি হলো না। ব্যাপারটা অবশ্য সত্যবতী আর রঘুনাথ দুজনেই মেনে নিয়েছে। গুলাবীর কাজটাও রইল। আধা দিন কাজ করে সে চলে যায়। রঘুনাথ মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে 'চৌধুরী হাভেলি'তে যায় আসে। সেটাও বেশীরভাগ সকালের দিকে। গ্যারেজের মালিক হরিবিষ্ণু সে সময়টা কাজ চালিয়ে দেয়। দীনু, ছোটকু এরা আসার আগেই পৌঁছে যায় রঘু। সাইকেলে মিনিট পনেরোর রাস্তা। ঠিক ঐ সময়টাতেই কাজে আসে

BanglaBook.org

গুলাবী। ফলে মাঝে মাঝেই দুজনের দেখা হয়ে যায় হাভেলির ফটকের কাছে। ও বাড়ীতেমায়ের সঙ্গে রঘুনাথের দেখা করতে যাবার সময়টা, আর, ও বাড়ীতে গুলাবীর কাজ করতে যাওয়ার সময়টা কেমন করে জানি কাছাকাছি হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, মায়ের খবরের জন্যে ইদানীং রঘুনাথের ব্যস্ততা যেন কিছু বেড়ে গেছে। বেশ ঘন ঘনই রঘুনাথ মায়ের খবর নিতে চৌধুরী হাভেলিতে যায় আসে।

তিন চারদিন আরারিয়ার বাইরে ব্যবসার কাজে চলে গিয়েছিল চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। দুর্গাপূজোর আর বড় জোর ১৫ দিন বাকি। চিরঞ্জিলাল গত দু বছর ধরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব করছে। বাড়ীতে কুমোররা প্রতিমা তৈরীর কাজ করে দেয়। প্রায় মাস দেড়েক আগে থেকে 'চৌধুরী হাভেলি'র নাটমন্দিরে এবারও কুমোররা প্রতিমা গড়ছে। খুড়তুতো ভাই রূপলালকে দায়িত্ব দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল চিরঞ্জি। আসল কাজই থাকে শেষের দিকটায়। ব্যবসার সূত্রে কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, পশ্চিম দিনাজপুর ঘুরে আজই তার আরারিয়ায় ফিরে আসার কথা। গত কদিন গুলাবীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল সাবিত্রী। অবশ্য এর মধ্যে অন্তত দুদিন এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছে রঘুনাথ। একদিন সাবিত্রীর চোখে পড়ে গেছে রঘুনাথ আর গুলাবীর একটু অন্তরঙ্গ মেলামেশার একটা ঘটনা। গুলাবীকে একটু বকেছিল সাবিত্রী — "যদি রঘু তোকে বিয়ে করে তবেই ওর সঙ্গে কথা বলবি। আর, যদি শুধু ফষ্টিনষ্টি করবে বলে মেলামেশা করে তবে তোকেও আমি দূর করে দেবো এ বাড়ী থেকে। এই আমি বলে রাখলাম গুলাবী। একবার ঐসব করে নিজের সর্বনাশ হয়েছিল সে কথা ভুলে গেছিস?"

কোনো জবাব দেয়নি গুলাবী। পরেরদিন যখন 'চৌধুরী হাভেলির' ফটকে দেখা হয়েছিল রঘুনাথের সঙ্গে, তখন তাকে বলেছিল মালকিন কাকীর কথাগুলো। রঘু ওকে বলেছিল— "তুই পারলে কাল সন্ধ্যায় আমার কাছে আসিস। তোকে একটা জিনিস দেখাবো।"

শরৎ এসে গেছে। আকাশ প্লাবিত করে বইছে আকাশী নীলের বন্যা। মৃদু বাতাসে তাড়িত হয়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের স্তূপ নোঙর ছেঁড়া বজরার মতো সেই মহাসাগরের এপাশে ওপাশে অলসভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভোরবেলা বাতাসে শিউলির সুঘ্রাণ। আকাশ জোড়া নীলের কোলে কোলে সাদা কাশের গুচ্ছ— পুকুরভরা শাপলা আর শালুকের রক্তিম আমন্ত্রণ। মাঠে কচি ধানের সবুজ সমারোহ। কোশি নদীর ধার দিয়ে দিয়ে উঁচু পাড় ধরে

BanglaBook.org

হেঁটে হেঁটে আসছিল গুলাবী। আজই সকালে রঘুনাথ তাকে বলে গেছে, সন্ধ্যায় সে কি একটা দেখাবে তার ঘরে। বেলা প্রায় শেষ করে গুলাবী হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল রঘুর ঘরে। আজ গ্যারেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছে রঘু। বেশী রাত হয়ে গেলে সৎমা জান্‌কী খ্যাচ খ্যাচ করে। ছোট ছেলেটাকে নিয়ে জান্‌কীকে ঝামেলা সহ্য করতে হয়, গুলাবী থাকলে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় ছোট্ট রামুর দায়িত্ব।

কোশি নদীর ওপারে সূর্য অনেকক্ষণ ঢলে পড়েছে। এখন আকাশে আর লাল রং নেই। কেমন একটা বিষণ্ণ হরিদ্রাভ বর্ণের দুই প্রান্ত জোড়া বিস্তার। এই আলোকেই বোধহয় কারা যেন নাম দিয়েছে 'কনে দেখা আলো।' এক রকমের শূন্যতা আর দুর্বার কৌতূহলের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছিল গুলাবী। গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে থাকে রঘুনাথ। টিনের চালের একখানা ঘর। মা আর ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। পাশের ঘরটা আরো ছোট। খাপরার চালা। এখন কেউ থাকে না সেখানে। বিয়ে করলে তখন হয়তো সত্যবতীর আস্তানা হবে সেটা।

পথে আসতে আসতেই দেখা হয়ে গেল রঘুর সঙ্গে। সাইকেল নিয়ে বাড়ী ফিরছিল সে। গুলাবীকে দেখে নেমে পড়ে বললো— "হাঁটবি কেন, ওঠ্ পিছনে। নিয়ে যাই।" দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে গুলাবী— "রঘুদা, তোমার মাথাটা একেবারে গেছে। তোমার সঙ্গে আমি এক সাইকেলে যাবো? লোকে দেখলে কি বলবে?"

একটা চোখ টিপে হেসে রঘু বলে, "এক বিছানায় শুতে তো তোর আপত্তি দেখলাম না। এক সাইকেলে বসলেই যত দোষ?" হাসতে লাগলো গুলাবী। বললো— "আর তো এসেই গেছি, চলো না একসঙ্গে দুজনে হেঁটেই যাই।" না বলেনি রঘুনাথ। দুজনে যখন হেঁটে হেঁটে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো, তখন বাইরে ঐ আলোটা মিলিয়ে গিয়ে একটা শীতল আঁধার ঘিরে নিয়েছে খাপরা দিয়ে ছাওয়া রঘুনাথের দেড় কামরার আস্তানাটুকুকে।

ঘরের দরজা খুলে প্রথমে একটা লম্ফ জ্বালালো রঘুনাথ। তারপর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার চৌকির নীচ থেকে একটা টিনের হাতবা' বার করলো। বা'টা সহসা দেখা যায় না— এমন করে খড় বিচালির আস্তরণ দিয়ে ঢাকা ছিল। গামছা দিয়ে বাক্সটা মুছে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে তালাটা খুললো রঘুনাথ। "দেখ, এখানে প্রায় দু হাজার টাকা রেখেছি। পূর্ণিয়াতে থাকার সময়ে কিছুদিন নিজের একটা ট্যাক্সি করেছিলাম। ওটার রোজগারটা

BanglaBook.org

একদম খরচা করিনি। একদিন তো লাগবে, তাই জমা করে রেখেছিলাম ওখানকার ব্যাঙ্কে। পূর্ণিয়া থেকে এখানে চলে আসার সময় টাকাটা তুলে এনে রেখেছি এটার মধ্যে। এত তাড়াতাড়ি টাকাটার দরকার হবে, তা ভাবিনি। তবে হ্যাঁ, আরো কিছু টাকা জমা করতে পারলে ভাল। তখন তোকে নিয়ে আর কোনো অসুবিধা হবে না।"

অবাক চোখে টাকাগুলো দেখছিল গুলাবী। এত টাকা? কি করে জমালো রঘুদা? তাকে নীরব দেখে এক হাত দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দেয় রঘুনাথ। এক পাশ থেকে নিজেও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে। "কেমন হবে বল তো গোলাপ? তুই ভাবতে পারছিস?"

অপরিসর ঘরখানার আলো আঁধারিতে বসে কি সব ভাবছিল গুলাবী। শূন্য মনে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে জলছবির মতো অস্পষ্ট চিত্রমালা যেন সরে সরে যাচ্ছে — এক শ্যামলবরণ সুঠাম যুবাপুরুষ, বরবেশে তাকে বরণ করার জন্য দুহাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গুলাবী তাকে চেনে, কিন্তু জানে না। হয়তো তার একটা নামও আছে, কিন্তু গুলাবীকে সে নাম কেউ বলেনি। অথচ, বাস্তবে সত্যিই তার একটা নাম ছিল— সেই লৌকিক নামটা 'রঘুনাথ যাদব'। রঘুনাথ তার কে হয়? বাস্তবে সত্যিই কি সে কোনোদিন তার কেউ হবে? একথা ভাববার আগেই অন্ধকারে দুই হাত প্রসারিত করে সহসা গুলাবীকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয় রঘুনাথ।

আজ শারদ শুক্লপক্ষের সপ্তমী। 'চৌধুরী হাভেলি'তে দুর্গা পুজো হবে বলে ফিরে এসেছে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। হাভেলির চক্ মিলানো অন্দরের বহির্ভাগে বেশ বড় একটা খালি জায়গা আছে। গত কয়েকবছর সেখানেই প্যান্ডেল খাটিয়ে পুজোর আয়োজন হয়। একদিকে একটা বড় সিমেন্টের বেদী এবছর করে দিয়েছে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। আজ পুজোর শুরু। গত রাত্রেই প্রতিমার সাজসজ্জার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সকালে ঢাকের বাদ্যি শুরু হতেই দু-চার জন করে লোক আসতে শুরু হয়েছে। বাইরে সদর ফটকে দেবদারু পাতা আর রঙিন রাংতা দিয়ে গেট সাজানো হয়েছে। গেটের মাথার ওপরে সারি সারি রঙিন কাপড়ের লাল, নীল, হলুদ, কমলা রঙের পতাকা। এ পাড়ায় পুজো বলতে এই একটাই। তাই স্থানীয় লোকেদের এ বাড়ীর পুজো নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

সংসারের কোনো বড় কাজে আজকাল আর অংশ না নিলেও সাবিত্রী কিন্তু পুজোর দিনগুলোয় নিজেকে সরিয়ে রাখে না। পুজোর দিনগুলোয়

BanglaBook.org

ঠিকে কাজের লোকেরাও রাত দিনের হয়ে যায়। গুলাবীও গতকাল থেকে রয়ে গেছে। পুজোর কটা দিন তার আর বাড়ী যাওয়া হবে না। সত্যবতী রঘুকে বলেছিল— "তোর মনিবকে বলে চারটে দিন ছুটি নে না, রঘু? বড় বাড়ীতে পুজোয় কত কাজ। একটা জোয়ান ছেলে ঘরে থাকলে কত সাহায্য হয়।"

এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল রঘুনাথ। ঐ কদিন তাহলে গুলাবীর সঙ্গে তার রোজ দেখা হবে। মনিব হরিবিষ্ণু প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করেছিল। তবে, যখন দেখলো— পুজোর কদিন দীনু ছোটকারা কেউই আসবে না, তখন রঘুকে ছেড়ে দিতে সে আর অরাজী হয়নি। রঘু আজ সকাল থেকেই চলে এসেছে 'চৌধুরী হাভেলি'তে। নতুন জামা কাপড় কিছু কেনেনি সে। গোপনে একটা শাড়ী কিনে গুলাবীকে দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কেন কে জানে, শেষ পর্যন্ত সে সাহস তার হয়নি। গুলাবী তার কাছে মাঝে মধ্যে রাতের দিকে আসে বটে। কিন্তু গুলাবী সঠিক কি ভাবে তার সম্বন্ধে— সেটা পুরোটা বুঝতে পারে না রঘুনাথ।

সাবিত্রী পূজা মণ্ডপে এসেছে। সঙ্গে এসেছে গুলাবী আর সত্যবতী। তিনজনের পরণেই নতুন কাপড়। সাবিত্রীর শাড়ীটা ঘিয়ে রঙের লাল পাড় গরদ। সত্যবতীর সাদা মিলের শাড়ী, কালো হালকা নক্সার পাড়। গুলাবীর ছাপা ফুল ফুল নক্সার শাড়ী। দু হাতে লাল আর সবুজ এক গোছা বেলোয়ারী চুড়ি। কাকীর সঙ্গে এক সাথে নৈবেদ্য সাজানোর কাজ করছে সে।

চৌধুরী চিরঞ্জিলাল এলো পুজোর জায়গায়। গত রাত্রে দেরীতেই সে বাড়ী ফিরেছে। দেরী করে ঘুমাতে গেলে সকাল সকাল সে ওঠে না। কিন্তু আজ পুজো। তাই হয়তো আগে আগেই বিছানা ছেড়ে চলে এসেছে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। গুলাবী মাটিতে বসে পুজোর গোছানোর কাজ করছিল। চিরঞ্জি তার দিকে এক নজর চেয়ে দেখলো। আঁচ করার চেষ্টা করছিল গুলাবীর শাড়ীটাকে। এ শাড়ী তার চেনা শাড়ী নয়। মনে মনে বিরক্ত হলো চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। গত মাসেও কড়কড়ে একশো টাকার একটা নোট মেয়েটার হাতে সে গুঁজে দিয়েছে। পুজোর কাজের ফাঁকে নজর এড়ায় না সাবিত্রীর। সে গুলাবীকে বলে, "দেখে আয় তো কাঠের বড় বারকোশগুলো ধোওয়া হয়েছে কিনা। সবগুলো ধুয়ে তবে একসঙ্গে নিয়ে আসবি, গুলাবী।"

ইঙ্গিতটা বোধহয় বুঝতে পারে চিরঞ্জিলাল। ছড়িটাকে দুহাতে ধরে নিয়ে

BanglaBook.org

পুজোমণ্ডপ থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় সে। হাতের কাজ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রেখে সেদিকে চেয়ে ছিল সাবিত্রী। স্বামীকে চলে যেতে দেখেও সে কিছু বললো না।

রঘু এসে প্রণাম করলো সাবিত্রীকে। "ঠাকুরের সামনে কাউকে প্রণাম করতে নেই বাবা।" বললো সাবিত্রী। রঘু একবার এদিকে ওদিকে তাকালো। তারপর বললো— "গোছানোর কাজ তো দেখছি এখনো অনেক বাকি। নৈবেদ্য আর প্রসাদ রাখার থালা কোথায়? আমি দেখে আসবো, কাকী?" কথা শেষ হতেই গুলাবীকে অন্দর মহলের দরজার কাছে দেখতে পেল রঘু। দুহাতে দুটো কাঠের বিরাট বারকোশ নিয়ে আসছিল সে। গুলাবীর নতুন শাড়ীটা দেখলো রঘু। এ শাড়ীটা নিশ্চয়ই এ বাড়ীর চৌধুরী মালকিন কিনে দিয়ে থাকবেন। যাক্, তবু উৎসবের দিনে একটা নতুন শাড়ী হলো তার।

— "তুমি বরং বাইরে গিয়ে দেখো, লোকজন যারা আসছে, তাদের ভিতরে আসার রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্যেও তো কাউকে দরকার হয়। এখানকার কাজ আমরা মেয়েরাই সামলে নিতে পারবো। ঠাকুরমশাই যেমন যেমন বলে দেবেন— তেমন হয়ে যাবে। তুমি বরং বাইরের দিকটায় নজর রাখো।" বললো সাবিত্রী।

রঘু বাইরের দিকে চলে গিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ দেখলো গুলাবী আসছে। ওর কাছে এসে গুলাবী বললো— "পরবের দিনে সবাই কিছু না কিছু নতুন কাপড় পরে। তুমি একটা নতুন কিছু পরলে না?" তারপর এপাশে ওপাশে দেখে নিয়ে রঘুর হাতে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে— "একটা জামা বা গেঞ্জিও তো নতুন পরতে পারতে। ওবেলা একটা নতুন কিছু এনে পরবে কিন্তু।"

— "দূর! পুজোতে নতুন জিনিস পরে মেয়েরা, বৌরা আর বাচ্চারা। আমি কি তাই? তোকে একটা নতুন কাপড় দেবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল রে গোলাপ, তুই এ টাকাটা রাখ। আমাকে দিয়েছিলি, এটা এখন আমার টাকা। আমি তোকে দিচ্ছি।"

গুলাবীর হাতে টাকাটা গুঁজে দিতে গিয়ে বেসামালে নোট দুটো হাত থেকে পড়ে যায় রঘুর। ঠিক ঐ সময়ে ভিতর থেকে ফটকের দিকে আসছিল চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। দূর থেকে ঘটনাটা তার চোখে পড়েছে। কাছে এসে কঠোর গলায় গুলাবীকে সে বলে— "তুই ভেতরে যা গুলাবী। মালকিন কি তোকে ফটক সামলাতে এখানে পাঠিয়েছে?" তারপর রঘুকে বললো সে—

BanglaBook.org

"তুমিই বুঝি আমাদের নতুন কাজের বৌ সত্যবতীর ছেলে? বিনা দরকারে মাঝে মাঝে হাভেলিতে যাওয়া আসা কর শুনছি। পুজোর পরে এ বাড়ীতে যেন আর তোমাকে দেখতে না পাই। দরকার হলে মাকে এ বাড়ীর কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারো। মালকিন নতুন লোক দেখে নেবে।" অপমানে দুটো চোখ জ্বলছিল রঘুনাথের। নেহাৎ মা এখানে থাকে বলে সে কিছু জবাব দিল না। জুতোর খটখট আওয়াজ তুলে চলে গেল চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল রঘু। ততক্ষণে সেখান থেকে চলে গেছে গুলাবী। মনে হয় আজ আর সে ফটকের কাছে আসবে না।

গুলাবীর বেইমানী সহ্য করতে পারছে না চিরঞ্জিলাল। গত দু'তিনবারে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গেছে সে। তবু পুজোয় তার দেওয়া নতুন শাড়ীটা পর্যন্ত সে পরলো না। এতখানি অপমান সহ্য হচ্ছিল না চিরঞ্জির। সাবিত্রী সব সময়ে মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখে। কাছে ঘেঁষতে পারে না চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। অথচ গুলাবীকে দেখে রক্ত উদ্দাম হয়ে ওঠে তার। ষাটোর্ধ্ব স্খলিত যৌবন নারীসঙ্গ লালসায় চকচক করতে থাকে চৌধুরী ঠাকুর সাহেবের। এমনিতেই সে কব্জা করতে পারছে না গুলাবীকে। এর মধ্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো সাবিত্রীর কড়া সজাগ দৃষ্টি। পুজোর দিনে ফটকের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা হয় গুলাবী, আর নয়তো রঘুনাথ, কেউ হয়তো একজন কানে তুলে থাকবে সাবিত্রীর। সাবিত্রীর কাছে সমস্ত বিষয়টা যেন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। সাবিত্রী মনে মনে প্রায় স্থিরই করে ফেলেছে— পুজোপাট চুকে গেলে দেওয়ালী অথবা ছট্ পুজোর পরেই সে ছাড়িয়ে দেবে গুলাবীকে। গুলাবী যতদিন এ বাড়ীতে থাকবে ততদিন গুলাবীকে বা রঘুকে কোনো রকম অসম্মান থেকে সব সময়ে হয়তো তার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো চোখে দেখে সে। সুধা, সুমা, সুজাতা বাপের বাড়ীতে বলতে গেলে আসেই না। সংসার, ছেলে মেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ী, গোরু বাছুর সামলাতেই সবাই ব্যস্ত। পুজোতেও তাই তিন মেয়ের আসা হয়নি। এক মেয়ের নিজেদের বাড়ীতেই তো পুজো হয়।

এ বাড়ীতে গুলাবীর কাজটা চলে গেলে মেয়েটা বিপদে পড়বে। এখনো দুটো পয়সা ঘরে নিয়ে আসে বলে সৎমা জানকীর কাছে তার খানিকটা কদর আছে। সেটা চলে গেলে রাতদিন সৎমায়ের জ্বালা সহ্য করতে হবে

BanglaBook.org

মেয়েটাকে। গুলাবীর জন্যে নানা চিন্তা মাথায় আসে সাবিত্রীর। একটা স্থায়ী কোনো রোজগার ওর জন্যে ব্যবস্থা করে দেওয়া গেলে ভালো হতো। কবে মেয়েটার বিয়ে হবে, রঘু আদৌ তাকে কোনোদিন বিয়ে করবে কিনা, জানে না সাবিত্রী। সেটা কি গুলাবী নিজেও ছাই ভালো করে জানে? তবে এ বাড়ীতে যে গুলাবীর আর থাকাটা নিরাপদ নয়, সেটা বিলক্ষণ বুঝে গেছে সাবিত্রী। সে মনে মনে ভাবে, সুযোগ বুঝে একদিন সে গুলাবীর সম্পর্কে কথাটা পেড়ে দেখবে চৌধুরীর কাছে। চৌধুরীর দুর্বলতা আছে গুলাবীর ওপর। ঐটাকে কাজে লাগিয়ে, তারই টাকাতে গুলাবীর জন্যে কিছু একটা যদি করে দেয় চৌধুরী সে ব্যাপারে একটা চেষ্টা করে দেখবে সে। দুপুরে একা একা ঘরে নিজের পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল চৌধুরী হাভেলির মালকিন সাবিত্রী দেবী চৌধুরী।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

সারাদিন হাঁফ ছাড়ার সময় পায় না ফুলমোতিয়া। মা শনিচারী আজকাল কিছুই করতে পারে না। বরং তার সব কাজই করে দিতে হয় ফুলমোতিয়াকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে পাশের বাগান থেকে শুকনো ডালপালা আর পাতা কুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে মাথায় চাপিয়ে ঘরে আনতে হয়। তখনো শনিচারী বা তিত্‌লি ঘুম থেকে ওঠে না। ফসল কেটে নেওয়া শূন্য মাঠগুলো শুকিয়ে যাওয়া ধানের গোড়া বুকে নিয়ে পড়ে আছে। কিছু দূরে দূরে খেজুর গাছগুলো এক মাথা কণ্ঠকিত ঝাঁকড়া শাখাপ্রশাখা আর ক্ষতবিক্ষত কাটাকুটির নক্সা শরীরে ধারণ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো কারো গলার কাছে ঝুলছে রসের মাটির কলসি। দু একজন 'গাছি' লুঙ্গিটাকে মালকোঁচা মেরে আটোসাটো করে আদুড় গায়ে হাতে কাস্তে নিয়ে গাছে উঠছে। গাছের নীচে পড়ে আছে বাঁশের বাঁকটা আর গোটা তিন চার কলসি। আজকের সংগ্রহ করা রসের গাঁজলা ভর্তি মুখ নিয়ে একগাদা মাছির মধ্যে কলসিগুলো অপেক্ষায় রয়েছে ঘরে যাবার। সে সব পাশ কাটিয়ে মাথায় বস্তার বোঝা নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটা দিল ফুলমোতিয়া। রোগা, শ্যামলা শরীর। সস্তা ছাপা শাড়ী, হাতে কয়েক গাছা সস্তা দামের ধাতুর চুড়ি। মাথার চুল তেলের অভাবে লালচে হয়ে শনের মতো দেখতে লাগে। শূন্যপদ পায়ের পাতা ঘিরে এক

BanglaBook.org

চিলতে দুটো রুপোর তোড়া। এখনই ঘরে ফিরে প্রথমে একটু জল গরম করে দিতে হবে মায়ের জন্যে। দেওয়ালীর পরই ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। গরম জল না করে দিলে হাত মুখ ধুতে পারে না শনিচারী। চুলো জ্বালাতে হবে, তারপর গোরু দুয়ে দুধটা জ্বাল দিতে হবে, তিত্‌লি খাবে। কালকের একখানা বাসি রুটি সে রেখে দিয়েছে তিত্‌লির জন্যে। গরম দুধে রুটিগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভিজিয়ে দেবে তিত্‌লিকে। তিত্‌লি একাই নিয়ে খেতে পারবে কাঁসার বাটিটা থেকে। মায়ের অসুখের আগে ফুলমোতিয়া নিজের হাতে করে খাইয়ে দিত তিত্‌লিকে। কিন্তু সকালের দিকটায় মায়ের খিদমত করতেই অনেকটা সময় চলে যায়।

মায়ের মুখ ধোওয়ার গরম জল নিয়ে ঘরে ঢোকে ফুলমোতিয়া। সরু একটা খাটিয়ায় নোংরা লেপ তোষকের গাদার মধ্যে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে ডাকে শনিচারী— "তিতলিকে ঘুম থেকে তুলিস না। কাল থেকে ঘুম ভাঙলেই মা, মা, বলে কাঁদছে। দুর্ভাগা মেয়েটা, তা নইলে মা মরলো," আর বাপটাও গেলো মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে। আজ কার বোঝা কে টানছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শনিচারী— "আমারও কপাল মন্দ, তা না হলে মরণ হয় না কেন আমার।"

বিরক্ত হয় ফুলমোতিয়া। ইদানীং এই একই কথা রাতদিন বলে শনিচারী। দাদাটা স্বার্থপর। পাশের গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করে যোগবাণীর করাত কলে কাজ নিয়ে ভেগে গেছে। নেপালের সীমান্তবর্তী যোগবানীতে বিরাটনগর থেকে নানা বিদেশী জিনিস আসে। যখন দাদাটা গাঁয়ে ফিরে আসে, তখন নানা সৌখিন বিদেশী জিনিস বিরাটনগর থেকে চোরাপথে এনে পূর্ণিয়া, কাটিহারে বিক্রি করে। ভাল পয়সা পায়। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্যে পারতপক্ষে কোনো পয়সা বাড়তি খরচ করে না। অনেক কষ্টে ফুলমোতিয়া সবটা সামলায়। আগে শনিচারী চৌধুরী হাভেলিতে কাজ করতো, দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই হয়ে যেত। কিন্তু এখন তো সেসব বন্ধ।

মায়ের হাত মুখ ধুইয়ে, গোরুর দুধ দুয়ে ফুলমোতিয়া টেনে তোলে তিতলিকে। বছর দুই বয়স তিতলির। রোগা, ফর্সা শরীরটা। মাথায় কালো কালো কোঁকড়া চুল তেল না পেয়ে শুকিয়ে জটার মতো হয়ে গেছে। ঐ চুলে চিরুনী চালানো মাত্র ককিয়ে কেঁদে ওঠে মেয়েটা। চিরুনী রেখে দিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়েই ফুলমোতিয়া বাঁশের নলে মুখ রেখে চুলাটায় ফুঁ দিতে থাকে। শুকনো পাতা জ্বলে ওঠে চুলোর মুখটা গনগনে লালা রং করে।

BanglaBook.org

ছোট ডেকচিটায় কিছুটা দুধ নিয়ে বসিয়ে দেয় ফুলমোতিয়া। তারপর কালকের বাসি রুটিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে একটা বাটিতে দুধের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে মাটির উপর তিতলিকে বাটিটার সামনে বসিয়ে দেয়। এবার মাকে খাবার দেওয়ার পালা। সকালে মায়ের জন্যে খানিকটা তাজা ভাত বসায় ফুলমোতিয়া। বাসি পান্তা মা খেতে পারে না। রাত্রে শনিচারী রুটি খায়। ফুলমোতিয়া খায় ভাত। ঐ ভাত থেকে খানিকটা জল দিয়ে ঢেকে রাখে সে। মা আর তিত্‌লির খাওয়া হয়ে গেলে একটা আস্ত বড় পেঁয়াজ আর কাঁচা লংকা নিয়ে নিজে বসে যায় বাসি পান্তা খেতে।

জামাইদাদার খবর নেই অনেকদিন। তিত্‌লির জন্য প্রথম প্রথম জামাটা প্যান্টটা, এমন কি মাঝে মাঝে বিশ তিরিশ টাকাও দিয়ে যেত জামাইদাদা। কিন্তু যত দিন কেটে যেতে লাগলো— ততই তার যাওয়া আসা কমে যেতে শুরু হলো। এখন তো আর একেবারেই আসে না সে। অথচ, এই জামাইদাদা তো তাকেই প্রথমে দেখেছিল। গোপাষ্টমীর মেলায় কোশি নদীর ধারে ও-ই তো প্রথম ফুলমোতিয়াকে পুঁতির মালা কিনে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল — " বড় নাগর দোলায় আমার সঙ্গে বসলে দেখবে তোমার একটুও ভয় করবে না।"

কিন্তু কি যেন সব হয়ে গেল। ছেলেটাকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল দাদা আর মায়ের। আর, লোকটাও শেষ পর্যন্ত ফুলবর্ষিয়াকেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। ফুলবর্ষিয়ার গায়ের রংটা কটা ছিল, ফুলমোতিয়ার মতো শ্যামলা নয়। প্রায় বিনা পণেই দিদিকে বিয়ে করেছিল লোকটা। অথচ রঙ্গ করে ফুলমোতিয়াকে বলতো— 'শালী, আধা ঘরওয়ালী।' এসব মনে আছে ফুলমোতিয়ার। কিন্তু মনে পড়াতে চায় না সে। এখন শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। তিত্‌লি যদি তারই কোলে আসতো — তবে তাকে কি ফেলে দিতে পারতো ফুলমোতিয়া? তিত্‌লির জন্ম দিতে গিয়েই মরে গেল দিদিটা। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে দিয়েছিল জামাইদাদা। বলেছিল— "মেয়েটা তোর বলেই মনে করিস রে ফুলমোতিয়া। সত্যিই ও তোরই তো হতে পারতো।" সেদিন থেকেই ফুলমোতিয়া তিত্‌লির আর এক-মা, মাসী নয়। ফুলমোতিয়া বুঝেগেছে— তিত্‌লিকে সুদ্ধ তাকে কেউ বিয়ে করবে না। অত সাহসী ছেলে এই বিহারে নেই। এমনিতেই তো পণের খাঁই প্রচুর। এর ওপর ফুলমোতিয়া কালো, রোগা, কোলে আবার একটা বাচ্চা।

আরারিয়াতে এখন কোর্টও তৈরী হয়েছে। আগে মামলা মোকর্দমা

BanglaBook.org

করতে হলে পূর্ণিয়ার জেলা সদরে যেতে হতো মানুষকে। গ্রাম থেকেঁ অত দূরে সকলের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হতো না। দূর দূর গাঁ থেকে আরারিয়া কোর্ট স্টেশনে আসতে হতো পায়ে হেঁটে। একটা দুটো এক্কা গাড়ীর দেখা মিলতো দৈবাৎ। কারো অসুখ হলেও সেই একই অবস্থা। কাটিহার পর্যন্ত বড় লাইন। তারপর ছোট লাইন যোগবাণী পর্যন্ত। এতখানি ছোট লাইনে ট্রেন চলে সকালে একটা আপ, বিকালে দুটো ডাউন। তা-ও কয়লার জোগান না থাকলে কোন কোন দিন দুটো ডাউনের জায়গায় একটা হয়ে যায়। যোগবাণীতে করাত কল একটা আর চিনির কল একটা ছিল। মজুরের অভাবে চিনির কলটা বন্ধ হয়ে গেছে। আগে দুমকা থেকে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ চিনির কলে কাজ করতে আসতো। এখন আর এদিকে আসতে চায় না ওদিকের সাঁওতালরা। রামপুরহাট আর আহমেদপুর-এ নতুন চিনির কল হয়েছে। দুমকার কাছে বলে সাঁওতালরা এখন ওখানে কাজ করা-ই পছন্দ করে, কারণ, বাড়ীর কাছে পিঠে হয় খানিকটা। আরারিয়াতে কোর্ট বসলে কি হবে, ছেলেদের স্কুল আছে একটাই। কাছাকাছি বলতে গেলে কেন কয়েকটা স্টেশন পরে ফরবেশগঞ্জে আছে আর-একটা। ওখানে মেয়েদের জন্যে একটা মিড্‌ল স্কুলও হয়েছে। তবে, আরারিয়াতে কোর্ট উপলক্ষে আশেপাশে যথেষ্ট দোকানপাট বসে গেছে। স্টেশনের কাছের দোকানগুলোয় বিদ্যুৎ আছে। কোর্ট এলাকার দোকানগুলোয় রাতে কারবাইডের আলো জ্বলে। যাদের ব্যবসা একটু বড়—তারা ব্যাটারীর আলো জ্বালায়। বিক্রিবাটা ভালই হয়।

আজ একটু সকাল সকাল মোটর গ্যারেজ থেকে ফিরে এসেছে রঘুনাথ। সত্যবতী দুখানা কাপড় আর একটা গামছা চেয়েছিল। স্টেশনের পাশ দিয়ে এখন সারি সারি কয়েকটা শাড়ী আর ছোটদের জামা কাপড়ের দোকান হয়েছে। একটা দোকানে ঢুকে সাদা জমির কালো ফুলপাড় দুখানা মিলের শাড়ী নিল রঘু। আর একখানা সস্তা সিল্কের রঙিন শাড়ী পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেখে দিল সে। একখানা গামছা কিনতে হবে। নিজের জন্যও লাগবে আর একটা। এ মাসে আগাম কিছু টাকা চেয়ে নিয়েছিল হরিবিষ্ণুর কাছ থেকে। খাপরার ঘরখানা টিন দিয়ে এবছর না ছাইলে আগামী বর্ষায় আর ঘরে থাকা যাবে না। সামনের চৈত্র বৈশাখ মাসেই কালবৈশাখী ঝড় উঠলে খাপরার ছাদ রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। অ্যাসবেস্টস্ না কি যেন একরকম জিনিসের ছাদ হয়। কিন্তু তাতে খরচা

BanglaBook.org

বেশী। আপাতত টিনেরই চেষ্টা করতে হবে। বিয়ের পরে টিনের ঘরে বেশী গরম লাগলে ভিতরে দরমার চালা লাগিয়ে নেবে সে।

মায়ের জন্য কাপড় আর গামছা কিনে ঘরে এসে অন্য সমস্যাটার কথা মাথায় এলো রঘুনাথের। গত দুর্গা পুজোর সময় চৌধুরী চিরঞ্জিলাল তাকে শাসিয়ে বলেছিল — "পুজোর পর তোমাকে এ বাড়ীতে আর যেন না দেখি।" কথাটা মনে পড়ে যেতে মাথায় খুন চেপে গেল রঘুর। হাতের সিগারেটটা দুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রঘুনাথ বললো — "শালা"। কিন্তু মুখে সে যাই বলুক, মায়ের জিনিসগুলো বড় বাড়ীতে তো পৌঁছে দিতেই হবে। গুলাবীর কথা মনে পড়লো তার। গুলাবীকে দিয়ে ওগুলো পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু গুলাবীকে পাবে কোথায়? গুলাবীর সৎমা জান্‌কী একটা আস্ত হারামি। সে ওখানে গেলে নানা কথা তুলবে গুলাবীর নামে। ওর বাপটা বোধহয় পছন্দ করে রঘুকে। একবার সে গিয়েছিল গুলাবীদের বাড়ীতে। গুলাবী ঘরে ছিল না। ওকে ভিতরে নিয়ে চৌকিতে বসিয়েছিল জান্‌কী। কোলের বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে জান্‌কী গল্প করছিল। বাচ্চাটা মায়ের বুকের কাপড় ধরে টানাটানি করছিল দুধ খাবার জন্য। কাপড়টা বারবার সরে গেলেও ইচ্ছা করেই যেন জান্‌কী শাড়ীর আঁচলটা সামলাচ্ছিল না। মেজাজটা খাট্টা হয়ে গিয়েছিল রঘুনাথের। ছট্ পুজোর প্রসাদ ঠেকুয়া আর রেউড়ি খেতে দিয়েছিল জান্‌কী। কিছু না খেয়েই চলে এসেছিল রঘু।

সুতরাং, যতদিন না পর্যন্ত গুলাবী নিজে তার কাছে আসে — ততদিন মায়ের জিনিসগুলো বোধহয় ওখানে পাঠানো যাবে না। কিন্তু তাতে দেরী হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত নিজেই গিয়ে জিনিসগুলো মাকে দিয়ে আসবে বলে স্থির করলো রঘুনাথ। মালিক তো ওর মায়ের মনিব। শালা যদি দুটো গালাগালিও দেয় তবু সহ্য করে নিতে হবে। কারো গায়ে হাত তুলতে চায় না রঘু। এমন কি, যে শয়তানটা গোলাপের ইজ্জত নিয়ে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল — তাকেও কিছু বলতে পারতো না সে। রঘু বলে — 'কুকুর কুকুরের কাজ করবে, মানুষ করবে মানুষের কাজ।'

পরদিন সকাল সকাল সাইকেলের পিছনে কাপড় গামছার প্যাকেটটা নিয়ে রঘু রওনা হয়ে গেল চৌধুরী হাভেলিতে যাবে বলে। মনে মনে একটা আশা ছিল — যদি পথেই দেখা হয়ে যায় গোলাপের সঙ্গে, তাহলে জিনিসগুলোও তাকে দিয়ে দেওয়াও হবে, আবার দেখাটাও হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

ও জানে, বেশ সকাল সকাল গোলাপ ওখানে যায়।

কার্ত্তিক মাস প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ভোরের দিকটায় চারিদিকে একটা ঝাপসা ধোঁয়াটে কুয়াশা থাকে। রঘুর সাইকেলের হাতলদুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সীটটাতেও একটা ভিজে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ভাব। অত সকালেও একটা বুড়ি মাটির দেয়ালের বাইরে গোবর মেখে ঘুঁটে দিচ্ছে। রঘুকে দেখে হাত থামিয়ে বাঁ হাতে নোংরা থান কাপড়ের ঘোমটাটা আরো নামিয়ে কিছুক্ষণ নিথর দাঁড়িয়ে রইল। ময়লা কাপড়ের একটা পুঁটলি থেকে শুধু একখানা উল্কিতে জর্জরিত শীর্ণ হাত দেখা যাচ্ছে। রঘু ওকে পার হয়ে চলে যেতেই উল্কিশীর্ণ হাতটা আবার সচল হলো।

বড় বাড়ীর ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে কিছুটা সময় রাস্তার উল্টোদিকে সাইকেলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঘুনাথ। তারপর কি যেন ভেবে আস্তে আস্তে ফটকের দিকে পা বাড়ালো। ফটকের একটা পাল্লা খোলা। কেউ নেই পাহারায়। সাইকেলটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে ঢুকলো রঘু।

অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানা ছাড়েনি সাবিত্রী। গতকাল বোধহয় একাদশী ছিল। সারা রাত যন্ত্রণায় কেটেছে তার। বেশী রাত করে ঘরে এসেছিল চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। বোধহয় মদও কিছুটা গিলেছিল বাইরে কোথাও। একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল সাবিত্রীর। একটা তীব্র কটুগন্ধে ঘুমের ঝোঁকটা কেটে যেতেই দেখলো, চিরঞ্জিলালের বিরাট মাংসল মাথাটা ঝুঁকে পড়ে রয়েছে তার মুখের ওপর। থাবার মতো একটা হাত তার কাঁধে জাপটে ধরতেই এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দেয় সাবিত্রী।

— "শালী, সতীপনা করে করে জীবন কাটালি। তবু যদি একটা ছেলে দিতে পারতিস" — অস্ফুটে নোংরা কথাগুলো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো বড় হাভেলির মালিক চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। তারপর বিশাল বড় কোলবালিশটা টেনে নিয়ে সাবিত্রীর বাঁ দিকে শুয়ে পড়লো ও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটার ঘড়ঘড় নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। অন্ধকারে চিৎ হয়ে ওপরের কড়িকাঠগুলোর দিকে চেয়ে চোখ মেলে জেগে রইল সাবিত্রী। সে বুঝে গেছে যে, মানুষটা এখনো চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাইছে যদি একটা ছেলে পায়। কিন্তু সাবিত্রী জানে, তার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে। আর সন্তান ধারণের বয়স তার নেই। তবু লম্পট, কামুক লোকটা এই ষাট বছর বয়সেও রোজ চেষ্টা করে সাবিত্রীকে ভোগ করার। বিরক্তি লাগে সাবিত্রীর। লম্পটটার কাছে পঞ্চাশ বছরের সাবিত্রী আর

BanglaBook.org

বিশ বছরের গুলাবী — সবই শুধু ভোগ্য মাংস পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ শার্দুলের মতো প্রতি রাত্রে ঐ নারীমাংসর লোভ তাকে অস্থির করে রাখে।

গুলাবীকে নিয়ে সমস্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে — তাতে আর কতদিন যে সাবিত্রী তাকে এ বাড়ীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে — জানে না সে নিজেও। একমাত্র রাস্তা, ওকে এ বাড়ীর কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাতে মানসিক ভাবে খানিকটা কষ্ট পাবে সাবিত্রী। শারীরিক সেবার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ওর বদলী আর কাউকে দিয়ে মালিশ বা তার সেবাযত্নের কাজটা সে করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে। আচ্ছা, যদি সে গুলাবীর জন্যে একটা দোকান-টোকান কিছু করে দিতে পারে তো কেমন হয়? কথাটা মনের মধ্যে এক ঝলক উঁকি দিয়ে গেল সাবিত্রীর। অবসর সময়ে বাপটা চালাতে পারবে। রাত্রের দিকে সময় থাকে রঘুর। তখন সে-ও তো দোকানটা দেখতে পারবে? কিন্তু রঘুর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে না হলে সেটা কি সম্ভব? সাবিত্রী শুনেছে গুলাবীর কাছে — বিয়েতে নাকি মত হয়েছে রঘুর। শুধু, আরো কিছু টাকা সে জমিয়ে নিতে চায়। তার একার রোজগারে বাড়ীটা সারানো, দুজনের সংসার চালানো বোধহয় আজকের বাজারে সম্ভব নয়। চালের সের এক টাকা হয়ে গেছে। যে কোনো রকম আনাজ তিন আনা চার আনা সেরের নীচে নয়। এক জোড়া ডিমের দাম দু'আনা।

সাবিত্রী স্থির করে, একদিন রঘুকে একা ঘরে ডাকিয়ে এনে সে কথা বলবে তার সঙ্গে। যদি দোকান করতে চায় তো তবে সাবিত্রী কিছু টাকাও দিতে পারে। তার শ্বশুরের দেওয়া অনেক গহনাও রয়েছে লোহার সিন্দুকে। তিন মেয়ের বিয়েতে কিছু কিছু দেওয়া হয়ে গিয়েও এখনো কিছু কম নেই। সাবিত্রী নিজে বিশেষ কিছু গহনা পরে না। সুতরাং ওগুলো সিন্দুকে পড়েই রয়েছে। যদি কারো কোনো কাজে লাগে। তাহলে একসাথে দুটো কাজই হয়ে যায়। চৌধুরীর লালসার দৃষ্টি থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করাও যেমন যাবে — তেমনি কন্যাসমা তরুণীটির জীবনে একটা ভালোবাসার সংসারও সাবিত্রী এনে দিতে পারবে। তাছাড়া, গুলাবীর আকর্ষণ থেকে স্বামীকে ছাড়িয়ে এনে হয়তো নিজের সংসারকে স্বস্তি এনে দিতেও পারবে সে। আজই কাউকে দিয়ে রঘুকে খবর পাঠাবে বলে ভাবতে থাকে সাবিত্রী। কিন্তু, গুলাবীর সামনেই কি এসব আলোচনা করাটা ঠিক হবে? অবশ্য,

BanglaBook.org

কেনই বা ঠিক হবে না। কারণ, ব্যাপারটা তো গুলাবীকে বাদ দিয়ে নয়! তাছাড়া, তিন জনে একসঙ্গে কথা বললে সকলেরই মতামতটা জানতে পারা যাবে।

আজ যদি রঘু আসে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে — তবে ভাল হয়। আজই একটা কিছু কথা হয়ে যেতে পারবে। ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে এটা সিদ্ধান্ত করে নেয় সাবিত্রী। এখন তার ঘুম আসবে না।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

সাইকেলটা পাঁচিলের ভিতর দিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রঘু এসে দাঁড়ালো বার বাড়ীর দরজায়। এদিক ওদিক একবার দেখলো, যদি কাউকে পাওয়া যায়। এখনো গোলাপের আসার হয়তো সময় হয়নি। দেখতে পেল, রামজনম একটা গাড়ু নিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে আসছে। রঘুকে এত সকালে এখানে দেখে রামজনম জিজ্ঞাসা করলো — "এত সকালে, তুই? এটা কি তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করার সময় ? সে এখন কাজে থাকবে। দেখা করতে হলে দুপুরে আসবি। কাজের সময়ে নয়।" বাঁ হাতে ধরা নিমের ডালের দাঁতনটা সে মুখে ঢুকিয়ে চিবোতে থাকে। তারপর একদলা থুথু ফেলে আবার বললো — "পরে বেলায় আসিস, রঘু। এখন দেখা হবে না। মালকিন জানলে খুব রেগে যাবে। তুই এখন যা।" চলে গেল সে।

তবু দাঁড়িয়ে রইল রঘু। হাতে কাপড়ের প্যাকেটটা তার ধরা। এমন সময়ে দৈবাৎ হঠাৎ সেখানে এসে গেছে মা সত্যবতী। সাবিত্রী উঠে মুখ ধোবে। কল থেকে বালতিতে করে জল আনছে সত্যবতী। গুলাবী এসে ঐ জল গরম করে দিলে সকালে মুখ ধোবে মালকিন সাবিত্রী। রঘুকে বোকার মতো মুখে ওখানে একা এ সময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যবতী বলে— "ওমা, এমন সকালে তুই? গ্যারেজে যাবি না?"

— 'যাব।' বলে রঘু। হাতের প্যাকেটটা মায়ের হাতে দিয়ে বলে —"তোমার জন্য দুখানা কাপড় আছে। কার হাত দিয়ে পাঠাব বুঝতে পারছিলাম না। শেষে নিজেই নিয়ে এলাম। এখান থেকে গিয়ে গ্যারেজ

BanglaBook.org

খুলবো। একেবারে চাবি নিয়ে বেরিয়েছি।" তারপর এদিক ওদিক যেন কারো সন্ধানে দৃষ্টি মেলে হতাশ গলায় বললো— "ও আসে না আজকাল?"

কার কথা বলছিস্? গুলাবী?" লজ্জা পেয়ে যায় রঘু। এখনো পর্যন্ত এমন খোলাখুলি ভাবে গোলাপের কথা সে মায়ের কাছে বলেনি কোনোদিন। মায়েরা কেমন করে যেন সব বুঝে যায়! ছেলেদের মনের কোনো খবর মায়েরা অজানা রাখে না। হঠাৎ মাকে বড় আপন, বড় কাছের মনে হয় রঘুর। মাকে যেন সব বলা যায়; সে কথা দুঃখের হোক, সে কথা সুখের হোক, কিংবা সে কথা লজ্জার বা সঙ্কোচেরই হোক, কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে আসে রঘুর।

— "হ্যাঁ, মা। ওরই হাত দিয়ে তোমার জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু...."থেমে যায় রঘু। সত্যবতী কাছে এসে ওর মাথার এলোমেলো চুলগুলো ডান হাত দিয়ে কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলে — "গুলাবীকে তুই বিয়ে কর না, রঘু। মেয়েটা ভালো। কবে কি হয়েছিল তুই সবই তো জানিস। অভাবে পড়ে যা করার করেছিল।" মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর আবেগে চোখে জল এসে যাচ্ছিল রঘুর। তার অশিক্ষিত, দরিদ্রা জননী মনে মনে এত উদার, সন্তানের প্রতি বাৎসল্যে এত মহীয়সী — জানতো না রঘুনাথ। স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ পিতা সুরেশ যাদবের উপযুক্ত পত্নীই তার জননী সত্যবতী। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলো রঘু। মায়ের হাতটা কপাল থেকে সরাতে একটুও চেষ্টা করলো না সে। কে দেখে ফেললে কি ভাববে— সে কথাও মনে হলো না তার।

—"তোকে এ বাড়ীর বড়মা একবার আসবার জন্যে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবে বলছিল। ভালোই হয়েছে, আজ তুই নিজেই এসে গেছিস। একটু অপেক্ষা কর। আমি দেখে আসি। উঠে থাকলে তার অনুমতি নিয়ে তোকে নিয়ে যাব তার কাছে। দেখে আসি আমি।" বার বাড়ীর উঠানে রঘুকে একা রেখে অন্দরের দিকে চলে গেল সত্যবতী। রঘু একা একা এপাশে ওপাশে দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে। না, কেউ এখনো আসেনি। হয়তো আসবার সময় হয়ে গেছে। এখনই হয়তো এসে যেতেও পারে। ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে রঘুনাথ।

সাবিত্রীর ঘরে গিয়ে সত্যবতী দেখলো— সাবিত্রী উঠে বসে আছে

BanglaBook.org

খাটের ওপরে। ঠাকুর সাহেব নেই। সাবিত্রীর কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে সত্যবতী বলে — "আমার ছেলেকে আপনি ডাকার কথা বলেছিলেন, রঘু নিজেই এসে গেছে। আপনি অনুমতি করলে ডেকে আনি। বারবাড়ীর উঠোনে অপেক্ষা করছে ও।" উত্তরে কি বলবে মালকিন — তা আন্দাজ করতে পারছিল না সত্যবতী। খানিকটা সময় উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটবে তার।

— দাঁড়াও, দিদি। হাত মুখটা ধুয়ে নিই। তারপর ডেকে এনো ছেলেকে। তুমিও থাকবে। কিছু কথা বলবো বলে ভেবে রেখেছি। তোমারও থাকা দরকার।" বললো সাবিত্রী।

মাথার দিকের জানালাগুলো খুলে দিল সত্যবতী। পুব দিক থেকে এক ঝাঁক রোদ্দুর এসে লুটোপুটি খেলতে লাগলো লাল মেঝের ওপর। গরম জল আনার জন্যে সত্যবতী ঘরের বাইরে চলে গেল। এসব কাজ গুলাবীই করে। তার আসতে দেরী হলে কাজটা চালিয়ে দেয় সত্যবতী।

একটু পরে সত্যবতী বড় একটা ঘটিতে করে গরম জল আর পেতলের বিরাট একটা পিকদানী নিয়ে ঘরে এলো। তাকের ওপর থেকে লাল গুঁড়ো মাজনটা থেকে এক খাবলা গুঁড়ো তুলে দিল সাবিত্রীর বাঁ হাতের তালুতে। মুখ ধোওয়া হয়ে গেলে আঁচলে মুখ মুছে সাবিত্রী বলে সত্যবতীকে —"দিদি, ডাকো তোমার ছেলেকে। আমি কথা বলবো। আর অন্যদের বলো, এখন যেন এ ঘরে কেউ না আসে। শুধু গুলাবী যদি আসে, তবে সে একাই আসবে। আর কেউ নয়।"

বাইরেই চপ্পলটা ছেড়ে এসেছিল রঘু। তার পরণে খাকি হাফসার্টটা। আজ মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরেছে রঘু। সার্টটা ধুতির ওপর জানু পর্যন্ত ছড়ানো। সে সাবিত্রীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে একপাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

—"বেঁচে থাকো বাবা।" বললো সাবিত্রী — "তোমায় আসবার জন্য বলবো বলে কদিন থেকে ভাবছিলাম। তোমার মা তো এখানেই থাকে। ঘরে তুমি একা বাইরে বাইরে খাও দাও। ঘরে একটা বৌ না থাকলে এ বয়সের যুবক ছেলে কি একা থাকতে পারে? তাছাড়া, তোমার মা চোখ বুজলে তোমায় দেখবে শুনবেই বা কে?"

অনেকটা বুঝেও না বোঝার মতো মুখ করে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে থাকে রঘু। —"গুলাবীকে তুমি বিয়ে করো না, রঘু। মেয়েটা ভালো।

BanglaBook.org

আমি শুনেছি তুমি একটু টাকা জমিয়ে নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছো। টাকা হয়তো এবছর না হোক, দু'বছরে যোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের একটা ভাল বয়েস কি দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার জন্যে? ওদিকটা নিয়ে আমি একটা ভাবনা চিন্তা করেছি। এখন তুমি ঠিক করো ঐ টাকা দিয়ে কিভাবে কি করতে পারো। ধরো, আমার নগদ টাকা আর কিছু সোনাদানা নিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকার মতো হবে। এ দিয়ে একটা ব্যবসা-ট্যবসা কিছু হয় না কি?" জিজ্ঞাসা করে সাবিত্রী।

এতখানি আশা করেনি রঘু। স্বপ্নেও না। ভেবেছিল, হয়তো মালকিন কাকী তার সঙ্গে গুলাবীকে এ বাড়ীতে আর দেখা করতে দেবে না বলে শাসানোর জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। সে আর একবার সাবিত্রীর চরণদুটি দু'হাতে স্পর্শ করে প্রণাম করলো। তারপর বললো — "আমার ইচ্ছে ছিল, নিজের একটা গ্যারেজ করবো। এসব কাজ আমার ভালো জানা আছে। প্রথম প্রথম কাজ জানা একটা ছেলেকে পেলে দেখবেন আমি দাঁড়িয়ে যাব।"

—"বাঃ, বেশ বলেছ। তুমি সামনের মঙ্গলবারে একবার এসো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোলো — আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আর, আমি গুলাবীকে এর মধ্যে যা বলার বলে দেবো। দিদিকে মোটামুটি বলেছি সব। দিদির অমত নেই। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। আর হ্যাঁ, এসব কথা এখন কাউকে যেন বোলো না। এ বাড়ীর কাউকে তো কোনোদিনই নয়। বুঝলে?"

ঘাড় নাড়লো রঘুনাথ। সত্যবতী কোনো কথা বললো না। সারাক্ষণ সে চুপ করেই ছিল। ঘর থেকে তাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল রঘু। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সাবিত্রী।

এত আগে থেকে মালিক হরিবিষ্ণুকে কিছু জানানোর দরকার নেই। রঘুনাথ জানে, সে আছে বলেই হরিবিষ্ণুর মোটর গ্যারেজটা চলছে। আরারিয়া থেকে পূর্ণিয়ায় দুটো বাস চলাচল শুরু হয়েছে। মাঝামাঝি রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গেলে সাইকেলে লোক চলে এসে হরিবিষ্ণুকে খবর দিয়ে যায়। হরিবিষ্ণু পাঠিয়ে দেয় রঘুকে। অন্য কোনোরকম বড় ধরনের কিছু না ঘটলে বাস মালিক বাসটাকে কোনোভাবে চালিয়ে নিয়ে চলে আসে হরিবিষ্ণুর গ্যারেজে। পূর্ণিয়ায় দুটো গ্যারেজ হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় গাড়ীর

BanglaBook.org

চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাই সেখানে গেলে দু'একদিন অপেক্ষাতে থাকতে হয়। সেটা বাসের পক্ষে আর্থিকক্ষতি। তাছাড়া, হরিবিষ্ণুর গ্যারেজে চার্জও কম। ঠাকুরভক্ত হরিবিষ্ণুর টাকার খাঁই নেই। সংসার ছোট। কম টাকা হলেও চলে যায়। গ্যারেজে যে ছেলেগুলো কাজ করে — তাদের নিজের ছেলের মতো দেখে সে। রঘুকেও সে যথেষ্ট স্নেহ করে। সেই জন্যেই যত সমস্যা রঘুর। হরিবিষ্ণুকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে চলে যেতেও তার বাধছে। কি যে করবে ভেবে পায় না। হরিবিষ্ণু কেমন করে যেন আন্দাজ করে রঘুর এই ভাবান্তর। একদিন সে বলে ফেলে — "কি ব্যাপার রে, রঘু? আজকাল প্রায়ই তোকে কিছু আনমনা দেখি! ঝগড়া করেছিস মায়ের সঙ্গে?"

—"দুর! ঝগড়া করার জন্যে মাকে পাবো কোথায়! মা তো বড় হাভেলিতেই থাকে। তাছাড়া, ঝগড়া করার লোক আমার মা নয়।" হাসে রঘু।

— "তবে? জোয়ান ছেলে, একা থাকতে অসুবিধে হচ্ছে বলে মন খারাপ?" বেমক্কা প্রশ্নটা করে নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে হরিবিষ্ণু। ছেলের বয়সী ছেলেকে বাপ বয়সী লোক এমন কথা শুধায় না। তাই অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্যে সে বলে — "অস্টিন গাড়ীটার কারবুরেটারটা একটু দেখিস তো। জলের ট্যাঙ্কিটায় বোধহয় দু'এক জায়গায় লিক হয়েছে। ঝালতে হবে। বিরজুপ্রসাদ দু'দিন লোক পাঠিয়েছে।"

কোনো কথা না বলে অস্টিন গাড়ীটার বনেটটা খুললো রঘু। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলো —'দীনু, বড় রেঞ্চটা নিয়ে আয় তো। আর, একটু জুটও আনবি।'

গ্যারেজের ঘরে টাঙানো ঠাকুরের ছবিগুলোয় ধূপ দিচ্ছিল হরিবিষ্ণু। ডান হাতের কনুইয়ে বাঁ হাতের তর্জনীটা ঠেকিয়ে ডান হাতের আঙুলে ধরা জ্বলন্ত একগোছা ধূপ নিয়ে গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিগুলোয় আরতির মতো দেখাচ্ছিল সে। শেষ হলে ধূপের গোছাটা হাত সুদ্ধ মাথায় ঠেকিয়ে ছবিগুলোর কাছে বেড়ার গায়ে গুঁজে রাখলো হরিবিষ্ণু। তারপর, অস্টিন গাড়ীটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো রঘুকে — "কি দেখলি? ইঞ্জিন নামাতে হবে?"

কোনো জবাব দিল না রঘু। কিছুক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘেরা এক চিলতে অফিসঘরে গিয়ে বসলো হরিবিষ্ণু। এমন সময়ে

BanglaBook.org

রঘু দেখলো গুলাবী ঐদিকে আসছে। হাতের রেঞ্চটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে এগিয়ে আসে রঘুনাথ —"একি, এ সময়ে তুই? ও বাড়ী থেকে কাজ শেষ করে ফিরছিস? এ পথ তো তোর নয়, তবে?"

কাছে এসে দাঁড়ালো গুলাবী। বললো —"কথা আছে, একটু বাইরে আসবে, রঘুদা? আমার বাড়ী যেতে দেরী হবে। মাকে বলে এসেছি। তোমার সঙ্গে একটু বসতে চাই।"

কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল গুলাবীকে। ওকে একটু দাঁড়াতে বলে অফিসঘরটায় ঢুকলো রঘু। হরিবিষ্ণুকে বললো —"কাকা, একটু আসছি। কাজটা হয়ে যাবে। কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি বিরজুপ্রসাদকে বলো — রাতের দিকে একবার যেন খবর নেয়। হয়তো বিকেলের আগেই রেডি হয়ে যাবে। আমি মিনিট পনেরো কুড়ি বাদে আসছি।"

গুলাবীকে নিয়ে স্টেশনের কাছের যে হোটেলটায় সে খায় — সেখানে এক কোণে এসে বসলো রঘু। তারপর বললো — "বল্, কি কথা আছে।" চার দিকে তাকালো গুলাবী। এখনো ভাত খাওয়ার খদ্দেররা আসেনি। দু'একজন পরোটা, চা খাচ্ছে। তেমন লোক নেই। বেঞ্চিটার ওপর নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে সে বলে — "কাকী তোমায় টাকা দেবে বলেছে? তুমি নাকি ব্যবসা করবে? কই আমায় তো কিছু বলোনি?" অভিমানের সুর বাজে তার কণ্ঠে।

— "ওঃ! এই! আমি বলি বা আর কি না জানি! তোর অভিমান হয়েছে, গোলাপ? আমার আমি কি তোকে বাদ দিয়ে নাকি? আমার জানা-ও যা, তোর জানা-ও তাই। তোকে আজ না হোক কাল আমি বলতামই। আসল কথা, কিসের ব্যবসা করবো তা ঠিক করতে পরছি না। নিজের গ্যারেজ একটা করার বড় সখ ছিল। কিন্তু হরিবিষ্ণু কাকার সঙ্গে বেইমানীর কাজ করতে পারবো না। মন ওটা চাইছে না। আচ্ছা, তোর মন কি বলে?"

প্রশ্নটা গুলাবীর দিকে ছুঁড়ে দেয় রঘু। ব্যবসার কথা মাথায় আসে না গুলাবীর। একবার শুনেছিল, রঘু একবেলা করে এই ভাতের হোটেলে খায় বলে মাসে তিরিশ টাকা দিতে হয়। কত লোক খায় রোজ। মাসে তিরিশ টাকা করে যদি সকলে দেয়, তবে অনেক টাকা আসে মালিকের। তাই অন্য কিছু না ভেবে গুলাবি বলে, "আচ্ছা রঘুদা, আমরা একটা ভাতের হোটেল খুলতে পারি না? রান্নাটা তো আমি জানি। অন্য দিকটা

BanglaBook.org

তুমি দেখবে?"

প্যান্টের পকেট থেকে একটা চৌকো টিনের পাতলা বাক্স বের করে একটা বিড়ি ধরায় রঘু। রঘুর মুখ থেকে বিড়িটা টেনে বের করে নেয় গুলাবী। বলে —"বিড়ি খাবে না, রঘুদা। তুমি না আমার গা ছুঁয়ে একদিন কথা দিয়েছিলে?"

হাসলো রঘু। কাঠের ওপর জ্বলন্ত বিড়িটা ঘসে নিভিয়ে দিয়ে আবার কৌটোটার মধ্যে ভরে রাখে সে। তারপর বলে — "হোটেলের লাইনটা নতুন লাইন রে, গোলাপ। আমার ঠিক ও লাইনটা জানা নেই। তবে, জেনে যে নেওয়া যায় না এমন নয়। কদিন এখানকার গতিক নজর করলে বুঝে নেওয়া হয়তো কঠিন হবে না। তবে, আমার নিজের লাইনটা যত সহজ আমার কাছে কিন্তু সমস্যা হলো ঐ বেইমানীর। একটু ভেবে দেখি কদিন। টাকাটা হাতে এলে মগজটাও খোলে। কাকীকে কথাটা বলতে হবে। মাকেও। সকলের মতে আমার মত।"

হাতঘড়িটা দেখে নিল রঘু। তারপর বললো—"তুই এখন বাড়ী যা, গোলাপ। আমি অল্পক্ষণের জন্য বলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়েছি। তাছাড়া, এত সব কথা তো এখানে বসে একদিনেই সব হবে না। পরে যা কথা হবার হবে। এখন চল্, তোকে সাইকেলে করে এগিয়ে দিয়ে আসি। আগে গ্যারেজে চল।"

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গ্যারেজে ফিরে এলো। ছোটকুকে কাজের কথা বুঝিয়ে দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে গুলাবীকে সঙ্গে করে রাস্তার দিকে এগোলো রঘুনাথ। সাইকেলে বসলো না গোলাপ। পাশে পাশে হেঁটেই চললো। কে জানে কি শেষ পর্যন্ত করবে রঘুদা। বিয়েটা আগে হবে, না, ব্যবসা। বিয়ের কথা সে মেয়ে হয়ে মুখ ফুটে বলবে কি ভাবে? এবার কি ভেবে নিয়ে সে রঘুকে বলে —"আজ রাত্রে তোমার ঘরে যাব, রঘুদা? আরো কিছু কথা ছিল।"

—"কেন রে? নেশা লেগে গেছে বুঝি? হ্যাঁ রে, এ এক অবাক করা নেশা। তবে সাবধানে থাকতে হয়, বেসামাল হয়েছিস কি সর্বোনাশ!" ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসতে থাকে রঘুনাথ। তারপর বলে —"তোর সৎমা জানতে পারলে আমাকে আস্ত চিবিয়ে খাবে। কি মেয়েছেলে রে! পারলে যেন গিলে খায় পুরুষমানুষকে। তোর বাপটা, অতো চাল আর কাঁচকলার পিণ্ডি গিলে কি আর স্বামী হওয়া যায়? তাকত লাগে, বুঝলি?" বাঁ

BanglaBook.org

হাতে সার্টের ওপর থেকে ডান হাতের কাঁধের কাছটায় চাপড় দেয় রঘু। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছে দুজনে। রোদ বাড়ছে। আঁচলটা তুলে মাথার ওপর ছায়া করে নেয় গুলাবী। তারপর বলে—"তুমি ফিরে যাও, রঘুদা। আমি এখান থেকে একা-ই চলে যেতে পারবো। রাতে দেখা হবে। একটু সকাল সকাল ফেরার চেষ্টা করো। বেশী রাত হয়ে গেলে মা-টা নালিশ করে বাবাকে।"

চলে যায় গুলাবী। সাইকেলটা নিয়ে কিছুক্ষণ রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে রঘুনাথ। তারপর প্যাডেলে পা দিয়ে একটু চালিয়ে নিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ে সে। ততক্ষণে দূরে গুলাবীর শরীরটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সাইকেলের গতিটা বাড়িয়ে দেয় রঘুনাথ।

।। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।।

আগে থেকেই চেঁচাচ্ছিল জান্‌কী। অত বেলায় গুলাবীকে ফিরতে দেখে রাগে একেবারে ফেটে পড়লো সে। —"রঙ্গিনী ফিরলেন সারা সকাল কাজের নামে নষ্টামি করে! ঘরে রান্না করার জন্য কজন দাসী রেখে দিয়েছে তোর বাপ? আমাকে কি এ বাড়ীতে ঝি খাটবার জন্যে নিয়ে এসেছে, পূজারী ঠাকুর? কাল থেকে বাড়ীর রান্না সেরে তোর নাগরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে যাবি। আমি কারুর জন্যে ভাত রাঁধতে পারব না বলে দিলাম।" কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে শাড়ী গামছা নিয়ে পুকুরের দিকে চলে গেল গুলাবী। এতে রাগ আরো বেড়ে গেল জান্‌কীর। কোলের ছেলেটা কাঁদছিল চিৎকার করে। দুম্ করে রামুকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দুপদাপ শব্দ করে ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। শাম্‌লির জ্বর হয়েছে কাল থেকে। গতকাল সকালে তাই রান্না করতে হয়েছিল সৎমা জান্‌কীকে। কাল রাত্রে অন্য গ্রামে যজমানের বাড়ীতে চলে গেছে দশরথ। সকালের বাসি ভাত জল দেওয়া ছিল। রাতে ঐ পান্তা দিয়েই কাজ হয়ে গেছে। আজ সকালে গুলাবী ভোর ভোর চলে যাওয়ায় ছেলে কোলে নিয়ে রান্নাটা করতে হয়েছে জান্‌কীকে। তাই সকাল থেকেই তার মেজাজ এত গরম। সকালে এখনো ফেরেনি দশরথ।

চান করে এসেও কিছু করলো না গুলাবী। নিজে খেলও না কিছু।

BanglaBook.org

তাতেও চিৎকার জান্‌কীর —"উপোস করে থেকে বাপের কাছে আমার নামে লাগানোর ধান্দা? মজা আমি বের করবো বাপ মেয়ের! কাজের নাম করে সন্ধেরাত্তিরে কোন্ নাগরের কাছে কোথায় যাওয়া হয় — তা আমি জানি না? চোখ আমার চারদিকে আটটা। পাড়াসুদ্ধ মানুষকে জানিয়ে দেবো তোর কেলেঙ্কারির কথা।"

এবার আর চুপ করে থাকে না গুলাবী। সামনে এসে সোজা দাঁড়িয়ে বলে — "সেই আটটা চোখ একদিন আমি উপড়ে নেবো, বুঝলি? যত ভাবি কিছু বলবো না, ততই বেড়ে গেছিস! আমার বুড়ো বাপটাকে তুই যা দিয়ে কব্জা করে রেখেছিস — সেই জওয়ানি দিয়েই ধরে রেখেছি আমার 'নাগর'কে। বুঝেছিস? একদিন তোর ঐ 'জওয়ানি' আমি ঘুচিয়ে দেবো। আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না।"

এমন সময়ে বগলে বাঁশের বাঁকানো হাতলের লম্বা ছাতা নিয়ে পায়ে খড়ম পড়ে খটখট শব্দ তুলে উঠোনে এসে ঢুকলো দশরথ। স্বামীকে ঢুকতে দেখে এবারে অন্য অস্ত্র ধরে জান্‌কী। উচ্চকণ্ঠে কান্না জুড়ে দেয় সে। বলে — "আমার চরিত্র নিয়ে গাল পাড়ছে আমারই মেয়ে! মাগো, আমি কোথায় যাই? আমার মরণ হয় না কেন? তোমরা কে কোথায় আছ, এর একটা বিহিত করো।" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে জান্‌কী।

—"কি, কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি? সাত সকালে বাড়ীতে এত গোলমাল কিসের?" জিজ্ঞাসা করলো দশরথ। —"এই, গুলাবী! কি হয়েছে রে তোর মায়ের?"

— "রামুর মায়ের আবার কিছু হতে লাগে? ও এমনি এমনিই চেঁচাচ্ছে; আমাকে গাল পাড়ছে।" রেগে গেলে গুলাবী জান্‌কীকে 'মা' বলে না, বলে—'রামুর মা' কিংবা 'শাম্‌লির মা'। সেটা জানে দশরথ। তাই, তার বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঝগড়াটা আসলে কার সঙ্গে হয়েছে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি দশরথের। কাকভোরে যজমানের বাড়ী থেকে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়েছে সে। মাঝখানে এক জায়গা থেকে ট্রেন ধরতে পারতো। কিন্তু তিনটে ইস্টিশান আসতে এক টাকা ভাড়া লাগবে। পয়সাটা বাঁচালে এবেলা রান্না করার কাঁচা বাজারটা হয়ে যাবে। তাই ট্রেনের দিকে সে যায়নি। অথচ এই ষাট বছর বয়সে এত পরিশ্রমও সয়নো। এসব কারণে তারও শরীর বা মেজাজ কোনোটাই ভালো নেই। হঠাৎ সে রেগে গিয়ে গুলাবীর চুলের মুঠিটা ধরে এক ধাক্কায় তাকে

BanglaBook.org

দাওয়া থেকে নীচে ফেলে দেয়। বলে — "তুই-ই যত নষ্টের গোড়া; দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা এ বাড়ী থেকে! বড় বাড়ীর কাজটা ছেড়ে দিয়ে তুই কার সঙ্গে ভেগে যেতে চাইছিস — তা কি আমি জানি না মনে করছিস? কাজটা করলে ঘরে দুটো পয়সা আসতো! কিন্তু সংসারের কথা এ বাড়ীতে ভাবে কে? এই বুড়ো বয়সে আমাকেই দৌড়ে বেড়াতে হয় পয়সা, পয়সা করে।"

অভাবের সংসারে মাথার ঠিক থাকে না সত্যিই। কিন্তু তাই বলে আজ পর্যন্ত গুলাবীর গায়ে হাত তোলেনি কোনোদিন দশরথ। এমন কি, পূর্ণিয়ার সেই কেলেঙ্কারি কাণ্ডর পরেও।

কাপড়-চোপড় সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়ায় গুলাবী। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে — "চলেই যাচ্ছি আমি। আর এখানে থাকবো না। যার কাছে যাবার, তার কাছেই চলে যাব। নিজে রোজগার করে নিজে খাব। তোমরা মরো এখানে পড়ে থেকে।" কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে গেল গুলাবী। নির্বাক দর্শকের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে দশরথ। ততক্ষণে ঘরের ভিতরে জান্‌কীর কান্না থেমে গেছে।

বার বাড়ীর দরজার সামনেই দেখা হয়ে যায় চৌধুরী চিরঞ্জিলালের সঙ্গে। চিরঞ্জি জানে, কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিল গুলাবী। আবার তাকে ঢুকতে দেখে ইশারায় তাকে ঘরের ভিতরে ডাকলো চিরঞ্জি। — "কি হয়েছে রে, তোর? বাড়ীতে কারো অসুখ? মুখটা এমন লাগছে কেন রে? না, কি, ঝগড়া করেছিস মায়ের সঙ্গে?" একটু কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করলো সে। এরকম গলায় তাকে আগে কখনো কথা বলতে শোনেনি গুলাবী। হঠাৎ তার মনে হলো — এ বাড়ীতে কাকী ছাড়াও আরো অন্তত একজন আছে, যে গুলাবীর ভালো চায়।

আঁচলে চোখমুখ মুছে ভিতরে এসে দাঁড়ায় গুলাবী। বলে —"আমি চলে এসেছি। ওখানে আর থাকা যায় না। রাতদিন পয়সার জন্যে ঝগড়া।"

—"কি করবি তুই, ঠিক করেছিস? যদি চাস, আমি তোর জন্যে কিছু ভেবে দেখতে পারি। তোর জন্যে খুব মায়া হয় আমার, জানিস রে, গুলাবী?" এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে চিরঞ্জিলাল। এ সময়টা বার বাড়ীতে কেউ থাকে না; কেউ হঠাৎ করে চলেও আসে না। চিরঞ্জির হাতটা গুলাবীর মাথা থেকে কাঁধে নামে। কাঁধ থেকে বুকের কাছে নামছিল। গুলাবী কিন্তু বাধা দেয় না। চিরঞ্জি তাকে আরো একটু কাছে টানার

BanglaBook.org

চেষ্টা করে। অন্য হাতটা রাখে গুলাবীর পিঠের দিকে। —"আমার কথা তুই শুনিস না কেন রে, গুলাবী? তোকে আমার খুব ভালো লাগে। আমার কথা শুনে চললে তোর সব ব্যবস্থা আমিই করে দেবো। ঐ মিস্তিরি ছোঁড়াটা তোর জন্যে কি করতে পারবে? ওর মাকেই খাওয়াতে পারে না, হাভেলিতে কাজ করার জন্যে রেখে গেছে। তোর নিজের জন্যে কি করতে চাস, বলিস। পয়সার অভাব হবে না।"

গুলাবীর মাথার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে চিরঞ্জিলাল চৌধুরী — বয়সে যে তার বাপের থেকে আধকুড়ি বছর বেশী।

—"এক্‌টা ভাতের হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে কাকা, আপনি জানেন? কদিন ধরে ভাবছি, নিজের জন্য কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু..." আমতা আমতা করে থেমে যায় গুলাবী।

—"কিন্তু কি? টাকা? ঠিক আছে। যদি ভাতের হোটেলই খুলতে চাস, তবে সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। নদীর ধার দিয়ে এখন অনেক দোকান পাট, ছোট ছোট কারখানা হয়ে গেছে। খদ্দেরের অভাব হবে বলে তো মনে হয় না। ছোট করে প্রথমে শুরু করবি। পরে দেখা যাবে। ওখানে একটা খাস জমি আছে বাঁধের পাশ দিয়ে। এখানকার কর্তাদের সঙ্গে আমার খাতির আছে। বলে কয়ে খানিকটা জায়গা চেয়ে নিতে পারা যাবে বলেই তো মনে হয়। তুই এখন যা। এই টাকাগুলো রাখ। এখানে এসেছিলি বলে কাউকে বলিস না। তোর ভাতের হোটেল হয়ে যাবে। তুই ভাবিস না।" দেরাজ থেকে কয়েকটা বড় বড় নোট সে তুলে দেয় গুলাবীর হাতে। চলে যায় গুলাবী। যাবার আগে পিতৃসম চিরঞ্জিলালকে সে প্রণাম করে। তার মাথায় হাত রেখে কিছু একটা বলে চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। মুখে তার একটা পাশবিক হাসি জেগে ওঠে। সেটা দেখতে পায় না গুলাবী।

গুলাবী চলে যেতে আরাম কেদারাটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে চিরঞ্জিলাল। হোটেল একটা খুলে দিতে পারলে সেটা নিয়েই দিন কাটবে গুলাবীর। বাপের কাছে আর থাকতে হবে না। মিস্তিরি ছোঁড়াটাও কিছু করতে পারবে না। হোটেলের সঙ্গে লাগোয়া একটা থাকার মতো ঘর যদি থাকে — তবে গুলাবী ওখানেই থাকতে পারবে। চিরঞ্জি মাঝে মাঝে মেয়েটার খবর নিতেও যেতে পারে সেখানে। সাবিত্রীর বুড়ো পাহারা তো সেখানে থাকবে না। স্টেশনের পিছনের মোটর গ্যারেজ এখান থেকে অনেক

BanglaBook.org

দূর। ছোঁড়াটার সঙ্গে যখন-তখন যোগাযোগও করতে পারবে না গুলাবী। বোধহয় ভালই হবে হোটেলটা হলে। নিজের মনে একটু খুশীর ভাব হলো চিরঞ্জির। ছোঁড়াটা যদি বেশী ট্যাণ্ডাই মেণ্ডাই করে তবে, দরকার বুঝলে ওটাকে একেবারে জন্মের মতো .... কিংবা একটা মামলায় জড়িয়ে দিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন আর চিরঞ্জিলালকে পায় কে? গুলাবীর জন্যে রাতের ঘুম চলে যায় তার। কোমর থেকে উরু পর্যন্ত একটা অস্থিরতা চিরঞ্জিকে রাতদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সাবিত্রীকে দিয়ে আর কিছু হবে না। একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। পুরুষমানুষের কি মেয়েছেলে না হলে চলে? ষাট বছর হয়ে গেলে কি হবে, চিরঞ্জি তো পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষের আবার বয়স কি? বুড়ো হলেও পুরুষমানুষ পুরুষমানুষই। নিজেকে নিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমের তন্দ্রা এসে যায় ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরীর। ভৃত্য ধনিয়া এসে ডাকে — "বাবু, আপনার চানের জল তুলে দিয়েছি। তেলটা মাখিয়ে দিই।" বড় বাটিতে করে সর্ষের তেল এনেছে ধনিয়া। আগে এসব হতো না। সাবিত্রীর দেখাদেখি তেল মালিশটা শুরু করেছে চিরঞ্জি। এসব করলে দেহটা একটু চাঙ্গা হয়। শরীরে তাকত বাড়ে। জেল্লা-ও।

উঠে দাঁড়ায় চিরঞ্জি। তারপর ধনিয়াকে বলে —"আচ্ছা ধনিয়া, তুই বলতে পারিস — বাঁধের ধারের দোকানের লোকগুলো দুপুরে কোথায় খায়? সারাদিনের চা-টা কোথায় সারে?" এরকম একটা আজব প্রশ্ন শুনে হঠাৎ অবাক হয়ে যায় ধনিয়া। কিন্তু মনিব তাকে যে কোনো কারণে হঠাৎ কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে — বুঝতে পেরে সে বিজ্ঞের মতো বলে — "কোথায় আর খাবে? ঘর থেকে যে যার মতো খেয়ে আসে। ওখানে তো খাবার মতো জায়গা নেই!"

— "হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। আচ্ছা, ওখানে একটা হোটেল হয়নি কেন বল্ তো? তাহলে তো ঐ লোকগুলোর সুবিধা হতো। আচ্ছা, ওখানে একটা হোটেল খুলে দিলে কেমন হয়? চলবে না?"

—"কেন চলবে না কর্তা। তবে চালাতে জানতে হবে। কে চালাবে হোটেল?" প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় ধনিয়া।

—"সেটাই এখন ভেবে দেখতে হবে। চল্ এখন, চানটা সেরে নেবো আগে। আজ আর তেল নয়। বেলা বোধহয় দুটো বেজে গেছে।" দুজনে উঠে যায় ঘর থেকে।

BanglaBook.org

বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে কি করবে, কোথায় যাবে — প্রথমে কিছু ঠিক করতে পারে না গুলাবী। জামার মধ্যে গোঁজা রয়েছে চিরঞ্জিলালের দেওয়া নোটগুলো। চিরঞ্জির কথাগুলো মনে মনে ভাবছিল সে। ভাতের হোটেল একটা খোলবার মতো অতো টাকা কি সত্যিই দেবে কাকা তাকে? কিন্তু, কেনই বা দেবে? যদি সত্যিই দেয় — তবে একা হোটেল চালাতে পারবে কি গুলাবী? হঠাৎ সংসারে সকলের ওপর কেমন একটা রাগ হয়ে যায় তার। বাপ, মা, সকলকে চেনা হয়ে গেছে গুলাবীর। পূর্ণিয়ার লোকটাকেও। ঐ ঘটনার পরে এতকাল কেটে গেছে। কই, তেমন করে তাকে কিছু বলে না তো রঘুনাথও! বিয়ে যদি তাকে তার করার ইচ্ছে সত্যিকার থাকতো — তবে এতদিন অপেক্ষা করা কেন? কবে তেমন টাকা জমবে — সেই আশায় কতকাল তার যৌবন নিয়ে অপেক্ষা করবে গুলাবী? কিন্তু কাকার কথা কি গুলাবী বলবে রঘুকে? কাকা তো কাউকে এসব কথা বলতে বারণ করে দিয়েছে। সত্যি যদি তার নিজের একটা হোটেল হয় তবে তাতে জান্ লাগিয়ে দেবে গুলাবী। নিজে রান্না করতে জানে সে। তাছাড়া, তেমন বড় হোটেল তো হবে না। সাধারণ মাছ ভাত, মাংস ভাত কি ডিম ভাত সে দিতে পারবে খদ্দেরকে। একটা ছোঁড়াকে রেখে দেবে খাবার দেওয়ার কাজের জন্যে। হিসেবপত্তর নিজেই মোটামুটি রাখতে পারবে। রঘু এ ব্যবসাতে না এলেও একাই চালিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না গুলাবীর।

পায়ে পায়ে গুলাবী চলে আসে কোশি নদীর কাছে সেই জায়গাটায় — যেখানকার কথা বলেছিল কাকা চিরঞ্জিলাল। সারি সারি দোকান। মনিহারী, মুদি, স্কুলের বইপত্র। এ্যালুমিনিয়াম আর পেতলের বাসনপত্রের দোকান। আন্দাজে গুনে দেখলো গুলাবী। প্রায় গোটা তিরিশের মতো। দুটো লেদ মেশিনের দোকান। চার পাঁচটা করে ছেলে সেখানে কাজ করে। মনে মনে একটা হিসাব করার চেষ্টা করে সে। বত্রিশটা দোকানে যদি গড়ে দুজন করে তার হোটেলে ভাত খায় — তবে রোজ ৬০/৬৫ জন খদ্দের হবে। এর মধ্যে মাসকাবারী খদ্দের হলে আরো ভাল। আবার সে কাকার কাছে যাবে। কথা বলবে এসব নিয়ে। কিছুক্ষণ একটা বড় আমড়া গাছের নীচে নদীর ধারে বসে থাকে গুলাবী। রোদ্দুরটা একপাশে সরে গেছে। ঝাঁকড়া গাছের ছায়াটা হেলে পড়েছে খানিকটা পুবের দিকে। নদীর ধার বলে হাওয়াটা তেমন গরম নয়। এখন বাড়ী যাবে না গুলাবী।

BanglaBook.org

নিজেদের বাড়ীতে তো নয়ই। কিন্তু কোথায় যাবে তা ভেবে পায় না সে। খিদেটাও পেয়েছে। বাড়ীতে এসে তার কিছু খাওয়া হয়নি। ঢুকতেই জানকী ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিল। এখন বেলা গড়িয়ে গেছে। খালি পেটটা খিদের জানান দিতে শুরু করেছে গুলাবীকে। এখানে তো খাবার মতো কোনো দোকানও নেই। কাছে পয়সা থাকলেও দোকান নেই। তখনই গুলাবীর মনে হয় — তার মতো এরকম অবস্থা তো নিশ্চয়ই এখানকার দোকানীগুলোরও হয়? সুতরাং এখানে একটা হোটেল খুললে চলবেই বা নয় কেন?

উঠে পড়ে গুলাবী। এখান থেকে আধ ক্রোশের মধ্যে তার চেনা একটা মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। বান্ধবীর বিয়ের পরে কখনো সেখানে যায়নি গুলাবী। হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয় তার বন্ধু। তখন নন্দিনীকে কি বলবে গুলাবী? দুপুরের খাওয়া তার হয়নি সে কথা এত বেলাতে কি নন্দিনীকে বলাটা ভাল হবে? ঠিক আছে, একটা দিন না হয় না-ই খাওয়া হলো। রাতটা আজ সুবিধা হলে নন্দিনীর বাড়ীতে থাকা যাবে। তারপর কাল যা হবার হবে।

নন্দিনীর শ্বশুরবাড়ীর দিকে পা বাড়ায় গুলাবী। গরম এখনো কমেনি। মাথার ওপর আঁচলটা তুলে হাঁটতে থাকে সে। রোদও লাগবে না, কেউ ভাল করে দেখে চিনতেও পারবে না। দুদিক থেকে সুবিধা হবে তাই।

নন্দিনীর বাড়ীতে যখন সে এসে পৌঁছালো — তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে দুপুরে ঘুমাচ্ছিল নন্দিনী। গুলাবীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল সে। তার বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় পাঁচ বছর। কিন্তু এর মধ্যে গুলাবী কোনোদিন তাদের বাড়ীতে আসেনি। গুলাবীকে দেখে নন্দিনী শুধায় —"কি রে, পাঁচবছর বাদে বুঝি বন্ধুকে মনে পড়লো?" গুলাবীর সিঁথির দিকে নজর করে বুঝতে পারে সে, গুলাবীর বিয়ে হয়নি। না হলে ঠিক বলে বসতো —"বরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিস বুঝি?" ও কথা না বলে নন্দিনী আবার প্রশ্ন করে —"সৎমা বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছে? কেন, তোর বাপটা কিছু বললো না তোর সৎমাকে? বৌয়ের ভেড়ুয়া সব।"

হাসলো গুলাবী। বললো — "হঠাৎ মনে হলো তোর কথা! না জানি কেমন আছিস তুই। তাই চলে এলাম। ইচ্ছে আছে, তোদের অসুবিধা

BanglaBoi.org

না থাকলে দিন দুই থাকবো। বাড়ীর অশান্তির কথা তো জানিসই।"

—"দুদিন কেন? তুই এক সপ্তাহও থেকে গেলে আমার অসুবিধা হবে না। মুন্নি চুন্নির বাপ এখন মোকামা গেছে কাজে। আমি একা-ই আছি। তুই থাকলে ভালো কাটবে আমার।" বললো নন্দিনী।

নন্দিনীর শ্বশুর শাশুড়ী মরে গেছে তিন বছর হলো। এখন একার সংসার। পুরোনো খাপরার চালের দুটো ঘর সাবেক আমলের। নন্দিনীর বর রাজন একটা পাকাছাদের ঘর তুলেছে। ইলেকট্রিক নিয়েছে এক বছর হয়ে গেছে। সেল্‌সম্যানের কাজ করে সে টিউবওয়েল কোম্পানীতে। বেশীর ভাগ সময়ে বাইরে থাকতে হয় রাজনকে। ছোট ছেলে চুন্নি দু'বছর বয়েসের। মেয়ে মুন্নির বয়স চার।

হাত পা ধুয়ে বসলো গুলাবী। একটা পেতলের থালায় বড় এক দলা গুড় দিয়ে ছাতু মাখা আর দুটো কাঁঠালি কলা দিয়ে তাকে খেতে বসালো নন্দিনী। খাওয়া শেষ হলে উঠোনে টিউবওয়েলে মুখ ধুয়ে নিল গুলাবী। রাতের রান্না সন্ধ্যাতেই করে নন্দিনী। আজ দুজনে মিলে রাতের রান্নার ব্যবস্থা করে নিল। সন্ধ্যের আগেই বাচ্চাদের খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে নন্দিনী। একটু রাত অবধি দাওয়ায় বসে গল্প করলো দুই বন্ধুতে মিলে। উঠোনের বিরাট সজনে গাছটার মাথা ছুঁয়ে আছে ওপরের কালো আকাশটাকে। দেরীতে চাঁদ উঠবে। অন্ধকার আকাশে তারার ফুলঝুরি জ্বলছে। চার দিকে কেমন একটা নিস্তব্ধ ভাব। একা একা শুধু বাচ্চাকে নিয়ে কেমন করে থাকে নন্দিনী? রাত্রে বর কাছে থাকে না। এতবড় খাটে একা ঘুম আসে নন্দিনীর?

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে গুলাবী। —"ঘুমিয়ে গেলি নাকি, কিরে গুলাবী?" বন্ধুকে ডাকে নন্দিনী। সাড়া পায় না। তন্দ্রার ঘোরে গুলাবীর মনে হয়— তার বাবাকে চাই না, ভাই বোনদের চাই না, রঘুকেও চাই না। চৌধুরী কাকা যদি হোটেলটা খুলে দেয় তাহলে হোটেল নিয়েই থাকবে সে। চৌধুরী কাকাকে সে যতটা খারাপ ভাবতো — ততটা খারাপ সে নয়। আবছা অন্ধকারেও চৌধুরী কাকার মুখটা মনে পড়তে লাগলো গুলাবীর। তারপরে হঠাৎ কখন যেন তার ঘুম এসে গেছে। কাল সকালের আগে আর জাগবে না গুলাবী।

BanglaBook.org

।। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।।

হোটেলটা যে শেষ পর্যন্ত সত্যিই হয়ে যাবে— তা স্বপ্নেও ভাবেনি গুলাবী। শুধু টাকা দেওয়া নয়, চৌধুরী চিরঞ্জিলাল নিজে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিল খাস জমি থেকে খানিকটা লিজ-এ নেওয়া, ঘর তোলা, হোটেলের রান্নার সাজসরঞ্জাম কেনা, আসবাবপত্র কেনা— সব কিছুই নিজে দেখে করে দিয়েছে চিরঞ্জিলাল। এসব কথা নানা জনের কাছ থেকে কানে আসছিল সাবিত্রীর। সাবিত্রী চেয়েইছিল গুলাবী এ বাড়ী থেকে সরে যাক। নিজের টাকা থেকে মাসে মাসে এজন্য সাবিত্রী গুলাবীকে কিছু করে টাকা দেবে বলেও মনে মনে ভেবে রেখেছিল। এতে করে সে চিরঞ্জিলালের হাত থেকে যেমন বাঁচাতে পারবে গুলাবীকে— তেমনি স্বামীকেও গুলাবীর মোহ থেকে দূরে রাখতে পারবে সে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত অন্য রকমের হয়ে যাবে— সে কথা ভাবেনি সাবিত্রী। চিরঞ্জিলাল গুলাবীকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি সে। গুলাবী ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। হোটেলের একখানা ঘরে সে থাকবে ঠিক হয়েছে। এ ব্যবস্থা চিরঞ্জিলালই করে দিয়েছে। রঘুর সঙ্গে তার কবে যে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই। এক্ষুনি এক্ষুনি তেমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। চিরঞ্জিলালের দিক থেকে গুলাবীর ব্যাপারে এতখানি আগ্রহ বা মাখামাখি ভাল লাগছে না রঘুর। রঘু কিছু অন্যরকম ছক কষেছিল। গুলাবী কিন্তু তার হোটেলের ব্যাপারে চৌধুরীর সঙ্গে এমন মেশামেশি শুরু করেছে— যা রঘুর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম যে কোনো ব্যাপারে রঘুর পরামর্শ নিতে যেতো গুলাবী। কিন্তু রঘু নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নেওয়াতে গুলাবী এখন যা দরকার— তা চিরঞ্জিলালের কাছেই বুঝে নিতে যায়। ঘর তোলবার সময় প্রায় প্রতিদিনই চিরঞ্জি এসে সকাল বিকাল খবর নিয়ে যেতো। দেখে যেতো, কাজ কদ্দুর হলো। এই নিয়ে এরই মধ্যে লোকের মুখে নানা গল্প চালু হয়ে গেছে। সেসব গল্প সাবিত্রীর কানে যেমন আসছে— রঘুনাথের কানেও কম আসছে না। হোটেল নিয়ে যে রকম মেতে আছে গুলাবী— তাতে রঘুর মনে হচ্ছে, গুলাবী যেন খানিকটা ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে চলছে, অথবা আরো খারাপ করে ভাবলে— কিছুটা অবহেলাই করছে। চৌধুরী চিরঞ্জিলাল একবার বড় হাভেলিতে অপমান করেছিল রঘুকে। শাসিয়েছিল, ও বাড়ীর ধারে কাছে

BanglaBook.org

তাকে যেন না দেখা যায়। সে অপমান ভুলে যায়নি রঘু। তাকে যে লোকটা অপমান করলো সেই লোকটার সঙ্গেই মাখামাখি করছে গোলাপ। এ তো প্রকারান্তরে রঘুরই অপমান। গোলাপের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সে। দেখছিল, গোলাপ নিজে তার কাছে আসে কিনা। কিন্তু গুলাবী আসেনি। হোটেল খোলবার তারিখ পর্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত আছে সে।

শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর কাছ থেকে টাকা নিতেও যায়নি রঘু। প্রথম দিকে নেবে বলে মনস্থির করেও শেষ পর্যন্ত ওই বাড়ীর টাকা নেওয়ার ইচ্ছা আর হয়নি তার। ও বাড়ীর টাকা নিয়ে সংসার করবার সাধ তার চলে গেছে। গোলাপ ও বাড়ীর কর্তার কাছ থেকে টাকা আর সাহায্য নিয়ে হোটেল খুলছে। খুলুক সে। ঐ ব্যাপারে নিজেকে আর জড়াতে চাইছে না সে । যদি কখনো গোলাপ নিজে থেকে রঘুর কোনো সাহায্য চায়— তবে রঘু দেবে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কোনো ব্যাপারে নাক সে গলাবে না।

৫-ই শ্রাবণ হোটেল খোলবার দিন স্থির হয়েছে। দুটো ছেলেকে কাজে লাগিয়েছে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। তারা দেবদারু পাতা আর রঙিন কাগজ দিয়ে হোটেলের দরজা সাজিয়েছে। অন্য বাড়ী থেকে ইলেকট্রিকের লাইন টেনে রঙিন টুনি বাল্‌ব দিয়ে সাজিয়েছে দরজার মাথায়। ভিতরে আপাতত একটা পাখা আর দুটো আলোর টিউব বসেছে। খাওয়ার জন্য, বসার জন্যে উঁচু বেঞ্চি আর নীচু বেঞ্চি এসেছে গোটা পাঁচ করে। বড় খাবার জলের টিনের ড্রাম, বাসনপত্র, মশলাপাতি রাখার জন্যে কৌটা— অনেক কিছু ব্যবস্থা লাগে। সব হয়েছে। পাশের ছোট ঘরটায় গুলাবীর থাকার জন্যে একটা চৌকি, একখানা চেয়ার, দেওয়ালে একটা বড় আয়না, কাপড় রাখার জন্যে কাঠের একটা আলনা— ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। প্রয়োজনীয় বিছানাপত্রও এসেছে। উঠোনের এক পাশে স্নান পায়খানার ব্যবস্থা। মোটামুটি সব কাজই করে দিয়েছে চিরঞ্জিলাল। হোটেল চালাবার মতো কিছু টাকা সাময়িক ভাবে জমা করে দিয়েছে গুলাবীর কাছে। যে ছেলে দুটো দেবদারু পাতা দিয়ে হোটেল সাজাচ্ছে— তারা-ই দেওয়া-থোওয়ার কাজ করবে। সন্ধ্যেবেলা মাইকে গান বাজাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে চিরঞ্জিলাল। উদ্বোধনটা একটু লোককে জানান দিয়ে করা দরকার। এরই মধ্যে ৮/১০ টা দোকানের লোক এসে মাসকাবারী খাওয়ার জন্য

BanglaBook.org

কথাও বলে গেছে গুলাবীর সঙ্গে। বেশ উৎসাহ নিয়েই মেতে আছে সে।

রঘুকে উদ্বোধনের সময়ে সন্ধ্যেবেলা আসবার জন্যে বলে এসেছে গোলাপ। কিন্তু সে জানে, রঘু আসবে না। ঐ সময়ে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী তো আসবেই। রঘুকে সে পছন্দ করে না। রঘুও তাকে ভালো চোখে দেখে না।

আজকের দিনটা রঘু গ্যারেজের কাজে যায়নি। শরীর তার কিছু খারাপ হয়নি। কিন্তু মনটা খুব দমে গেছে। কত কিছু সে ভেবেছিল— আর কেমন করে যেন সব হয়ে গেল অন্য রকম। সারাদিন খেতেও বার হলো না সে। চুপচাপ পড়ে রইল বিছানায়। খবর না দিয়ে এমন করে কাজে কামাই করে না রঘুনাথ। নটা নাগাদ ছোটকুকে সাইকেল দিয়ে রঘুর খবর নিতে পাঠিয়েছিল হরিবিষ্ণু। রঘু বিরক্ত হয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে— "কাজে যাইনি তো বেশ করেছি। দরকার হলে ছেড়ে দেবো গ্যারেজ। চাইলে অন্য লোক দেখে নিতে পারে বিষ্ণু কাকা।" ছোটকু ফিরে গেছে এ খবর নিয়ে। হরিবিষ্ণু খানিকটা আন্দাজ করেছিল ব্যাপারটা। তার গ্যারেজেও গুলাবীর নতুন হোটেলের খবরটা চলে গছে। গুলাবীর হোটেল হচ্ছে, অথচ রঘু সেখানে নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছে — জিনিসটা ভালো চোখে দেখেনি হরিবিষ্ণু। আজ সন্ধ্যায় সেই হোটেল প্রথম খুলবে — তা জানতো সে। তাই পুরো ব্যাপারটা সে আন্দাজে বুঝে নিয়েছে। এজন্য আজকে সে আর বিরক্ত করতে চায়নি রঘুনাথকে। এই ছেলেমানুষ বয়সে এরকম রাগ অভিমান তো হতেই পারে। হঠাৎ রঘুর জন্যে কেমন মায়া হতে লাগলো হরিবিষ্ণুর।

বিকেল থেকেই মেঘ জমছিল। হঠাৎ বাতাস উঠে এক পশলা ভালই বৃষ্টি হয়ে গেল। মাথার কাছের জানালাটা বন্ধ করেনি রঘু। জানালা দিয়ে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট এসে লাগছিল রঘুর মুখে চোখে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভূতিটা ভালই লাগছিল রঘুর। ঘরে আলোও সে জ্বালায়নি। বৃষ্টিটা এখন থেমে গেছে। কত রাত হয়ে গেছে ঘড়ি দেখেনি রঘুনাথ। বাইরে জলাতে ব্যাঙ ডাকছে। মাথার কাছের এক টুকরো আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। দুই একটা তারা-ও দেখা দিয়েছে। তবু উঠলো না রঘুনাথ। একটা আলোও জ্বালালো না। অন্ধকারে বিছানার ওপর হাতড়ে বিড়ির টিনের কৌটা আর দেশলাইটা খুঁজে পেলো সে। কিন্তু বিড়ি ধরালো

BanglaBook.org

না রঘুনাথ। চোখ বুজেই শুয়ে রইল। দরজায় খিল দেয়নি রঘু। কিই বা আছে তার ঘরে যে, চোরে নিতে আসবে? ভেজানো আছে দরজাটা। বাইরে থেকে কেউ ঠেলা দিলেই খুলে যাবে। হঠাৎ রঘুর মনে হলো — কে যেন ঢুকেছে ঘরে। অন্ধকারে তার দিকেই এগিয়ে আসছে মানুষটা। একদৃষ্টে ঠাহর করে দেখতে লাগলো রঘুনাথ। কাছে এলে দেখতে পেলো, গুলাবী। কাপড়ে বাঁধা কয়েকটা বাসন তার হাতে।

—"আমি জানতাম তুমি আজ যাবে না। রাগ করে হয়তো সারাদিন খাবেও না কিছু। আজকের খদ্দেররা যা খাওয়ার খেয়ে গেছে। আজকের মতো বন্ধ করে দিয়েছি হোটেল। তোমার জন্যে খাবার এনেছি, ওঠো, খাবে এসো। ঘরে একটা আলোও জ্বালাওনি। দেশলাইটা দাও, একটা লম্ফ ধরাই।"

কোন উত্তর দিল না রঘু। সারাদিন খাওয়া হয়নি তার। মনটাও উদাস উদাস হয়ে আছে। গোলাপের কথায় অন্ধকারের মধ্যেও দুটি চোখ জলে ভরে গেল রঘুনাথ যাদবের। আলো না থাকায় তা দেখতে পেলো না গুলাবী।

স্বামীকে কিছু বলবে না বলে ভাবলেও সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে পারেনি। রাত্রে বিছানায় শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুমোয়নি সে। প্রায় আধা রাত্রে শুতে এলো চিরঞ্জিলাল। পাঞ্জাবীটা খুলে আলনায় রেখে লুঙ্গিটা পরতে পরতে জিজ্ঞাসা করলো —"ঘুমোসনি এখনো?"

প্রথমটায় কোনো উত্তর দিল না সাবিত্রী। আবার প্রশ্ন করে চিরঞ্জিলাল —"হোটেল হয়েছে, শুনেছিস নিশ্চয়? সব গুছিয়ে দিয়ে আসতে রাত হয়ে গেল। মেয়েটার যা হোক একটা হিল্লে হয়ে গেল। গরীব পুরুতের মেয়ে। বাপটা তো খেতে দিতে পারে না। নিজের একটা আয়ের রাস্তা হলো। চালাতে পারলে খারাপ হবে না বলেই তো মনে হচ্ছে।"

অন্ধকারেই ধপাস করে সাবিত্রীর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। চিরঞ্জির মুখ থেকে দিশি মদের একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগে সাবিত্রীর। ওপাশ ফিরে শোয় সে।

—"কিছু বললি না যে? গুলাবীর একটা ভালো কিছু হলো — তা বুঝি তোর সইছে না? ওকে নিয়ে আমাকে তুই সন্দেহ করিস — তা কি আমি জানি না ভাবিস? যা করি, বেশ করি। তোর না সহ্য হয় মেয়েদের কাছে চলে যা। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

BanglaBook.org

এবার কথা বললো সাবিত্রী। —"গুলাবীর জন্যে হোটেল করলে তার কতটা সুবিধে হবে জানি না, কিন্তু তোমার সুবিধে হবে জানি। এ বাড়ীতে ঐ মেয়েটাকে আমি আগলে আগলে রাখতাম তোমার নজর থেকে। এখন সুবিধে হলো তোমার। যখন তখন, এমনকি রাত্রেও যাবার জায়গা হলো।" যতটা সম্ভব ঘৃণা দিয়ে কথাগুলো বললো সাবিত্রী।

—"জুতো মেরে মুখ ভেঙে দেবো, হারামজাদী। আর একবার একথা বললে, দেখবি কি হয়! একটা ছেলে বিয়োবার ক্ষমতা নেই তোর; এমন বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকবো — সে বংশে আমার জন্ম হয়নি। লাথি মেরে বের করে দেবো বাড়ী থেকে। সুবিধে না হয় নিজের রাস্তা দেখ্। দরকার হলে, তুই চলে গেলে ঐ মেয়েটাকেই এনে তুলবো এখানে। কোন্ শালা শুয়োরের বাচ্চা কি করে দেখি!"

রাগে গরগর করতে থাকে চিরঞ্জিলাল। তারপর উঠে পড়ে বিছানা থেকে। পায়ের কাছে রাখা চাদরটা আর নিজের বালিশটা নিয়ে মেঝেতে পেতে শুয়ে পড়ে একা। একটু পরে তার নাসিকা গর্জন শুরু হয়ে যায়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সাবিত্রী দেখে — তখনও ঘুমাচ্ছে চিরঞ্জিলাল। ওকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে, বাইরে এসে দাঁড়ায় সে। এত সকালে সত্যবতী আসে না ঘরে। ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চলে গেলে সত্যবতী সাধারণত জল নিয়ে আসে সাবিত্রীর মুখ ধোয়ার জন্যে। পুবের আকাশটা গাঢ় লাল হয়ে আছে। সূর্য উঠেছে, কিন্তু নজরে আসে না সাবিত্রীর। আবার ঘরে ফিরে আসে সে। বিছানায় উঠে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে আবার। আগে তার চিন্তা ছিল স্বামীর হাত থেকে গুলাবীকে বাঁচাবার। এখন চিন্তা হয়েছে — মেয়েটার মোহ থেকে স্বামীকে রক্ষা করার। গুলাবীর আর দোষ কি? অভাবী ঘরের মেয়ে, বাপ দেখে না। যে ছেলেটাকে সে ভালবাসে — তার দিক থেকেও নেই কোনো সাড়া। নিজেকে বাঁচাতে হবে তো! সে বাধ্য হয়েই চৌধুরী চিরঞ্জিলালের টাকায় হোটেল খুলেছে। এখনো গুলাবীকে নিয়ে তেমন ভাবে কথা ওঠেনি চিরঞ্জিকে জড়িয়ে। কিন্তু লোকের মুখ কদিন বন্ধ থাকবে? আজ না হোক কাল কথা ছড়াবে। আর, তখন চৌধুরী হাভেলিতে একা বসে লজ্জায় মরে যাবে সাবিত্রী। মেয়েদের কাছে, জামাইদের কাছে তার অপমানের শেষ থাকবে না। সুধা, সুমা আর সুজাতারা এখানে আর না এলেও কথা যেতে আটকায় না। কি করবে সাবিত্রী? এর চেয়ে ভালো হতো যদি রঘু মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে দূরে কোথাও

BanglaBook.org

চলে যেতো!

একটু বেলা হতেই উঠে পড়ে চিরঞ্জিলাল। মাটিতে বালিশ চাদরটা যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। কোনো কথা বললো না সাবিত্রীর সঙ্গে। সাবিত্রী তেমনি শুয়েই রইল। ঘণ্টা খানেক বাদে সত্যবতী ঘরে আসে। সাবিত্রী কাছে ডাকলো সত্যবতীকে। বললো — "দিদি, তোমার ছেলেটা তো গুলাবীকে পছন্দ করে। তুমি কেন ছেলেকে বলছো না গুলাবীকে নিয়ে ঘর করতে? এমন একা একা থাকে রঘু। পরে ওকে দেখবে কে? এসব ভেবে দেখেছ?"

কি জবাব দেবে সত্যবতী। একটু হেসে বললো সে —"দিদি, কপালে যার যা আছে তা খণ্ডাবে কে? তুমি আমি বললেই কি সব হয়ে যাবে। তুমি তো আমার ছেলের জন্যে কি সব করে টরে-দেবে বলেছিলে! কিন্তু সইলো কি তা ওর কপালে?"

— "না, না। ব্যাপারটাকে তুমি অত হাল্কা করে দেখো না, দিদি। ছেলের ভালো চাও তো ছেলেকে সংসারী করে দাও। জোয়ান ছেলের সময়ে বিয়ে না হলে খারাপ পথে চলে যায়। তুমি কথা বলো ছেলের সঙ্গে। আমি ডেকে পাঠাবো মেয়েটাকে। এখানে সুবিধে না হয় তো বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। রাজমহলে আমার জামাইয়ের ব্যবসা আছে গাড়ীর। সেখানে তাকে বলে কয়ে একটা ব্যবস্থা হয়তো করে দেওয়া যায়, এভাবে বছরের পর বছর এখানে পড়ে থাকা কোনো কাজের কাজ নয়।"

সাবিত্রী চাইছে, যে কোনোভাবে গুলাবীকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। স্বামীকে সে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে যে পারবে না — তা সে জানে। এখন ঐ মেয়েটাকেই সরিয়ে দেওয়া দরকার কোনো রকম করে। ছেলে ছেলে করে পাগল হয়ে রয়েছে চিরঞ্জিলাল। বংশধর না থাকলে বংশ রক্ষা হবে না; মরার পর নরকে পড়ে পচতে হবে। ছেলের হাতের আগুন না পেলে স্বর্গবাস হবে না চিরঞ্জির। এমন ভয় যে সাবিত্রীরও তেই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সে তো নিরুপায়। অনেক রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে সাবিত্রীর।

সত্যবতী নীরবে তার কাজ করে যায়। গুলাবী না থাকায় সত্যবতীর এখন অনেক কাজ। সকালে সাবিত্রীর জন্যে মুখ ধোবার গরম জল করে মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করা, ওষুধের তেল মালিশ করা, বাড়তি তেলটা

Bangla Boi.org

গরম জলে ভিজিয়ে তুলে দেওয়া, চানের আগে জল তুলে রাখা — দুপুরে খাবারটা বেড়ে দিয়ে খেতে থাকা পর্যন্ত সাবিত্রীর সামনে হাতপাখা নিয়ে বলে হাওয়া করা — সব, সব করতে হয় সত্যবতীকে। আজ কাল এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে রঘু। লোক দিয়েই দরকারী জিনিস মাকে পাঠিয়ে দেয় সে। সত্যবতীও তার দরকারের কথা লোক মারফৎ রঘুকে জানায়। মাঝে একবার সত্যবতী অসুস্থ হয়ে পড়ায় রঘু এসেছিল মাকে দেখতে। কিন্তু সে কথা জানতে পেরে বিস্তর গালমন্দ করেছিল চিরঞ্জিলাল। সে সাবিত্রীকে বলেছিল — "মেয়েটা তো বিদায় নিয়েছে; ছোঁড়াটা এখানে আসে কি করতে? দু'একবার শুনেছি তোমার সঙ্গে ফুসফাস করে এসে! কি এত কথা তোমার সঙ্গে শুনি? এ ঘরে একদিন দেখলে মুণ্ডটা নামিয়ে দেবো ধড় থেকে। কোনো রকম নোংরামি আমি সইব না।"

এ কথায় গা ঘিনঘিন করেছিল সাবিত্রীর। এত নোংরা মন চিরঞ্জির! এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি তার নেই। নোংরা লোকেরা নিজের নোংরামিটা তো দেখতে পায় না। শুধু অন্যের মধ্যে নোংরা খুঁজতে চেষ্টা করে। গুলাবীকে সরিয়ে দিয়েও মানুষটাকে ঠিক করা গেল না। গুলাবীকে কোথাও যেতে দেবে না চিরঞ্জিলাল। একথা সাবিত্রীর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। এমন কি, গুলাবীর বিয়ে হয়ে গেলেও তার ওপর চিরঞ্জির মোহ যাবে কিনা সন্দেহ। তার মতো খারাপ লোক হয়তো দরকারে গুলাবীর স্বামীকেও সরিয়ে দিতে পারে পৃথিবী থেকে।

কাজকর্ম সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সত্যবতী। সাবিত্রীর মাথা থেকে কিন্তু চিন্তাগুলো বেরিয়ে যায় না। কি করলে গুলাবীর মোহ তার স্বামীর কাটবে? সে রাস্তা কে বলে দেবে সাবিত্রীকে?

।। পঞ্চাদশ পরিচ্ছেদ ।।

যাদব আর মধুকর ভোরবেলাই বাজার করে আনে। সকালে না গেলে ভালো মাছ পাওয়া যায় না। বাজার এলে প্রথমে সব্জি কাটতে বসে গুলাবী। মাছগুলো কেটে, ধুয়ে রান্নার জন্যে তৈরী করতে থাকে মধুকর। যাদব উনুনটা পরিষ্কার করে কাঠ সাজায় আগুন ধরানোর জন্যে। একটু কেরোসিন ঢেলে দেয় কাঠের ওপর। না হলে মোটা মোটা গুঁড়ি কাঠ

BanglaBook.org

গুলো ধরে না। আগুনটা জ্বেলে একটু হাওয়া দিয়ে দেয় ফুঁ দেওয়ার বাঁশের নলটা দিয়ে। হাতের সব্জি কাটার কাজ একটু বন্ধ রেখে বড় লোহার কড়াইটা উনুনে চাপিয়ে দেয় গুলাবী। কৌটোর মাপে চাল মেপে ভাতটা বসিয়ে দেয়। ভাত আর মাছের ঝোলটা আগে দরকার। তরকারী সব খদ্দের খায় না। ডালটা খুব কম চলে। কাঁচা পেয়াজ আর কাঁচা লংকা রাখতে হয়। ওটা খাবারের পয়সার মধ্যেই পড়ে। একবার যা ভাত থালায় বেড়ে দেয় — তারপর হাতা পিছু ভাতের আলাদা দাম। এসব এখন বেশ শিখে গেছে গুলাবী। কে কি খাচ্ছে — সেদিকে নজর রাখে নিজে। কাঁচা পয়সার ব্যাপার। কাউকে অত বিশ্বাস করা যায় না আজকাল।

আজ হাটের দিন এ গাঁয়ে। দূর দূর গ্রাম থেকে চাষীরা কাঁচা আনাজ এনেছে হাটে। এগুলো অন্য জায়গার চেয়ে সস্তায় পাওয়া যায় এখানে — তাছাড়া তাজা সব্জিও এগুলো। শনিবার এখানকার দোকানপাট বন্ধ থাকে বলে শনিবারের হাটে রাত্রে কেনাকাটা করে গুলাবী। মধুকরের মাথায় একটা ঝাঁকা। সব্জিগুলো হাতে নেড়েচেড়ে দেখে ঝাঁকায় তুলে নিচ্ছে গুলাবী। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় চৌধুরী হাভেলির একটা কর্মচারীর সঙ্গে। আগে এদের সঙ্গে তার কথাবার্তা বলাটা পছন্দ করতো না সাবিত্রী। সেই জন্যে এতদিন কোনো কথা বলেনি গুলাবী এদের সঙ্গে। লোকটার নাম যমুনাপ্রসাদ। ওকে দেখতে পেয়ে যমুনাপ্রসাদ নিজেই এগিয়ে এসে বলে —"ভালো আছ, গুলাবী? তুমি তো এখন হোটেলের মনিব! ওদিকে তোমার পুরনো মালকিন তোমাকে একদিন বড় বাড়ীতে যেতে বলেছে। তাড়াতাড়ি একবার দেখা করে এসো। বোধহয় কি সব জরুরি কথা আছে।"

গুলাবী জানে, চৌধুরী কাকার টাকায় তার হোটেল হয়েছে — ব্যাপারটা কাকী মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। বিশেষত, কাকী নিজে থেকে রঘুনাথকে টাকা দিতে চেয়েও রঘুনাথ শেষ পর্যন্ত সে টাকা নেয়নি। তাই কাকী তার ওপর বা রঘুর ওপর নিশ্চয়ই খুব খুশী নয় আর। তবু যমুনাপ্রসাদের কথায় বলে —"নতুন হোটেল তো! নিজে না সব দেখলে কাজ হয় না। এই তো দেখো না, নিজে বাজার করছি। দুটো ছেলে আছে ঠিকই। তবু নিজে করছি। কাকীকে বলো, খবর যখন আমি পেয়েছি — তখন যাব একদিন। শীগগিরই যাব।"

চলে গেল যমুনাপ্রসাদ। না জানি কেন ডেকেছে কাকী! মনে মনে

BanglaBook.org

ভাবতে থাকে গুলাবী। তারপর হঠাৎ মধুকরকে বলে —"যা হয়েছে, হয়েছে। আজ চল। কাল দেখা যাবে।" দুজনে হোটেলের দিকে হাঁটতে থাকে। হোটেলে পৌঁছে মালগুলো রান্নাঘরে সাজিয়ে রেখে দিয়ে চলে যায় মধুকর। কাল ভোর ভোর আবার আসতে হবে হোটেলে। আজ শনিবার, খদ্দের তেমন নেই। রাত্রে ভাত খাবার খদ্দের আসবে না। দুপুরে ঘুগনি করে রেখে দিয়েছে গুলাবী। রুটিওয়ালা একটু পরে পাউরুটি দিয়ে যাবে। সন্ধ্যার দিকে ছুটির দিনে রুটি আর ঘুগনিটা বেশী চলে। রাত আটটা বাজতে বাজতে ছুটির দিনে এদিকে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায় প্রায়। নটার সময়ে তো প্রায় অর্ধেক রাত। নিজেও একটু রুটি আর ঘুগনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিল গুলাবী। ভিতরের ঘরটায় থাকে সে। সামনের দিকে হোটেল। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করতে এসেছে, সবেমাত্র — এমন সময় গুলাবী দেখে বাইরে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজাটা বন্ধ না করে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে রঘুনাথ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ এমন সময়ে রঘুকে ঘরের দরজায় দেখে কেমন যেন হতবাক হয়ে যায় গুলাবী। তার বুকের রক্ত যেন ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে কলিজার মধ্যে। সে জিজ্ঞাসা করে —"তুমি? এসময়ে?"

—"এ সময় ছাড়া তোর সঙ্গে তো দেখা করা যায় না, গোলাপ! আমার গোটা কয় প্রশ্ন ছিল। অনেকদিন ধরে বলবো বলবো করে বলা হচ্ছে না। আজ ছুটির দিন দেখে..."

থেমে যায় রঘুনাথ। তার হাতটা ধরে বলে গুলাবী —"বাইরে নয়, রঘুদা। যা বলার তা ভিতরে গিয়েই বলবে। তুমি ভিতরে এসো।"

ভিতরে গেল রঘুনাথ। এ ঘরে বিজলি বাতি আছে। আছে পাখা-ও। পাখাটা চালিয়ে দেয় গুলাবী। —"তুই কি সত্যিই আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাস না, গোলাপ?" কেমন যেন একটা আর্তি ঝরে পড়ে রঘুর কণ্ঠে। প্রায় কান্নার মতো শোনায় তার কথাগুলো।

— "আমি তো এমন কথা কোনোদিন বলিনি, রঘুদা। ফার টাকায় হোটেল করেছি সে....."

তার মুখটা হাত দিয়ে চাপা দেয় রঘু। বলে, "ওর কথা বলিস না রে, গোলাপ। আমাদের সুখ, আমাদের দুঃখ সব আমাদেরই। এর মধ্যে তৃতীয়জন আসে কেন রে, গোলাপ? তোর কথা তুই বলবি। অন্যের

BanglaBook.org

কথা নয়।"

চুপ করে যায় গুলাবী। তার কথা, তার যুক্তি কোনোদিন বুঝতে পারবে না রঘু। চৌধুরী কাকা যে ভাবে তাকে চাইবে — না বলতে পারবে না গুলাবী। যার টাকা, তার ইচ্ছে ওকে মানতেই হবে। চৌধুরী চিরঞ্জিলালের কাছে বিকিয়ে গেছে সে। কিন্তু প্রেম তার রঘুর জন্যে। দেহটা দিলেও তার মনটা তো সে বেচে দেয়নি চৌধুরী কাকার কাছে।

—"আমার জন্যে তোর মন পোড়ে না, গোলাপ? আমার আর কে আছে, তুই ছাড়া। মরা পর্যন্ত মা হয়তো বড় বাড়ীতেই থেকে যাবে। ছেলের হাতের জলও হয়তো শেষ কালে মায়ের জুটবে না। তুই না থাকলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো? কাকে নিয়ে আমার সংসার? তুই ফিরে আয়, গুলাবী। আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। দুজনে কাজ করে যা জুটবে, তাই খাবো। আমার মা-ও বোধহয় আর আমার আশা করে না। একদিনের জন্যেও ছুটি পায় না — এমন হয়? তুই-ই বল্, গোলাপ? এমন হয়?"

হাঁফাতে থাকে রঘুনাথ। খানিকক্ষণ কিছু বলতে পারে না গুলাবী। রঘুর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে তার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। হঠাৎ তার হাত পড়ে যায় রঘুর গালের কাছে। গালটা ভেজা ভেজা লাগে। ঘামে, না, চোখের জলে বুঝতে পারে না গুলাবী। ঠিক সেই সময়েই হোটেলের দরজায় মৃদু করাঘাত শুনতে পায় সে। রঘুকে খাটে বসিয়ে সদর দরজাটা খোলার জন্যে এগিয়ে যায় গুলাবী। হোটেলের ঘরটায় আলো জ্বালানো ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে একবার সে জিজ্ঞেস করে — "কে, কে এসেছ বাইরে?" কোনো জবাব আসে না। একটু চিন্তা করে দরজাটা খুলে দেয় গুলাবী।

চৌধুরী চিরঞ্জিলাল বাইরে দাঁড়িয়ে। গলায় সাদা চাদর, সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী। হাতে ছড়ি আর একটা ফুলের মালা। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করে সে —"এতক্ষণ দেরী হচ্ছিল কেন রে? কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি।"

কোনো কথা না বলে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুলাবী। মনে হচ্ছে, কথা বলার শক্তি যেন সমস্তটুকু হারিয়ে ফেলেছে সে।

গুলাবী বাড়ী থেকে চলে যাওয়ায় সমস্ত দোষটা-ই পড়লো জান্‌কীর

BanglaBook.org

ওপরে। দশরথ খুব চটে গেছে বৌয়ের ব্যবহারে। গুলাবী থাকলে আজ দশরথ গুলাবীর হোটেলের রোজগারটা পেতে পারতো। কিন্তু এখন কোন্ মুখে সে মেয়ের কাছে হাত পাততে যাবে। যত নষ্টের মূল ঐ জান্‌কী। দশরথ একথা বলতে ছাড়ে না বৌকে — "তোর জন্যেই তো ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা। কথায় বলে 'যে গাই দুধ দেয় — তার চাঁট সইতে হয়।' আজ মেয়েটা থাকলে কি আমার সংসারের এই হাল হতো? নগদ টাকা একটা রোজগার করে আনার লোক নেই!"

ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে জান্‌কী। —"তবে কি আমি গিয়ে বাজারে ঘর ভাড়া নোবো? তোমার মেয়েকে পাঠাও। সে থাকলে ঘর ভাড়া নিতেও বোধহয় তার আপত্তি হতো না। আমার বাপ নগদ টাকা আর গয়না দিয়ে আমায় তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল। নিজে গায়ে খেটে খাবো বলে নয়।"

আর কথা বাড়ায় না দশরথ। মেয়েটাকে সে অনেকদিন দেখেনি। একবার খুব ইচ্ছে করে দেখে আসতে, কেমন হোটেল করেছে গুলাবী। কিন্তু সাহস পায় না। একদিন বৌয়ের কথায় দশরথ নিজেই তো বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। কিন্তু শত হলেও বাপের মন তো। মা মরা মেয়েটার জন্যে বড় প্রাণ কাঁদে বাপের। গুলাবীর জন্যেই তো তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়েছিল। গুলাবীর মা ধনবতী যখন মরে যায় — তখন গুলাবীর বয়েস ছিল মোটে দশ। দিদিটার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা মেয়েটাকে কে দেখবে — সেই কথা ভেবেই তো আবার বিয়ে করেছিল দশরথ। কিন্তু মায়ের জায়গা নিতে পারেনি জান্‌কী। বুড়ো বয়সের বৌকে একটু বেশী মাথায় তুলেছিল দশরথ। তার ফল আজ ভুগতে হচ্ছে।

চা করে এনেছে শাম্‌লি। মেয়ের হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা বাঁ হাতে নিয়ে মেয়েটার মাথার চুলে সস্নেহে একবার হাতটা বুলিয়ে দেয় দশরথ। গুলাবীর জন্যে রেখে দেওয়া সবটুকু স্নেহ যেন ঐটুকু স্পর্শের মধ্যে ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে তার। হঠাৎ চোখে জল এসে যায় হতভাগা পিতার। কাঁধে ফেলা নামাবলীটার খুঁট দিয়ে জলটুকু মুছে নেয় দশরথ। তারপর জিজ্ঞাসা করে —"দিদির কথা তোরও মনে পড়ে না, শাম্‌লি? বড়দির কথা নয়, তোর ছোড়দির কথা! মেয়েটা আমার পর হয়ে গেল রে, শাম্‌লি।" আবার দুচোখ জলে ভরে আসে দশরথের। চায়ের গ্লাসটা সে

BanglaBook.org

ফিরিয়ে দেয় মেয়ের হাতে। বলে —"না রে, চা-টা খেতে আজ আর মন নেই। রেখে দে, পরে গরম করে দিস।" বাবার এই বিচিত্র আচরণের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না শাম্‌লি। গ্লাসটা হাতে নিয়ে হাঁ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে সে। কিন্তু কেন জানি না, তার চোখটাও জলে ভরে যায়। সেটা বাবার জন্যে অথবা ছোড়দির জন্যে — তা বোঝার মতো ক্ষমতাও বোধহয় শাম্‌লির নেই।

রামুটা কাঁদছে চিৎকার করে। জান্‌কী একমনে ঘুমিয়ে চলেছে। কোনো ভাব বিকার নেই, হুঁসও নেই যে, ছেলেটা কাঁদছে। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল শাম্‌লি। কাঠের চুষি কাঠিটা মুখে দিয়েও ভাইটা থামছে না। মাকে এবার ঠেলে তুললো শাম্‌লি। —"ভাই থামছে না, ও মা! মাগো! দেখো তুমি ওকে। আমায় চুলো ধরাতে হবে।"

বিরক্ত হয়ে এবার চোখ খুললো জান্‌কী। বললো — "তোর বাবার কাছে দে। আমি এখন উঠবো না। কাল রাতে গরমে আমার ঘুম হয়নি।"

—"বাবা এখনো তোমার ছেলেকে নেওয়ার জন্যে যেন বসে আছে! মন্দিরে চলে গেছে বাবা। তুমি ওঠো তো! এত বেলা অবধি শুয়ে থাকার কি আছে?"

মেয়ের মুখে স্পষ্টই বিরক্তির সুর। অস্ফুটে কি একটা বিড়বিড় করে বলে উঠে পড়ে জান্‌কী। আদুড় গায়ে শুয়েছিল সে। শুধু শাড়ীটা ঠিক করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, দু'বার হাই তুলে উঠে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বললো —"যত সব শত্তুর। বুড়ো বয়সে বুড়োর কি সখ যে হলো! তার মাশুল এখন আমাকে দিয়ে যেতে হচ্ছে। মর্, মর্ সব। যত আপদ।"

ঘরের সমস্ত কাজ করা-ই বন্ধ করে দিয়েছে জান্‌কী। এ সংসারটা যেন তার নয়। ছেলেমেয়েগুলোও যেন তার নয়। দশরথ ওদের জন্ম দিয়েছে বলে যত দায় যেন তারই। আসলে, ঘরের কাজ সব এতকাল করে দিত গুলাবী। সে চলে যাওয়ায় সকলকে জব্দ করার জন্যে যেন কোমর বেঁধে লেগে গেছে জান্‌কী।

মন্দিরের সমস্ত কাজ একা-ই সামলাতে হয় দশরথকে। সকাল বেলা মন্দিরের দরজা খুলে গত রাতের পুজোর বাসি ফুল বেলপাতা সরানো, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা — সমস্তই করতে হয় তাকে একা। বেশ সময় লাগে। তারপর মন্দিরের উঠোনের জবা গাছগুলো থেকে সাজিতে করে ফুল তোলে সে। আধময়লা তসরের ধুতি আর একটা নামাবলী সম্বল।

BanglaBook.org

শীতেই হোক বা গরমেই হোক — ঐ একই পোশাক তার। গত শীতে একটা গরম চাদর কিনবে বলে ভেবেও কেনা হয়নি। জান্‌কীর কানের দুলটা স্যাকরার কাছ থেকে ছাড়াতে হয়েছে নগদ পনেরো টাকা দিয়ে।

ঘর পরিষ্কার করে কম্বলের আসনটা মাটিতে পেতে নিল দশরথ। সাজি থেকে জবা ফুলগুলো নিয়ে একটা বড় মালা তৈরী করে নিল সে। মালাটা দেবীর গলায় পরিয়ে দিয়ে আলগা ফুলগুলো নিয়ে পুজোয় বসবে দশরথ। একটা বড় বোতলে গঙ্গাজল রাখা আছে। কোশাকুশিতে খানিকটা জল ঢেলে নিয়ে পুজোয় বসলো সে।

পুজো শেষ করে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিল দশরথ। সাজির মধ্যেই কিছু টগর ফুল আর শালগ্রাম শিলাটা নিয়ে খালি পায়েই সে যজমান বাড়ীর দিকে হাঁটা দেয়। তিনটে বাড়ীতে পুজো শেষ করে ঘরে ফিরতে তার কম করে বেলা ১১টা বেজে যাবে। আসতে যেতে কম করে পাঁচ মাইল রাস্তা সব মিলিয়ে, ঘরে ফিরে তবে মুখে কিছু দিতে পারবে। যজমান বাড়ী থেকে পাওয়া সন্দেশ আর কাটা ফলগুলো সে খায় না। বাড়ী এসে শাম্‌লির হাতে তুলে দেয় রোজ। রাস্তায় যেতে যেতে আবার তার মনে হচ্ছিল গুলাবীর কথা। কোশি নদীর ধারে নতুন বাজারের কাছে গুলাবীর ভাতের হোটেল। জানে সে। আজ বড় ইচ্ছে হচ্ছে একবার মেয়েটাকে দেখে আসতে। সব পুজোর কাজ শেষ করে ভীরু ভীরু পায়ে দশরথ এলে হাজির হলো গুলাবীর "আনন্দময়ী হোটেল"-এর দরজায়।

গুলাবীর এখন মরবার সময় নেই। একটু পরেই দলে দলে খদ্দের আসবে। কেউ খাবে মাছ ভাত, কেউ ডাল তরকারী ভাত। কেউ বা মাংস ভাত। এক হাতে রান্না। ছেলে দুটো হাতা হাতা ভাত খদ্দেরের পাতে দিতে দিতে হাঁফিয়ে যায়। তারই মধ্যে সকলের খাওয়ার হিসেব দিতে হয় দিদিকে। এমন সময়ে হোটেলে পৌঁছালো দশরথ। হঠাৎ কি যে বলবে মেয়েটাকে, ভেবে পায় না সে। সাজির মধ্যে থেকে দুটো সন্দেশ বের করে গুলাবীর হাতে দিয়ে বলে —"এ দুটো মুখে দে, মা। মায়ের প্রসাদ।"

হাত পেতে সন্দেশ দুটো নেয় গুলাবী। বাবাকে হেঁট হয়ে প্রণাম করে সে। তারপর বলে —"এত রোদে কেন এলে, বাবা? আমায় বললে আমিই তো যেতে পারতাম। রোগা শরীর তোমার। একটু বসে যাও।

BanglaBook.org

দই দিয়ে তোমার জন্যে একটু ঘোল করে দিই।"

আঁচলের প্রান্ত দিয়ে একটা বেঞ্চি একটু মুছে দিল গুলাবী। দইয়ের ঘোল করে এনে দিল বাবাকে। তারপর বাবার খাওয়া হয়ে গেলে সে বলে — "আজ ছাতা নিয়ে বার হওনি বাবা? এত রোদ্দুরে আসে কেউ। এরপর যদি কোনোদিন আসো তবে সন্ধ্যার দিকে আসবে। রোদে একদম নয়।"

মেয়ের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকে দশরথ। চোখের কোলে কি কালি পড়ে গেছে গুলাবীর? ভাল করে দেখতে পায় না সে। সে বলে —"ঘরে বড় অভাব রে, গুলাবী। রোদ্দুরে কি সাধ করে বার হই? বাড়ীতে শান্তি নেই। মনে হয় যতটা পারি বাইরে থাকি। এতদিন পরে তোকে দেখে কি ভাল যে লাগছে!" রওনা হবে বলে উঠে দাঁড়ায় দশরথ।

—"তুমি একটু দাঁড়াও বাবা। এক্ষুনি আসছি আমি।" বাবাকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেল গুলাবী। কাঠের হাতবাক্সটা আঁচলের চাবিটা দিয়ে খুললো সে। ভিতর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এনে বাবাকে সে বললো— "টাকাটা তুমি রাখো বাবা। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। দরকার লাগলে আবার এসো, যা পারবো দিয়ে দেবো।" বাবার কপালের ঘাম হাত দিয়ে মুছে দিল গুলাবী। কি বলবে ভেবে পায় না দশরথ। ধরা ধরা গলায় একবার বলতে গেল —"জান্‌কীর জন্যেই তো আজ তোকে চলে যেতে বলতে হয়েছে আমাকে। অথচ, সেই তুই তোর গরীব বাপকে আজ তোর নিজের রোজগারের টাকা.."

আর বলতে পারে না দশরথ। হু হু করে ডুকরে কেঁদে উঠে সে দুহাতে গুলাবীকে জড়িয়ে ধরে।

গুলাবীর চোখে জল নেই। স্থির, নিথর দৃষ্টি। সে বলে —"তুমি এসো বাবা। আমার খদ্দেরদের আসার সময় হয়ে গেছে। এখুনি সব এসে পড়বে। আমার তখন মরবার সময় থাকবে না। তুমি এসো, বাবা।"

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দশরথ। মনে হলো, আজও সে তার এই মা-হারা মেয়েটাকে যেন চিনতে পারেনি! কি দিয়ে তৈরী গুলাবী?

আর কোনো কথা না বলে পথে নামে দশরথ। ——"দিদি, ভাতটা ফুটে যাচ্ছে।" কাজের ছেলেটা ডাক দিল গুলাবীকে। "আসছি রে, তুই

BanglaBook.org

একটু জল ঢেলে দে কড়াতে।" বলে গুলাবী। ততক্ষণে অনেকটা পথ চলে গেছে দশরথ। কোমরে শাড়ীর আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে উনুনটার দিকে এগিয়ে যায় গুলাবী।

।। ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।।

হাতের ছড়িটা আর ফুলের মালাটা গুলাবীর হাতে ধরিয়ে দেয় চিরঞ্জিলাল। তারপর বলে— "আজকের রাতটা তোর কাছে থাকবো বলে চলে এলাম। হোটেলের খাবার নিশ্চয়ই আছে? আজ তাই দিয়েই চালিয়ে দেবো। ভেতরে চল।" তবু দাঁড়িয়ে থাকে গুলাবী। পা চলে না তার। গুলাবীকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু হাসে চিরঞ্জি। তারপর ওর চিবুকটা ধরে বলে —"ভয় নেই রে। এ জন্যে আলাদা টাকা পাবি তুই। তোর কাকা তোকে ঠকাবে না, পয়সার ক্ষতিও হতে দেবে না।"

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে কাপড়ের ছোট থলেটা বের করে একখানা দশটাকার নোট আর একটা পাঁচটাকার নোট নিয়ে গুলাবীর মুখের সামনে ধরে সে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে গুলাবীর মুখের কাছে নামিয়ে আনে। মুখটা সরিয়ে নেয় গুলাবী। —"আরো চাই? বেশ, নে!" আরো একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে চিরঞ্জিলাল। তারপর বলে— "চল ভেতরে। রাত করছিস শুধু শুধু। খাওয়াটা পরে হবে।"

ভিতরের ঘরে স্থির হয়ে চৌকির ওপর বসে আছে রঘু। সব কথা ওখান থেকে শোনা যায়। কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ রঘুকে দেখতে পেয়ে মাথায় খুন চেপে যায় চিরঞ্জির। —"শুয়োরের বাচ্চাটা এখানে কি করছে?" চিৎকার করে ওঠে সে —"বুঝেছি, এই জন্যেই দরজা খুলতে দেরী হচ্ছিল তোর? গুলাবীর হাত থেকে নিজের ছড়িটাকে কেড়ে নিয়ে সে এক ঘা বসিয়ে দেয় রঘুর পিঠে। —"হারামির বাচ্চা, আজ তোকে শেষ করে দেবো! কোথায় পা রেখেছিস জানিস্ না। আজ বুঝিয়ে দেবো। জানে মেরে শেষ করে দেবো।" আবার লাঠি তুললো চিরঞ্জি। এক হাত দিয়ে লাঠিটা ধরে নিল গুলাবী। বললো — "কি হচ্ছে এসব? ও এসেছিল একটা কাজে। হঠাৎ আপনি এসে যাওয়ায় ওকে দেখতে পেলেন।"

BanglaBook.org

—"কাজে? কোন্ কাজে শুনি? যে কাজটার জন্যে আমি বড় বড় পাত্তি খরচা করি — সেই কাজে? বিনি পয়সায় মজা মারার মজা আজ দেখিয়ে দেবো। শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার।"

রাগে কাঁপছিল চিরঞ্জিলাল। তাকে ধরে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে রঘুকে বলে গুলাবী —"তুমি চলে যাও, রঘুদা। যা বলার পরে আমি বলবো তোমায়, তুমি এখন যাও।"

তখনও আস্ফালন করে চলেছে চিরঞ্জিলাল। —"আপনি আমার মাথা খান, কাকা! এখন না চলে গেলে কাল সকালে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। আপনি যান, কাকা।" কাঁদতে কাঁদতে বলে গুলাবী।

—"হারামজাদী, বেশ্যা কোথাকার! দেখানোর মতো মুখ তোর আছে? কাকার সঙ্গে শুয়ে আবার সতীপনা দেখানো? তোদের দুজনকে আমি উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।"

ঠেলে চিরঞ্জিকে দরজার বাইরে বের করে দিল গুলাবী। তারপর ঘরে এসে বললো—"তুমি আর এখানে এসো না, রঘুদা। এলে আমার মরা মুখ দেখবে। আমি গলায় দড়ি দেবো।" কান্নায় ভেঙে পড়লো গুলাবী। কিছুক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে রঘুনাথ। তারপর বলে — "তুমি না এলে তুই যদি সুখে থাকিস্ তবে আর আসবো না। তোকে কষ্ট দিয়ে আমার সুখ দরকার নেই। আমি আসবো না।"

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রঘু। খাটের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে গুলাবী। আর পিছন ফিরে তাকালো না রঘুনাথ। চপ্পলটা খুঁজে নিয়ে পায়ে গলিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে যায় সে। তার গোলাপের কোনো কষ্ট সে দেখতে পারে না। চৌধুরী কাকা গোলাপের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে চলেছে। গোলাপ সব বুঝতে পারলেও নিরুপায়। কিছু করার নেই গোলাপের।

এ কথাটা বুঝতে পেরেছে রঘুনাথ। গোলাপের কোনো দোষ আর চোখে পড়বে না তার। কখনো নয়।

অত রাত্রে স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে হঠাৎ অবাক হয়ে যায় সাবিত্রী। আজ আর না-ও ফিরতে পারে — বলে গিয়েছিল চিরঞ্জিলাল। কোথায় যাবে তা সঠিক বলেনি সে সাবিত্রীকে। হয়তো খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল সাবিত্রী। কিন্তু সে জানে বলে কোনো লাভ নেই।

BanglaBook.org

চিরঞ্জিলাল যা করবে ভাববে — তা সে করবেই। কোনো কথাতেই সে সরবে না। স্বামীকে রোজ কাছে পাবার আশা আর সে করতে ভুলে গেছে। তবু, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীকে ঘরে দেখতে পেয়ে একটু খুশী যে সে না হলো এমন নয়, বিছানা ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেসা করলো —"আপনি যে বলে গিয়েছিলেন ফিরতে না-ও পারেন?"

—"হ্যাঁ, সেই রকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু শুয়োরের বাচ্চা রঘুটা সব বরবাদ করে দিল। গুলাবীর ঘরে ওর রাত কাটানোটা আমি জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবো। ওই হারামির বাচ্চা জানে না কোথায় হাত দিয়েছে।" কাঁধের চাদরটা বিছানার ওপর রাখতে রাখতে বলে চিরঞ্জিলাল।

কিছু বুঝতে বাকি থাকে না সাবিত্রীর। আজকের রাতটা তাহলে গুলাবীর ঘরেই কাটাতে গিয়েছিল স্বামী। ওখানেই হয়তো রঘুনাথের সাথে কিছু একটা হয়ে থাকবে। একটা মতলব খেলে যায় তার মাথায়। চিরঞ্জিলালকে শান্ত করে খাটে বসায় সে। কাছে ঘন হয়ে এসে বলে —"কদিন থেকে একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছে। বলবো আপনাকে?" চিরঞ্জি কেমন বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকে সাবিত্রীর দিকে। সাবিত্রী আবার বলে —"আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু গুলাবীকে ছেড়েও আপনি থাকতে পারেন না, পারবেন না। গুলাবীকে আপনি ঘরে আনুন। আমি ওকে মেনে নেবো।" বুকের মধ্যে একটা কান্না দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে চায় সাবিত্রীর —"গুলাবী আপনাকে একটা ছেলে দিতে পারবে। আপনার বংশ থাকবে। আমাদের শেষ কাজ ঐ ছেলেই করতে পারবে, দেখবেন।"

নেশার ঘোরটা কেটে গেছে চিরঞ্জির। না হলে তার মনে হতো নেশার ঝোঁকে সে কি না কি শুনছে। একটু চুপ করে থেকে সে বললো — "লোকে কি বলবে তা ভেবে দেখেছিস? বলবে, তিন মেয়ে, জামাই, নাতি নাতনি নিয়ে ঠাকুর চিরঞ্জিলাল আবার এই বয়সে কচি বৌ ঘরে আনলো? তাছাড়া, তোরও কষ্ট হবে সতীনের সংসার করতে। হবে না রে, সাবি?"

সাবিত্রীকে এক হাত দিয়ে কাছে টানার চেষ্টা করে স্বামী চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। একটু সরে বসে সাবিত্রী। বলে— "আমার জন্যে ভাববেন না। আপনার বংশ তো আমি রক্ষা করতে পারলাম না। যদি আর কাউকে দিয়ে তা হয় তবে আমি তা মেনে নেবো। আপনি কথাটা ভেবে দেখুন।

BanglaBook.org

এখন রাত হয়েছে। আপনার ঘুমাতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।"

আলনা থেকে একটা লুঙ্গি নিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে দেয় সে। মাথার ওপর দিয়ে লুঙ্গিটা গলাতে গলাতে বলে চিরঞ্জি—"দেখি! এত সহজে তো সব জিনিস হয় না। মেয়েটারও তো মতামত বলে একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া, ওর বাপটা আছে। বামুন হলে কি হবে, এক নম্বরের অর্থপিশাচ ঐ লোকটা। কত না জানি চেয়ে বসবে এর জন্যে।"

বিছানায় স্থূল দেহটা ধপ্ করে ফেলে দেয় চিরঞ্জি। পাশে বসে থাকা সাবিত্রীকে এক টান দিয়ে নিজের গায়ের ওপর টেনে নিয়ে বলে — "তোকে আমি যতটা খারাপ ভাবি, তুই তা নয়। সারা জীবন তোর ওপর শুধু অন্যায়ই করে গেছি। কোনোদিন তোর মুখের কথা ভাবিনি। অথচ আজ সেই তু-ই আমার কথা প্রাণ দিয়ে এত ভাবছিস! সতীন নিয়ে তোকে আমি ঘর করতে বলবোনা। তার চেয়ে মেয়েটা যদি আমাকে একটা ছেলে দিতে পারে, তবে এর জন্যে যা সে চাইবে, তাকে তার আশ মিটিয়ে আমি দিয়ে দেবো। অবশ্য যদি সে রাজী হয়। আমারই টাকায় তার হোটেল। সে কি 'না' বলবে? তোর কি মনে হয় সাবি?"

'সাবি' বলে অনেকদিন চিরঞ্জি ডাকেনি সাবিত্রীকে। বিয়ের পর পর কিছুদিন এই নামে তাকে ডাকতো স্বামী। কিন্তু সে-ও তো তিন যুগ আগের কথা। —"তার মানে? গুলাবীকে আপনি টাকা দেবেন, আর সে তার পেটে ধরবে আপনার ছেলে? আপনি এই বয়সে....." কথাটা শেষ করতে পারে না সাবিত্রী। হাসতে থাকে চিরঞ্জিলাল। বলে— "তুই তো আমায় সে সুযোগ করতে দিস না, তাই জানবি কি। এখনো আমি কত পারি, তা দেখিয়ে দিতে পারি তোকে।" একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে চিরঞ্জি। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারে সাবিত্রী।

ঘুম জড়িয়ে আসছিল তার। এতটা শারীরিক আর তারও চেয়ে বেশী মানসিক ধকল আর সহ্য হচ্ছিল না সাবিত্রীর। পাশে তাকিয়ে দেখে, পাশ বালিশটা আঁকড়ে ধরে কাত হয়ে শুয়ে আছে চিরঞ্জিলাল। এপাশ ফিরে শুয়ে পড়ে সাবিত্রী। কিন্তু দুই চোখের পাতা তার খোলা-ই থাকে। শুয়ে শুয়ে একটা ফুটফুটে শিশুকে কল্পনায় দেখতে পায় সে। 'মা' বলে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে ছেলেটা। এক মাথা কালো চুল। ফর্সা ধবধব করছে গায়ের রং। কিন্তু মুখের আদলটা তার গুলাবীর মতো।

BanglaBook.org

হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরটা ছিঁড়ে যায় সাবিত্রীর। ভেঙে যায় অমন স্বপ্নটা। দুচোখে জল এসে যায় তার।

কথাটা শুধু গুলাবীকেই নয়, দশরথকেও বোধ হয় বলা দরকার বলে মনে হয় চিরঞ্জিলালের। ভালো মতো টাকা দেবার কথা বললে দুজনেই হয়তো রাজী হয়ে যাবে। সত্যিই যদি গুলাবী রাজী না হয় তবে অন্য টোপ ফেলবে চিরঞ্জিলাল। প্রচুর টাকা আর রঘুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অন্য কোথাও রঘুর জন্যে একটা গাড়ীর গ্যারেজও করে দিতে পারে চিরঞ্জি। এখানকার হোটেলটা তখন বন্ধ করে দিলেই চলবে। ভাল মতো একটা রোজগারের রাস্তা থাকা নিয়ে কথা। তাছাড়া রঘুকে ভালবাসে গুলাবী। রঘুর সঙ্গে এত সহজে বিয়েটা হবে জানলে গুলাবী হয়তো আর অরাজী হবে না। রঘুকে অতশত জানানোর দরকার নেই।

সকাল সকাল কালীমন্দিরে গিয়ে হাজির হয় চিরঞ্জি। কাল রাতেই কথাটা মনে ধরিয়ে দিয়েছে সাবিত্রী। আজ সকালেই একটা প্রস্তাব সে রাখতে চায় দশরথের কাছে। সকালের দিকে মন্দিরে দশরথ আসবে পুজো করতে। এসব কথা দশরথের বাড়ীতে কিংবা বড় হাভেলিতে বলা যায় না। নিরিবিলি জায়গা মন্দিরটাই। এদিকে লোক আসা যাওয়াও কম। একমাত্র কালীপুজোর দিনেই যা লোকের আসা যাওয়া। অন্য সময়ে দশরথ ভিন্ন কে-ই আসে এখানে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই চিরঞ্জি দেখতে পেলো দূর থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে ফুলের সাজিটা হাতে করে হেঁটে আসছে দশরথ। মন্দিরের দাওয়ায় ঝরা পাতার মধ্যে বসে ছিল চিরঞ্জিলাল। দশরথকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

—"আপনি, এমন সময়ে এখানে? কর্তা!" একটু অবাক হয় দশরথ। "পুজো দেবেন নাকি? কিন্তু এখানে তো আপনাকে কখনো পুজো দিতে দেখিনি আগে। পুজো যা, তা তো বাড়ীতেই হয় আপনার। সেখানেই তো আমি বরাবর তা করে আসছি। তবে এখানে যে?" প্রশ্ন করে দশরথ।

—"তোমার সঙ্গে কথা আছে, ঠাকুরমশাই। আগে পুজোটা সেরে নাও। তারপর কথা হবে। একটু সময় দিতে হবে আমায়," বললো চিরঞ্জিলাল। কিছু বুঝতে পারে না দশরথ। এই লোকটার টাকায় তার মেয়ের হোটেল হয়েছে — জানে দশরথ। লোকটাকে নিয়ে তার মেয়েটাকে ঘিরে কিছু গল্পও কানে এসেছে তার। সম্ভবত গুলাবীকে নিয়েই হয়তো

BanglaBook.org

কিছু তাকে বলতে এসেছে চিরঞ্জিলাল। মনে মনে ভাবে দশরথ। বলে— "কথাটা তো আগে সেরে নিলে ভাল হতো। তাহলে আপনাকে আর দেরী করতে হতো না।"

—"না, না। তুমি পুজোটা সেরে নাও। কথা পরে হবে। তুমি রাজী হলেই মনে হয় অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। শুধু গুলাবীকে একটু রাজী করাও। আমি ওর সঙ্গে রঘুর বিয়ে দিয়ে দেবো; মাইরি বলছি।" কালীমায়ের দিব্যি কেটে বললো চিরঞ্জিলাল। "ছেলে হলে শুধু বাচ্চাটাকে দিয়ে দেবে আমায়। ওকে দত্তক নিয়ে মানুষ করবো আমি। কেউ জানবে না বাচ্চাটার বাপ আমি। লোকে জানবে, রঘু আর গুলাবীর বাচ্চাকে আমি পালতে নিয়েছি।"

এতক্ষণে সব বুঝতে পারে দশরথ। চোখ দুটো তার চকচক করে ওঠে। বলে সে —"কিন্তু কর্তা, এতে আমার কি লাভ হবে? গুলাবী পাবে রঘুকে; আপনি হয়তো পাবেন আপনার বংশধরকে। আমার কি হবে এতে?"

—"পাবে, তুমিও পাবে নিশ্চয়ই। তোমার খাপরার ঘর আমি পাকা করে দেবো। ছোট মেয়েটার বিয়ের জন্য টাকা দেবো। তোমার নামে জমি, টাকা এসব থাকবে। তোমাকে শুধু গুলাবীকে রাজী করাতে হবে। বুঝেছ?"

সব বুঝতে পেরেছে দশরথ। সে বললো —"আমি আজ রাতে যাব মেয়েটার কাছে। সব বুঝিয়ে বলবো।" কি যে ভাবে মেয়েটা — তা বোঝে না দশরথ। নিজের জন্ম করা মেয়ের মনটা বুঝতে পারে না সে কিছুতেই। রঘুকে সে চায় কি চায় না — তাই-ই তো জানে না দশরথ। তবু দশরথ ঠিক করে — আজ রাত্রেই সে যাবে মেয়ের কাছে। তার আশা আছে, মেয়ে তার কথা ঠিক শুনবে। বুড়ো বাপের একটা ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে — এতে নিশ্চয়ই অরাজী হবে না গুলাবী।

সারাটা দিন খুব অস্থিরতায় কাটে দশরথের। যজমান বাড়ীর পুজোর কাজগুলো কোনো রকমে সেরে বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেয় সে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে, যখন গুলাবীর খানিকটা অবসর হবে— তখন গুলাবীর সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলো দশরথ।

সবেমাত্র কাজ শেষ করে চান করে ঘরের দরজা খুলে ঢুকেছে গুলাবী— এমন সময়ে এসে হাজির দশরথ। বাবাকে দেখে ভিজে

BanglaBook.org

কাপড়গুলো হাতে নিয়েই হাঁ করে চেয়ে থাকে গুলাবী। তারপর বলে— "তুমি, বাবা? কোনো খারাপ খবর নয় তো? ভেতরে এসো। আমি কাপড়গুলো উঠোনের তারে মেলে দিয়ে আসছি।" ভিতরে গিয়ে বসলো দশরথ।

প্রথমটায় সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় আশ্চর্য একটা গল্পের মতো অবাস্তব মনে হচ্ছিল গুলাবীর। সে বললো —"আমার কাছ থেকে ছেলে নেবে বলেছে কাকা? কিন্তু রঘু তা জানবে যে ছেলে তার। রঘু যদি বাচ্চাকে না দিতে চায়, তখন?" প্রশ্ন করে গুলাবী।

—"অনেক টাকা দেবে রে, চৌধুরী কর্তা অনেক টাকা দেবে। রঘুর জন্যে একটা গ্যারেজও করে দেবে বলেছে। তুই বুঝিয়ে বলবি। তাছাড়া, রঘুর বা তোর তো বাচ্চা হবার বয়েস চলে যাচ্ছে না এখনই। পরে আবার হবে বাচ্চা। অসুবিধে কি?"

কি একটু ভাবে গুলাবী। তারপর বলে —"তাহলে কিন্তু আগে টাকা, বিয়ে এগুলো হওয়া দরকার। তা নইলে আমি রাজী নই। সবটুকু এখনই রঘুকে বলার দরকার নেই। বাকিটা আমি সামলাবো। রঘু জানবে, তার বাচ্চা রয়েছে আমার পেটে। তুমি কাকাকে আমার জবাবটা জানিয়ে দেবে, বাবা। সে রাজী হলে আমিও রাজী।"

সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজে হয়ে যাবে তা মোটেই আশা করেনি দশরথ। তার যেন নিজের কানেই বিশ্বাস হতে চাইছিল না কথাগুলো। উঠে পড়লো সে। চিরঞ্জিলালকে দশরথ বলেছে — কাল সকালে আবার ঐ একই সময়ে মন্দিরে আসতে। গুলাবীর সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে, তাকে সব জানাবে। গুলাবীর শর্ত, আগে টাকা, বিয়ে এসব সারতে হবে। তারপর অন্য কথা। নিশ্চয়ই অরাজী হবে না ঠাকুর চিরঞ্জিলাল। এখন শুধু বাকি রইল রঘুনাথ। তাকে গল্পের শুধু প্রথম দিকটা-ই বলতে হবে, শেষটা নয়। তাহলে হয়তো সহজ হয়ে যাবে সব। মানুষের তো পরিবর্তন হয়ই। সে ভাববে, ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরীর বোধহয় মত পাল্টে গেছে। গুলাবীর মঙ্গল চায় বলেই হয়তো সে তার জন্যে এত করে দিচ্ছে, এমন কি, রঘুর সঙ্গে বিয়েতেও তার আর কোনো আপত্তি নেই। রঘু তো ভালইবাসে গুলাবীকে। তাকে পাওয়া, নিজের স্বপ্নের একটা মোটর গ্যারেজ পাওয়া— এতটা কি জীবনে কখনো সে পাবে বলে আগে ভেবেছিল? এর জন্যে একটা ছেলেকে বড় বাড়ীতে মানুষ হতে পাঠালে ভাল ছাড়া

BanglaBook.org

খারাপ কিছু হবে না। মনে মনে রঘুর খুশী মুখটা দেখতে দেখতে পথ হাঁটতে থাকে দশরথ। মেয়েকে যা বোঝানোর তা বোঝানো হয়ে গেছে। রঘুর মতো সরল, সাদাসিধা একটা ছেলেকে বুঝিয়ে রাজী করানো দশরথের মতো ঘুঘু লোকের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটতে থাকে দশরথ। বেশী রাত হবার আগেই বাড়ী ফিরতে হবে। বাচ্চা রামুটার জ্বর এসেছে। ফেরার পথে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরবে দশরথ। হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল সে।

।। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।।

চৌধুরী চিরঞ্জিলাল তাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে — এই কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না রঘুনাথের। গ্যারেজে একজনকে পাঠিয়েছিল চিরঞ্জি রঘুকে ডেকে আনার জন্যে। একটা গাড়ীর নীচে শুয়ে কাজ করছিল সে। লোকটার ডাকে বেরিয়ে এলো বাইরে। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেছে। জায়গায় জায়গায় তেল কালির দাগ। প্যান্টটা ধুলো আর ময়লায় মাখামাখি। একগোছা পাট নিয়ে হাতটা একটু পেট্রোল দিয়ে মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলো রঘু—"কি বলেছেন চৌধুরী কর্তা? এ বেলা আমার অনেক কাজ। রাত্রের দিকে গেলে যদি হয় তো যেতে পারি। বলে দিও কর্তাকে। রাত্রে গিয়ে কথা যা শোনার শুনবো।"

লোকটা বিশেষ কিছু জানে না। যতটুকু তাকে বলতে বলা হয়েছে — ততটুকুই সে জানিয়েছে রঘুনাথকে। রঘু তাকে যা বলতে বলে দিল — ফিরে গিয়ে চৌধুরী কর্তাকে সে সেটা জানিয়ে দেবে।

এমন কি কথা থাকতে পারে চৌধুরী কর্তার সঙ্গে? সে-ই তো বলেছিল — ও বাড়ীর ধারে কাছে তাকে দেখতে পেলে আস্ত রাখবে না। তাহলে, কি এমন দরকার পড়লো এখন? তার মা সত্যবতীকে নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি তো? মা অবশ্য কোনো কিছুর সাতে পাঁচেই থাকে না। তাহলে কি এমন জরুরি ব্যাপার সেখানে? এইসব ভাবনা রঘুর মাথায় ভিড় করে আসতে লাগলো। সারাদিন কোনো রকমে বকেয়া কাজগুলো তুলে দিয়ে বিকেলে সে বাড়ী ফিরে এলো। ভালো করে সাবান দিয়ে

BanglaBook.org

চান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা কাচা সার্ট আর প্যা পরে নিয়ে সে চৌধুরী হাভেলিতে যাবার জন্যে সাইকেলটা বের করলো। আজ শনিবার। এদের গ্রামে দোকানপাট শনিবার বন্ধ। তাই বিকেলের দিকে গুলাবীর হোটেলে কোনো খদ্দের আসবে না। রঘুর বাড়ী থেকে একটা পথ আছে চৌধুরী হাভেলিতে যাবার — যার আধা রাস্তায় পড়ে গুলাবীর হোটেল। একবার রঘু ভাবলো — যাবার পথে একটু ওখানে দেখে যাবে কিনা। কিন্তু আগের দিন দিব্যি দিয়েছিল গুলাবী — রঘু ওখানে গেলে তার মরা মুখ দেখবে।

তাই ঐ পথে না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরলো রঘুনাথ। আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছিল সে। তার নিজের দিক থেকে কোনো গরজ নেই তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার। দরকারটা যতদূর মনে হয় চৌধুরী কর্তারই। লোকটা করুক না অপেক্ষা তার জন্যে। অকারণ জোরে গাড়ী চালিয়ে গা ঘামানোর কোনো দরকার নেই রঘুর। মেঘ করেছে একটু। বাতাসটা তেমন আর গরম নেই। আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে যেতে ভালোই লাগছে রঘুনাথের।

চৌধুরী হাভেলির সামনে এসে পৌঁছে দেখলো, ফটকটা হাট করে খোলা। কেউ নেই ফটকে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে গেল রঘু। বার বাড়ীর সামনে পাঁচিলের কাছে সাইকেলটা হেলান দিয়ে একবার বার বাড়ীর বড় ঘরের সামনে উঁকি দিয়ে দেখলো চৌধুরী কর্তা ফরাসের ওপর একা শুয়ে আছে। চপ্পলটা খুলে ভিতরে ঢুকলো রঘু। মুখে বললো— "ভিতরে আসছি।" কিন্তু কোনো অনুমতি এলো না ওপাশ থেকে। একধারে থমকে দাঁড়ালো রঘু। ওকে দেখতে পেয়েছে চৌধুরী চিরঞ্জিলাল। উঠে বসলো সে। তারপর বললো —"আরে তুই? তা দাঁড়িয়ে কেন ওখানে। বোস ঐ টুলটায়। ওরে, কে আছিস— ভিতরে একটা খবর দে, সত্যবতী দিদির ছেলে এসেছে।" হাঁক দিয়ে বললো চিরঞ্জিলাল।

টুলটা টেনে নিয়ে বসলো রঘু। তারপর জিজ্ঞাসা করলো —"আমাকে আসতে বলেছিলেন?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসতে তো বলেছিলামই। বোস, কথা আছে। ওদের ডেকেছি, আসুক ওরা। একসঙ্গে যা কথা হবার তা হবে।"

বেশ আশ্চর্য লাগছে রঘুর। 'ওরা' বলতে কাদের কথা বলছে চৌধুরী কর্তা? 'ওদের' সাথে একসঙ্গে কিই-বা কথা এখানে হবে? কিছু মাথায় ঢোকে না রঘুনাথের। সে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে।

BanglaBook.org

—"তোমার গ্যারেজের কাজ কেমন চলছে? পরের কারখানায় কাজ! স্বাধীনতা তো কিছুই নেই, তা বুঝি। এই জন্যেই তো মানুষ নিজের জন্যে সময় থাকতে কিছু করে নেয়। তোমার জন্যে কদিন ধরে নানা কথা ভাবছি। তোমাদের অর্থাৎ তোমার আর গুলাবীর ব্যাপারটায় আমি ভুলই করেছি। মেয়েটা তোমায় ভালবাসে, তোমার ভালো চায়। একথা তোমাদের কাকী আমায় বলেছে। তাই ভাবলাম "

কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকলো সত্যবতী। সঙ্গে গুলাবী। গুলাবীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় রঘুনাথ।

—"আরে, এসো এসো তোমরা। দেখো, রঘুকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সে-ও এসে গেছে। গুলাবী, তুই তো সত্যবতী দিদির কাছে সব শুনেছিস। তোর বাবাকেও আমি বলেছিলাম সব। তার কোনো অমত নেই। এখন রঘু কি বলে, জানতে পারলে চার হাত এক করে দেওয়া যায়। রঘু, তুই গুলাবীকে বিয়ে করবি? গুলাবীরও মত হয়েছে। তোর জন্যে আমি পূর্ণিয়ায় একটা গ্যারেজ করে দেব। সেখানেই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবি। তোর মা এখানে যেমন আছে থাকুক। আমরা তো তার জন্যে রইলামই। এখন তোর মতামতের শুধু অপেক্ষা। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দে।" বললো চিরঞ্জি। হঠাৎ চিরঞ্জির এতখানি পরিবর্তন— বিশ্বাস হচ্ছিল না রঘুনাথের। একবার মনে হলো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন তো হয় মানুষের। তাই হয়তো...। কিন্তু তা বলে এত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে?

রঘুকে নীরব দেখে কথা বললো চিরঞ্জি —"রঘু যদি মতামত দেবার জন্যে দুচার দিন সময় চায় তবে নিতে পারে। আজই, এক্ষুনি হয়তো ও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ঠিক আছে, আজ তুই রাতটা ভাব। কাল পর্শু আমাকে জানাস।"

রঘু তাকালো গুলাবীর দিকে। গুলাবী মেঝের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। — "আপনি যা ভালো বুঝবেন তা-ই হবে। আমাদের আর কি বলার আছে। গুলাবীর জন্যে আপনিই হোটেল করে দিয়েছেন। আজ আপনার দয়াতেই সে করে খাচ্ছে। আবার আপনি যা বলবেন — তাই হবে। আমার কোনো অমত নেই।" বললো রঘু। লক্ষ্য করলো, এ কথা শুনে তার দিকে একবার চোখ তুলে দেখলো গুলাবী।

—"সত্যবতী দিদি, তাহলে ঐ কথা-ই থাকছে? নিশ্চিন্ত হলাম আমি। মেয়েটা তো আমার মেয়েরই মতো। ওর কিছু একটা ভালো হলে মনে

BanglaBook.org

করবো আমারই একটা মেয়ের মঙ্গল হলো।"

সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। —"আমি তবে এখন আসি, কাকা?" বললো রঘু। "দরকার মতো খবর দিলে চলে আসবো।"

গুলাবীর দিকে একবার তাকিয়ে সত্যবতী আর চিরঞ্জিলালকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল রঘু। গুলাবী যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই রইল। কোনো কথা বললো না।

রঘুর সঙ্গে গুলাবীর বিয়ের কথা পাকা হয়েছে — এ খবর পেয়েছে জান্‌কী। সে বুঝেছে, এ বাড়ীতে সে আর কোনোদিন গুলাবীর মতো কোনো বিনা মাইনের দাসী তো পাবেই না; ভবিষ্যতে গুলাবীর কাছ থেকে তার স্বামী দশরথও কখনো কোনো অর্থ সাহায্য পাবে না। এখানকার হোটেল তুলে দিয়ে বিয়ের পরে পূর্ণিয়ায় চলে যাবে গুলাবী। তখন তার নিজের সংসারকে দেখবে, না, বাপকে সাহায্য করবে? এসব ভেবে মেজাজটা খারাপই ছিল তার। গুলাবীর মায়ের যে দু'গাছা রুলি জান্‌কীর হাতে ছিল — সেগুলো দশরথ মেয়েকে দেবে বলে চাইতেই যেন আগুনে ঘি পড়লো। চিলের মতো চেঁচাতে লাগলো জান্‌কী। বললো — "আমাকে বিয়ে করে আনার সময়ে দেওয়ার মধ্যে তো ঐ দুগাছা হাতের গয়না দিয়েছিলে। এবার সেগুলোও চেয়ে নিতে এসেছ! আমার একটা মেয়ে আছে — তার বিয়ে দিতে হবে না? সে খেয়াল তোমার আছে? এমন এক চোখো বাপ আমি বাপের বয়সে কোথাও দেখিনি। এ আমি দেবো না। কই, আমার বিয়ের সময়ে তো কথা ছিল না যে, ওগুলো তোমার মেয়ের বিয়ের কাজে দিতে হবে! মেয়ে সোহাগী বাপ নিজে গড়িয়ে দিক না মেয়ের গয়না। চৌধুরী কর্তা বিয়ে দিচ্ছেন — তিনি তাহলে দিচ্ছেনটা কি?"

—"তিনি তো যা দেবার দিচ্ছেনই। আমি তো বাপ, আমারও তো একটা কর্তব্য আছে?" মিন্ মিন্ করে বললো দশরথ।" তাছাড়া, ওগুলো ওর নিজের মায়ের জিনিস। ওগুলোর ওপর দাবী ওরই বেশী।"

রাগে হাত থেকে দু'গাছা রুলি উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল জান্‌কী। উঠোনে নেমে হেঁট হয়ে সেগুলো তুলতে লাগলো দশরথ।

আগেই হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে গুলাবী। আগে থেকে না জানালে মাসিক খদ্দেরদের অসুবিধা হবে। নতুন কোনো খাওয়ার জায়গা আবার দেখে নিতে হবে তাদের। বাসনপত্রগুলো বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

বেঞ্চিগুলো আশপাশের দোকানগুলো একটা দুটো করে কিনে নিয়েছে, দোকানের সামনে বসার ব্যবস্থা করার জন্যে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উঁচু বেঞ্চিগুলো নিয়েছে। শুধু ঘরগুলো এখনো ছাড়েনি গুলাবী। এখনো সে রয়েছে ওখানে। বিয়ে পর্যন্ত থাকবে। বাপের বাড়ীতে সে যাবে না। বিয়েটা হবে চৌধুরী হাভেলিতে। এটা সাবিত্রীরই ইচ্ছে। ঐ বাড়ীতেই বিয়ে করতে যাবে রঘুনাথ। সে সময়টা সত্যবতী থাকবে রঘুর বাড়ীতে। এ রকমই ব্যবস্থা হয়েছে।

নিজের গ্যারেজে সব জানিয়ে রেখেছে রঘু। হরিবিষ্ণু প্রথমটায় একটু ধাক্কা খেয়েছিল, রঘু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে জেনে।

—"আমি চেষ্টা করবো কোনো একটা কাজ জানা মিস্ত্রিকে তোমার এখানে দেওয়ার জন্যে। যতদিন না তা পারছি, রবিবার রবিবারে এসে একটু দেখে যাবো কাকা। তেমন জরুরি দরকার পড়লে জানিও। আমি না হয় করে দিয়ে যাবো এসে।" বলেছিল রঘু। হেসেছিল হরিবিষ্ণু। সে জানে, তা কার্যক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তা হতেই পারে না। নিজের ব্যবসা ছেড়ে রঘু আসবে তার গ্যারেজে কাজ করতে? তবু কথাটা ভাল লাগলো হরিবিষ্ণুর। ছেলেটাকে ভালবাসে সে। চলে গেলে শুধু কাজের দিক থেকে সে ওকে হারাবে — তাই নয়। মনের দিক থেকেও একটা শূন্যতা রয়ে যাবে হরিবিষ্ণু যাদবের। এসব সত্ত্বেও রঘুর একটা ভালো কিছু হতে চলেছে, রঘু সংসার পাততে চলেছে নিজের ভালবাসার মানুষকে নিয়ে — এতে খুশীই হয়েছে হরিবিষ্ণু। দীনু, ছোটকুরা মন খারাপ করে বসে আছে রঘুদা চলে যাবে বলে। তবে, জামাকাপড় ক্ষার দিয়ে কেচে বিছানার নীচে চেপে রেখে দিয়েছে বিয়ের দিন পরবার জন্যে। শুধু রঘুর মনটা-ই কেমন একটা শূন্যতায় ভরে রয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে সে। কে জানে সে জীবন কেমন হবে? আগে মাঝে মাঝে গুলাবী রাতে এসে থাকতো রঘুর ঘরে। এখন থেকে শুধু এক-একটা রাতের জন্যে নয়, সে থাকবে রোজ। সপ্তাহে সাত দিন, মাসে তিরিশ দিন। তার সংসার সামলাবে, দুজনের জন্যে রান্নাবান্না করবে, সারাদিনের পরে যে ঘরে একা ঢুকলে রঘুর মন কেমন যেন উদাস উদাস লাগতো — সেই মন উদাস করা ঘরে এখন থেকে থাকবে একটি নারী — যে তার প্রেয়সী, গৃহিণী, হয়তো একদিন হবে তার সন্তানের জননী। রাতের আঁধারে নিজের একার ঘরে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছিল

BanglaBook.org

রঘু। বাবা নেই তার। মায়ের কাছে শুনেছে — তার বাবার বড় সাধ ছিল একটা পুত্রবধূর। সে তাকে যত্ন করবে.....তার বংশধর-এর জন্ম দেবে। তার একমাত্র এবং বড় আদরের 'রঘুবাবার' জীবন যৌবনকে নিয়ে যাবে চরিতার্থতার সপ্তম স্বর্গে। বাবার কথা ভাবলে চোখে জল আসে রঘুর। অচরিতার্থ, নিষ্ফল এক জীবন। সুখ যখন নাগালের কাছে— তখনই শেষ হয়ে গেল সব। রঘুর মধ্যে দিয়ে সে দেখতে চেয়েছিল তার নিজের জীবনের পূর্ণতা। বাল্যকালে সে হারিয়েছিল তার বাবাকে। রঘুকেও সে বাল্যবয়সে পিতৃহীন করে রেখে গেল। বাবার দুঃখটা হঠাৎ বুঝতে পারে রঘুনাথ। আজ বাবা থাকলে রঘু দেখাতে পারতো বাবাকে— তার পুত্রবধূকে। বাবার বড় আদরের 'রঘুবাবা' তার 'গোলাপের' পাপড়ির কোমল প্রশ্রয়ে রাত কাটাচ্ছে। 'রঘুবাবার' রাত আজ গোলাপের সুগন্ধে সুগন্ধিত.....'রঘুবাবার' জীবন আজ পূর্ণতায় ভরপুর।

সেই অন্ধকারের মধ্যে গুলাবীর জন্যে যেমন উতলা হয়ে গেল তার মন, তেমনি তার মৃত পিতার জন্য হঠাৎ দুচোখে জল ভরে এলো রঘুনাথের। সেই মিশ্র অনুভূতির মধ্যে ভাসতে ভাসতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো রঘুনাথ।

বিয়ের আর একমাসও বাকি নেই। গুলাবীকে নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিস কিনে দেবে বলেছে চিরঞ্জিলাল। হঠাৎ এই বিয়েতে তার এত আগ্রহ অবাক করে দিয়েছে সকলকে। রঘুর কানে আসছে সব। চিরঞ্জি রঘুকে আগাম কিছু টাকাও দিয়েছে ওদিককার খরচ খরচা সামলানোর জন্যে। রোজ একবার করে চিরঞ্জি যাচ্ছে গুলাবীর কাছে। পূর্ণিয়ায় নিয়ে যাবে তাকে গয়না কেনার জন্যে, খুব খুশী গুলাবী। সে পাবে রঘুকে, রঘু পাবে তার স্বপ্নের একটা গ্যারেজ। জমি পাবে গুলাবীর বাপ দশরথ, নগদ বেশ অনেক টাকাও। শুধুমাত্র একটা বিয়ে থেকে কতজন লাভ ওঠাবে। সাবিত্রী বেঁচে যাবে তার স্বামীকে হারানোর যন্ত্রণা থেকে। আর, চিরঞ্জি হয়তো এত সবের বিনিময়ে পাবে একটি পুত্রসন্তান —যে সন্তান তাকে নরকবাসের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি দেবে। এ-তো বিয়ে নয়; এ এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ! শেষ পর্যন্ত কার জীবন দিয়ে যে সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হবে কে জানে!

হোটেলের ঘরের সামনে একটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে কোশির জলের ধারা। হাঁটু সমান জল কোথাও কোথাও। যেখানে জল একটু

BanglaBook.org

বেশী— সেখান দিয়ে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা। মেয়ে পুরুষ, বৃদ্ধ শিশু— মোটঘাট হাতে বা মাথায় নিয়ে কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে বালির মধ্যে দিয়ে জলে নেমে উঠছে নৌকোতে। নৌকোর গলুইয়ে একটা মাঝি এক হাতে হাল ধরে অন্য হাতে বিড়ি টানছে বসে বসে। অন্য লোকটা কোমর সমান জলে একটা বাঁশ নিয়ে জল মাপছে আর যাত্রীদের নৌকোয় ওঠার তদারকি করছে। বাঁধের ওপর একটা নেড়া কুলগাছের তলায় বসে বসে দেখছিল গুলাবী। হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে সে। মুদিখানার জিনিসপত্র মাসখানেকের মতো দিয়ে গেছে চিরঞ্জিলাল। কাঁচা বাজারের জন্য কিছু নগদ টাকা দিয়েছে গুলাবীর কাছে। তা দিয়ে সকালের দিকে বাজার করে আনে গুলাবী। একার জন্যে রান্না। কিই বা কাজ এমন! বিকেলের দিকটা নদীর ধারে বসতে যে এত ভাল লাগবে — তা জানতো না গুলাবী। এক ঝাঁক টিয়াপাখি ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু সোনালী বালির ওপর পড়ে আছে গলানো নরম সোনার মতো। প্রায় স্থির জলে খেয়া নৌকোটার গাঢ় ছায়াটা যেন আসল নৌকোটার সঙ্গে তলায় পড়ে লুকোচুরি খেলছে। এক মনে সেদিকে তাকিয়েছিল গুলাবী। কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তা খেয়ালও হয়নি তার। এবারে ঘরের দিকে ফিরতে হবে। চিরঞ্জিলাল কাকা প্রায় রোজই এসে খবর নিয়ে যায়। আজ রাতের দিকে কোনো একটা সময় আসবে বলে গেছে। ঘড়ি নেই গুলাবীর কাছে। এখন সঠিক কটা বাজে জানে না সে। বাড়ীতে যাওয়াই ভাল। কখন যে কাকা এসে যাবে কে জানে?

ঘরে এসে আলো জ্বেলে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নিল গুলাবী। তারপর চায়ের ব্যবস্থা কি আছে, তা দেখে রাখলো। চা পাতা, চিনি আছে। দুধ সে রাখে না। কাকা এলে লেবু চা করে দেবে কাকাকে। উঠোন থেকে রোদে দেওয়া শাড়ী আর গামছা তুলে ঘরে রেখে দিল গুলাবী। আর মাসখানেক বাদে তাকে শুধু শাড়ী নয়, সন্ধ্যায় রোদ্দুর থেকে তুলতে হবে সার্ট, প্যান্ট, ধুতি, গেঞ্জি — আরো কত কি! ভাবতেই শরীরে একটা উত্তেজনা জাগে গুলাবীর। এ সবই হবে বা হতে চলেছে একটা মানুষের বদান্যতায়। আর, তার বিনিময়ে গুলাবীকে দিতে হবে.....।

মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা গোলমাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সতীত্ব, তার ওপর তার স্বামীর বিশ্বাস একদিকে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের

BanglaBook.org

সুখ, স্বপ্ন, বাবা দশরথের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, ছোট বোনের ভাল বিয়ে — আর ভাবতে পারে না গুলাবী।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে দরজা খুলে দেয় সে। বাইরে একটা এক্কা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটা থেকে নেমে দরজায় অপেক্ষা করছে চিরঞ্জিকাকা। হাতে একটা চ্যাপ্টা বাক্স — বাদামী রঙের কাগজের প্যাকেটে করা। এক্কা গাড়ীর ভাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকলো চিরঞ্জিলাল। খাটের ওপর বসে বল্লে —"সকালে পূর্ণিয়ায় গিয়েছিলাম হঠাৎ। স্যাকরার দোকান দেখে মনে হলো — তোর জন্যে একটা হার নিয়ে নিই। একদিন তো আনতেই হতো। তোকে নিয়ে আসার ঝকমারিটা আর থাকলো না। আমি নিজেই পছন্দ করে কিনে নিলাম। দেখ্ তো পরে কেমন মানালো।"

হারটা বাক্স থেকে বের করে সে গলায় পরিয়ে দেয় গুলাবীর। আয়নার সামনে একবার নিজেকে ভালো করে দেখে কাছে এসে বসে গুলাবী। হেসে বলে — "আপনার পছন্দ কি খারাপ হতে পারে?" চিরঞ্জির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে।

হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তাকে বিছানায় টেনে নেয় চিরঞ্জি। নিজের ধুতিটা সে খুলে ফেলেছে। গুলাবীর শাড়ীটাও খুলে দিয়েছে চিরঞ্জিলাল। নিজের ভারী দেহটা দিয়ে শরীরের তলায় চেপে ধরেছে গুলাবীকে। মাংসল মুখ আর মাথাটা ঘসছে গুলাবীর গলায়, ঘাড়ে, কপালে, মাথায়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে চিরঞ্জির। মুখের কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে নামছে। গুলাবীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। চিরঞ্জি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজে বলছে —"আমাকে একটা ছেলে দে, গুলাবী। আমি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকবো রে! সাবিত্রী যা দিতে পারেনি — তা তুই আমাকে দিবি..." গুলাবীর দম বন্ধ হয়ে আসছে চিরঞ্জির অস্থির পেষনে। হঠাৎ স্থির হয়ে যায় চিরঞ্জিলাল। গুলাবীর শরীরের ওপরেই তার দেহ। একটু পরেই নেমে যায় চিরঞ্জি। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। বলে —"আমার এ কি হলো রে, গুলাবী? আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না.... তোর কাছ থেকে ছেলে পাওয়া আর বোধহয় হবে না রে আমার!"

বিমূঢ়ের মতো অন্ধকারে নীরবে শুয়ে থাকে চিরঞ্জি আর গুলাবী। গুলাবীর হাতটা নিয়ে তার শিথিল অঙ্গটা ধরিয়ে দিয়ে চিরঞ্জি বলে— "দেখ গুলাবী, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। তুই একটা কিছু করে দে,

Bangla Boi.org

গুলাবী.....নিজে থেকে আমি কিছু পারছি না।" ব্যর্থতায়, হতাশায় শিশুর মতো কাঁদতে থাকে চিরঞ্জিলাল নিজের শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে।

—"আপনি ভাবছেন কেন, কাকা! কত রকম জড়িবুটি, ওষুধ আছে এসবের জন্যে বলে শুনেছি। আপনিও খোঁজ করুন, আমিও দেখবো।"

মানুষটার জন্যে হঠাৎ কেমন যেন একটা কষ্ট হতে থাকে গুলাবীর। মনে পড়ে যায় রঘুর উদ্ধত যৌবন আর সক্ষমতার কথা। সেসব কত সুখের দিন ছিল গুলাবীর। তার দেহ, মনের সব ক্ষিদে মিটিয়ে দিত রঘু কত সহজে, কত প্রেম, কত ভালবাসায় কত অনায়াসে।

—"জানি না ওষুধে কিছু হবে কিনা। কদিন ধরেই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করেছিস রে, গুলাবী। ভাবতাম, তোর কাছে এলেই সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে! কিন্তু এখন বুঝছি, তা আর হবার নয়। আমার এত চেষ্টা, এত স্বপ্ন— সব বোধহয় শেষ হয়ে গেল রে গুলাবী!" সজল কণ্ঠ, অসহায়ের আর্তনাদের মতো শোনাতে লাগলো চিরঞ্জির উচ্চারণ করা শব্দগুলো।

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে পড়লো গুলাবী। চিরঞ্জির ধুতিটা এগিয়ে দিয়ে বললো সে—"এটা পরে নিন, কাকা। কাল আবার দেখা যাবে। আমিও চেষ্টা করে দেখবো, কতটুকু কি করতে পারি!"

উঠে ধুতিটা পরে নেয় চিরঞ্জিলাল। তারপর দুই হাতে গুলাবীর গালদুটো ধরে সে বলে— "যদি কিছুতেই কিছু না হয়— তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, গুলাবী! তার কি হবে?" আকুল তার কণ্ঠস্বর।

— "আপনি এখনই এত ভেঙে পড়ছেন কেন? পুরুষমানুষের কি সব দিন একরকম থাকে? ও দেখবেন কালই ঠিক হয়ে যাবে।" আশ্বাস দেয় গুলাবী। অথচ সে দেখেছে— রঘুর ক্ষেত্রে রোজই সে একরকম; রোজ একই রকমের দুর্দান্ত, দুর্মদ.....বল্গাহীন।

নিজের অক্ষমতার বিষয়ে চিরঞ্জিও যে খানিকটা বুঝে না গেছে, এমন নয়। কদিন সে সাবিত্রীর ওপর নিজেকে প্রয়োগ করতে দিয়ে পরীক্ষা করেছে। ভেবেছিল, সাবিত্রীর বয়েস গিয়েছে বলে চিরঞ্জি আর উত্তেজিত হয় না। কিন্তু, আজ সে বুঝে গেছে— এ আর বোধহয় হবার নয়।

হতাশ চিরঞ্জিলাল যখন গুলাবীর ঘর থেকে পায়ে হেঁটে নিজের হাভেলির দিকে রওনা হলো— তখন কালপুরুষ আকাশের পশ্চিম কোণে হেলে পড়েছে। পুরুষত্বহীন একটা মানুষ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

দেখে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করলো চৌধুরী হাভেলির দিকে।

।। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।।

অত ভোরবেলা মনিবের জন্যে ফটক খুলতে হবে ভাবতে পারেনি দারোয়ান শিউশরণ। মনিব একা, পায়ে হেঁটে কোথা থেকে এমন সময়ে এসে হাজির হলেন, বুঝতে পারে না সে। জিজ্ঞাসা করার মতো সাহসও তার নেই। শিউশরণ গেটটা খুলে নমস্কার করে চিরঞ্জিলালকে। চিরঞ্জি ধীরে পায়ে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে ঢোকে অন্দরমহলে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করেনি সাবিত্রী কাল রাত্রে। হয়তো বা ভুলেই গিয়েছিল। চিরঞ্জি দেখলো — অঘোরে ঘুমাচ্ছে সাবিত্রী। সে ডাকলো না ওকে। কোনো রকমে পাশে পড়ে থাকা অল্প জায়গাটায় এলিয়ে দিল তার হতাশ, ব্যর্থ, ক্লান্ত, অক্ষম শরীরটাকে। ক্লান্তিতে দুচোখ বুজে এলো তার।

সবে ভোর হয়েছে। চৌধুরী হাভেলির বাইরে, ভিতরের অঙ্গনে অনেক গাছ। পাখীদের কলকাকলি শুরু হয়েছে। চোখ বুজে বুজেই সব কানে আসছিল সাবিত্রীর। হঠাৎ পাশ ফিরতেই তার হাতটা গিয়ে ঠেকলো চিরঞ্জির গায়ে। চমকে উঠলো সাবিত্রী। ঘুমন্ত স্বামীকে ঠেলে দিয়ে সে বললো —"একি, আপনি? আপনি কখন এলেন? ডাকেননি তো আমাকে? দরজা খুলে দিল কে?" এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলে সাবিত্রী।

কোনো কথার জবাব দিতে ইচ্ছা করছিল না চিরঞ্জির। সারা জীবন নিজের যে শরীরটার ওপর যৌবনের ধর্মটাকে যথেচ্ছভাবে খাটিয়েছে সে, অনাচার আর অত্যাচারে কুসুমের মতো পেলব যে যৌবনটাকে সে দুই পায়ে দলিত করে এসেছে — তার মূল্য তো তাকে দিতেই হবে। গুলাবীর সাধ্য কি তাকে ফিরিয়ে এনে দেয়?

সাবিত্রীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে সে শুধু বলে — "জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে, অথবা তোর ভাগ্যেই বা কি রয়েছে সাবি! আমার লজ্জার কথা আর তুই জিজ্ঞাসা করিস না সাবিত্রী।"

কিছু বুঝতে পারে না সাবিত্রী। সে বলে —"আপনার শরীরটা যদি ভাল না থাকে, তবে শুয়ে থাকুন। আমি ওদের ডেকে বলে দিচ্ছি — মুখ হাত পা ধোওয়ার জল এখানেই তুলে দেবে।"

BanglaBook.org

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সাবিত্রী। একা চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে রইল চিরঞ্জিলাল। কি যেন ব্যবস্থা করবে বলছিল গুলাবী? এই বয়সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের লজ্জা আর অক্ষমতার কথা সে বলবে? না, তা হয় না। ডাক্তার যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এখন এই ষাট বছর বয়সে এসবের কি দরকার তার? কি জবাব দেবে সে? তার চেয়ে সে বরং কোনো জান্‌গুরুর কাছে একবার গিয়ে দেখবে, তারা কি বলে ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কোনো রকমের চেষ্টায় যদি কাজও হয়, তবে, সে সন্তান যে পুত্রই হবে— এমন কথা নিশ্চয় করে কে তাকে বলবে? তা একমাত্র জান্‌গুরুরাই জানে। তারা-ই বলে দিতে পারে ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কি লুকিয়ে রয়েছে।

রাত্রে দশরথকে ডেকে পাঠায় চিরঞ্জি। আর লজ্জা করে থাকলে চলবে না। দশরথ তো সবই জানে, চিরঞ্জি কি চায়— তা সব জেনেই তো দশরথ নিজের পরিবারের জন্যে একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ গড়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সুতরাং, দশরথকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া তো যায় না। তাছাড়া, এমনও হতে পারে, দশরথ কিছু গাছগাছালির গুণাগুণ হয়তো জানে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তো কত কি জানে বলে কানে আসে। জান্‌গুরুদের খোঁজও হয়তো দশরথের জানা থাকতে পারে — এজন্যও দশরথকে প্রয়োজন চিরঞ্জিলালের।

সারাটা দিন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কাটালো চিরঞ্জি। সন্ধ্যায় বার বাড়ীর ফরাসে বসে ছিল সে। ভৃত্য মাধব এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল ঘরে। চিরঞ্জি তাকিয়ে থাকলো তার দিকে। তারপর বললো — "কোনো খবর পাঠিয়েছে দশরথ? কিছু শুনেছিস?" মাধব হাঁ করে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছে দেখে বিরক্ত চিরঞ্জি তাকে আবার বলে — "দশরথের কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমাদের গুলাবীর বাপ, দশরথ আসবে বলেছিল। এখনো এলো না। আসবে কি আসবে না— কিছু খবর পাঠিয়েছে কি?"

মাথা নাড়লো মাধব। মাথা নেড়ে সে কি যে বলতে চাইল তা বুঝতে পারলো না চিরঞ্জিলাল। তার বিরক্তিই শুধু বাড়লো। চুপ করে শুয়ে পড়লো সে ফরাসটার ওপরে।

খুব বেশী দেরী করতে হলো না চিরঞ্জিলালকে। একটু পরেই বাইরে খড়মের আওয়াজ তুলে ঘরে এসে ঢুকলো দশরথ। চিরঞ্জি ফরাসে উঠে

BanglaBook.org

বসে বললো —"দরজাটা বন্ধ করে দাও, দশরথ। কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।" দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশে এসে বসলো দশরথ। বললো— "বিয়ের ব্যাপারে কিছু কি? আমার দিকের কাজকর্ম তো আমি এগিয়ে রেখেছি সব। আর কি কথা বলবেন, কর্তা?"

—"বিয়েটা ভাবছি আরো মাসখানেক পিছিয়ে দিতে হবে। দরকার হলে, আরো কিছু বেশী। সেটা যে কত দিন— তা আমি নিজেও এখনো জানি না। অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা।" কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলো না দশরথ। সে জিজ্ঞাসা করলো— "কর্তার নিজের শরীরটা কি যুতে নেই? কেমন কেমন দেখাচ্ছে যেন। বিয়ের একটা হাঙ্গামা আর চাপ বলে কথা! শরীরটা যুতে না থাকলে চলবে? আপনি ডাক্তার দেখান, কর্তা। নইলে এ বয়সে এতটা দায়িত্ব নেওয়া ....।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে চিরঞ্জি সোজা কথাটায় চলে আসে। বলে — "তুমি জান্‌গুরুদের কথা জানো, দশরথ? ঐ যারা সব গণনা করে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়?"

—"জানবো না কেন? এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে বড়বেড়িয়া গাঁয়ে এক জবরদস্ত জান্‌গুরু আছে। বয়েস আশির কোঠায়। লোকে বলে, একশো পার করেছে গুনীন্‌টা। কিন্তু জান্‌গুরু দিয়ে আপনি কি করবেন, কর্তা? গুলাবী আর রঘুর ভবিষ্যৎটা কি যাচাই করে দেখবেন?" হাসতে হাসতে বললো দশরথ। কিন্তু হাসলো না চিরঞ্জিলাল। ফরাসের একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসিয়ে বললো —"আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পার সেখানে? শুধু তুমি আর আমি। এখানে যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়। পারবে?"

ঘাড় নাড়লো দশরথ। বললো —"একটা এক্কা গাড়ী ঠিক করে নিলে যাওয়া আসাটা হয়ে যাবে। সঙ্গে কিছু পান সুপুরী আর কি যেন সব নিতে হয়। সে আমি কৌশলে লোকেদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবো— যারা আগে গেছে। কবে যাবেন — সেটা জানালে সেই মতো ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" গলায় মস্ত আশ্বাসের ভাব জাগিয়ে উত্তর দিলো দশরথ। মনে মনে নিজেও বেশ সাহস পেলো চিরঞ্জিলাল। দেখা-ই যাক্ না— গুনীন কি বলে! গুনীন যদি তার অক্ষমতার-ও কিছু ওষুধ দিতে পারে, তবে আরো ভাল হবে। নিজের ভবিষ্যৎ, রঘু আর গুলাবীর ভবিষ্যৎ, সাবিত্রীর ভবিষ্যৎ, দশরথের ভবিষ্যৎ— সব জেনে নেওয়া যাবে। গুনীন

BanglaBook.org

যদি কোনো ওষুধ দেয়, তবে সে ওষুধে কাজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন বিয়েটা আটকে রাখতে হবে চিরঞ্জিকে। রঘুর সঙ্গে গুলাবীর বিয়ে আগে হয়ে গেলে গুলাবীর পেটে কার বাচ্চা আছে, জানতে পারবে না চিরঞ্জি। বাচ্চাটা তার নিজের— সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তবেই সে বিয়ের দিনটা স্থির করবে। রঘু বুঝতেও পারবে না কার বাচ্চা তার বৌ পেটে ধরে আছে। তারপর, বাকিটা তো কথা হয়েই আছে। চিরঞ্জি নিঃসন্তান বলে গুলাবীর বাচ্চাটাকে চেয়ে নেবে রঘুর কাছ থেকে। বড়লোকের ঘরে নিজের সন্তান পালিত হবে— রঘু নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। শিশুটাকে দত্তক নেবে সে। রঘু আর গুলাবীকে আবার একটা নিজেদের সন্তানের জন্যে বড় জোর বছরখানেক অপেক্ষা করতে হবে। জোয়ান রঘুর পক্ষে সেটায় কোনো অসুবিধা হবে না।

—"তাহলে তুমি দেখো, কি ভাবে কি করা যায়। দু'একদিনের মধ্যে আমাকে জানিয়ে যাও কবে যাওয়া যাবে। আমি আর দেরী করতে চাই না।" বললো চিরঞ্জিলাল। দশরথ চলে গেল। চুপ করে আরো অনেকটা সময় একা একা ফরাসের ওপর বসে রইল চিরঞ্জি।

দুদিন পরে যাবার ঠিক করেছে দশরথ। এর মধ্যে সে অন্যদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে —ক'গণ্ডা পান আর কটা সুপুরী এবং কটা ধুতি গামছা নিয়ে যেতে হবে। গোপনে এসব জোগাড় করে রেখেছিল দশরথ। তাকে আগাম টাকা দিয়ে রেখেছিল চিরঞ্জিলাল। এ বাড়ীর কেউ কিছু জানে না।

ভোর ভোর বেরোতে হবে। এক্কাতে গেলেও পৌঁছাতে বেলা ৯টা হয়ে যাবে। কাজকর্ম সেরে ১১টার মধ্যে ফেরার জন্যে রওনা হলে ঘরে ফিরতে ফিরতে দুটো আড়াইটে হয়ে যেতে পারে। দশরথ 'চৌধুরী হাভেলিতে' আসবে না। নদীর ধারের বড় জামগাছটার নীচে জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করবে। একখানা এক্কা গাড়ী ঠিক করে রাখবে দশরথ। যাওয়া আসার কড়ারে। কাজ সেরে ঠিক ঐ জায়গাটায় আবার ফিরে যে যার জায়গায় চলে যাবে।

সাবিত্রীকে অন্য রকম কথা বলে রেখেছে চিরঞ্জিলাল। বলেছে— পূর্ণিয়ায় যাবে ব্যবসার কাজে। ফিরতে দুপুর কিংবা বিকেল হয়ে যাবে।

বেশ ভোরে উঠে আজ চান করে নিয়েছে চিরঞ্জিলাল। সাবিত্রী তখনো ওঠেনি। আগের রাতে চান করার জল তুলে রাখতে বলেছিল সে। শোবার

BanglaBook.org

ঘর থেকে বাইরে চানের ঘরে গিয়ে গায়ে জল ঢাললো চিরঞ্জি। বাসি জল, এত ভোরে গায়ে দিয়ে একটু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করতে লাগলো জলটায়। তবু বেশ কয়েক ঘটি জল মাথায় গায়ে ঢাললো চিরঞ্জি। তারপর গামছাটা দিয়ে গা মুছে এসে ঢুকলো শোবার ঘরে। এখনো জাগেনি সাবিত্রী। তাকে না ডেকেই ধুতিটা নিয়ে পরলো সে। পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে তার ওপর তসরের চাদরটা জড়িয়ে নিল। কে জানে, ওখানে হয়তো তাকে খালি গায়ে বসতে হবে গণনার সময়। তখন তসরের চাদরটা কাজে লাগবে। দশরথ বলে দিয়েছিল, একটা শুদ্ধ বস্ত্র সঙ্গে রাখতে। তার গরদ শুদ্ধ জিনিস। তাই চাদরটা সঙ্গে নিয়েছে চিরঞ্জিলাল।

ফটকে এখনো আসেনি শিউশরণ। নিজেই ফটকটা খুলে নিল চিরঞ্জিলাল। বাইরে এসে দেখলো, একটা লোকও পথে নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নদীর দিকে। দূর থেকে দেখতে পেলো একটা এক্কা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। রোগা হাড় জিরজিরে সাদা ঘোড়াটা খোলা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে আর লেজটা নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আরো একটু কাছে গেলে সে দেখতে পেলো জামগাছটার নীচে মোটা একটা গাছের মাটিতে শুয়ে থাকা শিকড়ের ওপর একটা পুঁটলি নিয়ে গায়ে নামাবলীটা জড়িয়ে বসে আছে দশরথ।

চিরঞ্জিলালকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ঢুকে যাওয়া তোবড়ানো গালটায় একদিনের না কামানো কাঁচা পাকা দাড়ির আভাস। হাসিতে চোখ দুটো কুঁচকে সে বলে— "দেরী দেখে আমি তো ভাবছি কর্তা ভুলেই গেলেন কিনা। যাক, এসে গেছেন। এবারে তাহলে রওনা দেওয়া যাক। জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিয়েছি। চলো হে, লছমন। ঘোড়াটা যুতে নাও। এখনই রওনা হতে হবে।"

রোগা ঘোড়াটার লাগামটা ধরে টানতে টানতে গাড়ীতে যুতে দিল লছমন। মাঠ থেকে কিছু ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা ছোট চটের বস্তায় ভরে সেটাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়াটার মুখের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল সে। তারপর লাফ দিয়ে নিজের জায়গায় চড়ে বসলো লোকটা। আগেই পিছনে উঠে বসেছিল দশরথ আর চিরঞ্জিলাল। লছমনের উঠে বসার ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো গাড়ীটা। তারপর টগবগ করে চলতে শুরু করলো

BanglaBook.org

ভোরের বাতাস কেটে।

কিছুক্ষণ দশরথ কিংবা চিরঞ্জিলাল কেউই কোনো কথা বলেনি। কি হবে, গুনীন কি বলবে, জান্‌গুরু ভবিষ্যৎ-এর কথা কি জানাবে— এসব নিয়ে চিন্তায় ছিল চিরঞ্জি। দশরথ খুব লোভী মানুষ। যেসব পাওনা-গণ্ডার আশায় সে রয়েছে— না জানি তা কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়! চিরঞ্জিলালের টাকার ওপর নির্ভর করছে তার মেয়ের, তার পরিবারের সকলের ভবিষ্যৎ। ঘোড়ার গলার ঘণ্টাটা টুংটাং শব্দে বাজছে। পায়ের খপ্ খপ্ আওয়াজের সঙ্গে মিলে তা এক অদ্ভুত আওয়াজে যেন তাল মেলাচ্ছে। দূরের দিকে আন্‌মনে তাকিয়ে রয়েছে চিরঞ্জিলাল। সামনের দৃশ্য সরে সরে চলে যাচ্ছে পিছনে। মাঝে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়ানোর জন্যে এক জায়গায় থামলো লছমন। ওখানে টিউবওয়েলের জল তুলে মুখে চোখে দিল দশরথ আর চিরঞ্জিলাল। রোদের তাপ বেড়েছে। হাওয়া একটু একটু করে গরম হয়ে যাচ্ছে। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বোধহয় পৌঁছে যাওয়া যাবে। পুঁটুলির মধ্যেকার পানগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখে নিল দশরথ। খানিকটা জল নিয়ে ভিজিয়ে নিল পুঁটুলির কাপড়টা। তারপর আবার সব গুছিয়ে রেখে দিল।

একটু পরে ফের রওনা হলো সকলে। এদিকটায় লোক চলাচল কম। কিছু আদিবাসী মেয়ে পুরুষ বাঁকে করে জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। চলতে চলতেই দশরথদের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা। তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একসময় তারা বড়বেড়িয়া গ্রামে এসে পৌঁছালো। গাঁয়ের নাম জানা থাকলেও জান্‌গুরুর বাড়ীটা জানা ছিল না দশরথের। পথে দু-একজন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে তারা দেখিয়ে দিল জান্‌গুরুর বাড়ীটাকে।

খপ্ খপ্, টুংটাং শব্দ করতে করতে দশরথদের এক্কাটা এসে দাঁড়ালো জানগুরুর বাড়ীর সামনে। পাশের দেওয়ালে একটা বুড়ি ঘুঁটে দিচ্ছিল। ওদের দেখে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে। হাতের পুঁটুলিটা সামলে নিয়ে চিরঞ্জিলালকে সঙ্গে করে কয়েক সেকেন্ড খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরে ঢুকে গেল দুজনে। এক্কাটা নিয়ে বাইরে একা দাঁড়িয়েছিল লছমন। এবারে ঘোড়াটাকে খুলে ঘাস খেতে ছেড়ে দিল সে।

BanglaBook.org

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ॥

সকাল বেলা শরীরটা কেমন যেন লাগছিল গুলাবীর। কালও এই সময়টায় শরীর খারাপ হয়েছিল তার। কিছু না খেয়েও শুধু জল বমি হয়েছিল কাল সকালে। আজ সকালে মুখটা ধোওয়ার সময় আবার বমি হয়ে গেল গুলাবীর। কেমন একটা ভয় হতে লাগলো তার। গত প্রায় মাসখানেক ধরে চিরঞ্জিলালকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি সে। আসা যাওয়া যা করেছে— তা শুধু ওপর ওপর। ঘনিষ্ঠ হতে দেয়নি গুলাবী। বলেছিল— "সব হয়ে গেলে তারপর যা হবার হবে। এখন আর নয়।" সব হওয়া বলতে, রঘুর গ্যারেজ হওয়া, তার বাবার জমি, টাকা পয়সা, গুলাবীর নিজের নামে পোস্ট অফিসের খাতা খোলা—এসব হয়ে গেলে তবেই গুলাবী তার প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করবে। বিয়েটা হওয়ার আগেই গুলাবীকে চেষ্টা করতে হবে চিরঞ্জিলালের বাচ্চাকে পেটে ধরার। চিরঞ্জি অত বোকা নয়, তার নিজের ছেলেই সে গুলাবীর কাছ থেকে পেতে চায়, রঘুর নয়, কথা সে রকমই হয়েছে। এখন হয়তো কিছুদিন নিজের শরীর নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে চিরঞ্জির। কিন্তু সে সমস্যা আশা করা যায় একমাসের মধ্যেই সমাধান হয়ে যাবে। এরই মধ্যে হয়ে যাবে যা হবার। রঘুর সঙ্গে বিয়েটা তার পরে হবে।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে গুলাবীর হোটেল বন্ধ রয়েছে। হঠাৎ আজ সকালে এসে হাজির মধুকর বলে সেই ছেলেটা। মধুকর গুলাবীর হোটেলে কাজ করতো। তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো সে— "কি রে, তুই, এমন সময় এদিকে?"

—"কোনো কাজ পাইনি, দিদি। এখানে জুতোর দোকানে একটা কাজ হয়তো হতে পারে। আজ আসতে বলেছিল আমায়। এখনো দোকান খোলেনি দেখছি।" বললো মধুকর— "এখানে একটু অপেক্ষা করি। কখন যে দোকান খুলবে, কে জানে।" ভিতরে এসে বসলো ও। গুলাবীকে বমি করতে দেখে বললো মধুকর— "তোমার কি শরীর খারাপ, দিদি? একা রয়েছ, বাবার বাড়ী চলে যাচ্ছ না কেন? রঘুদা জানে— তোমার অসুখ?"

—"নারে! কাল থেকে হচ্ছে। সেরে যাবে।" কিন্তু ও নিজে জানে, সেরে যাবার রোগ এটা নয়। কি একটা ভেবে নিয়ে তারপর গুলাবী

BanglaBook.org

মধুকরকে বলে— "আচ্ছা, মধু; তুই পারবি একবার তোর রঘুদাকে খবর দিতে? বলবি, আমার অসুখ। আমি ওকে আসতে বলেছি একবার আমার কাছে।"

ঘাড় নাড়লো মধুকর। —"এখানে দোকানের সঙ্গে কথা বলেই চলে যাবো আমি। এ বেলা না হোক, ও বেলার মধ্যে খবরটা দিয়ে দেবো রঘুদাকে।"

আবার শরীরটা কেমন যেন করতে লাগলো গুলাবীর। এবারে কালকের রাতের ভাতটার সবটা উঠে গেল। ভিতরে এসে শুয়ে পড়লো সে। কলসি থেকে একটু জল গড়িয়ে নিয়ে তার কাছে ধরলো মধুকর। জলটা দিয়ে মুখটা কুলকুচি করে নিয়ে ফের শুয়ে পড়লো গুলাবী। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মধুকর।

সন্ধ্যার পরে রঘুনাথ এলো। ভিতরে ঢুকে গামছায় মুখ হাত মুছে গুলাবীকে সে জিজ্ঞাসা করে— "মধু বললো, তোমার নাকি শরীর ভালো নয়? কি হয়েছে?" হাসলো গুলাবী। রহস্য করে বলে সে— "মেয়েমানুষের ঘরে বর বেশী এলে কি অসুখ মেয়েদের হয়— তা তুমি জানো না?"

খানিকটা সময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রঘু। ঠিক বুঝতে পারে না গুলাবী কি বলতে চাইছে। গুলাবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে— "গতমাস থেকে আমার শরীর খারাপ হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, এ মাসেও হয়নি।" এবার কিছুটা বুঝতে পারে রঘু। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে— "সত্যি বলছিস? মায়ের দিব্যি কেটে বল্?"

—"মায়ের নয়, তোমার দিব্যি কেটে বলছি, সত্যি, তোমার ছেলে আমার পেটে এসেছে; আমি জানি।"

হঠাৎ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রঘু। বলে, "তুই মা হবি? আমি বাপ? কথাটা বলি তাহলে সকলকে?" ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে গুলাবী— "না, না! এখন একদম না। আমাদের কি বিয়ে হয়েছে যে, এখন বলবে? বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর তো জানবেই সকলে।"

আসলে ভয় পাচ্ছে গুলাবী। চিরঞ্জিকাকার শরীরটা ঠিক হলে দুচার দিন সে এখানে আসা যাওয়ার পরে প্রথমে চিরঞ্জিকাকাকে সে জানাবে খবরটা। তাকে চুপি চুপি বলবে— "কাকা, তোমার বাচ্চা এসেছে আমার পেটে, এবার বিয়েটা হয়ে যাক। টাকা পয়সাও যাকে যা দেবার দিয়ে দাও।" সব পাওনাগণ্ডা পুরে গেলে নিশ্চিন্ত হবে গুলাবী। কিন্তু ওসব

BanglaBook.org

গল্প সে রঘুকে করেনি। রঘু জানেও না যে, গুলাবী চিরঞ্জিলাল চৌধুরীর সঙ্গে কি চুক্তি করে বসে আছে! বাচ্চা যখন জন্মাবে— তখন দেখা যাবে। চলে গেল রঘু। বললো—"পরে আবার আসবো। কত কিছু এখন করতে হবে। যাই আজ।"

গুনীন জগ্‌দীশ প্রসাদের বাড়ীর ভিতরটা যেন এক গোলোক ধাঁধা। চিরঞ্জিলাল আর দশরথ খুঁজতে চেষ্টা করছিল, কাউকে পাওয়া যায় কিনা। একটা ছোকরা এসে জিজ্ঞাসা করলো— "কাকে খুঁজছেন? জগ্‌দীশ দাদাকে? পুজোয় বসেছে দাদা। দাদিমা ও ঘরে আছে। দাদিমার সঙ্গে কথা বলুন। জগ্‌দীশ দাদার পুজো হয়ে গেলে দেখা করিয়ে দেবে দাদি।" ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। ঘরের ভিতর থেকে দাঁত ফোক্‌লা একটা বুড়ি বেরিয়ে এলো। খালি গা, সমস্ত বুক আর ঝুলে পড়া স্তনের কোল ঘেঁসে নীল নীল উল্কির নকসা। দুহাত জুড়েও তাই। পরণে নোংরা থান কাপড়। কানের বিরাট ফুটোয় বড় বড় রুপোর রিং। পান খাওয়া দাঁত, পাকা আতার বিচির মতো।

বুড়িটা বললো— "আপনারা বসুন। গুনীন পুজো করছে। বার হলে ওঘরে নিয়ে যাব।" দুজনে ভিতরে একটা পাটির ওপরে বসলো। কিছুক্ষণ পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বললো— "দাদার পুজো হয়ে গেছে। ওঁদের ওঘরে নিয়ে যাও, দাদী।" বুড়ি দুজনকে নিয়ে ভিতরের দিকে আরো একটা ঘরে নিয়ে গেল। এক গ্লাস ঘোলা ঘোলা জলের সরবৎ সে খেতে দিল দুজনকে। এ ঘরটা বেশ ছোটই, দরজা একটা, জানালাও একটা, মাটির ঘর। মাথায় খাপরার চাল। ভীষণ গরম ভিতরে। দেওয়ালে নানা ঠাকুর দেবতার পট, কাচ দিয়ে বাঁধানো। গুনীন ঠাকুর বসে আছে একটা কম্বলের আসনে। সামনে দুটো কাঠির আসন পেতে দিলো বুড়ি। দুজনে বসলো তাতে।

গুনীন ঠাকুরকে দেখে মনে হলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। শুঁকোর খোলের মতো গায়ের রং। তেলের অভাবে চামড়ায় খড়ি উঠছে। বুকের, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মাথায় কদম ফুলের মতো কদিনের ওঠা পাকা সাদা চুল। চোখ দুটো গোল গোল, লাল রঙের। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের কাছে। চিরঞ্জিদের দেখে মুখটা তুললো গুনীন।

গুনীনের সামনে কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে জিনিসগুলো বের করলো

BanglaBook.org

দশরথ। একটা বড় কলাপাতা এনে তার ওপর সেগুলো সাজিয়ে দিল বুড়িটা। ছোট ছেলেটা একটা রেড়ির তেলের জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ এনে কলাপাতাটার পাশে রাখলো। তারপর কিছু কথা না বলে বেরিয়ে গেল দুজনে। এখন ঘরের মধ্যে শুধু চিরঞ্জিলাল, দশরথ আর ঐ গুনীন্ বা জান্‌গুরু জগদীশ প্রসাদ মুর্মু।

ঘড়ঘড়ে গলায় জান্‌গুরু জিজ্ঞাসা করলো— "কার গণনা হবে?" চিরঞ্জিলালকে ইশারায় দেখিয়ে দিলো দশরথ। বুড়ো তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো চিরঞ্জির দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলো— "গোত্র কি? জন্ম কবে? বিয়ে করেছ? কাচ্চা বাচ্চা কজন?"

আস্তে আস্তে তার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো চিরঞ্জি। দুপাশে মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছিল বুড়ো। মাটির ওপর একটা খড়ি দিয়ে কি সব আঁক কাটলো লোকটা। তারপর বললো— "তোর তো সবগুলোই মেয়ে! তোর বংশ রাখবে কে? তুই কারো কাছ থেকে ছেলে নে, তোর নিজের ছেলে, অন্যের নয়। তবে তোর বংশ থাকবে।"

তার কথায় হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে চিরঞ্জিলাল। এসব গণনা, গুনীন, জান্‌গুরু আর তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রে তার বিশ্বাস কোনোদিনই নেই। কিন্তু আজ কেমন যেন দুর্বল লাগতে লাগলো তার নিজেকে। একটা অন্ধ বিশ্বাস যেন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। বদ্ধ ঐ গরম মাটির ঘরটার মাটির মেঝেতে কাঠির আসনে বসে থেকে তার মনে হতে লাগলো— জগৎ মিথ্যা। একমাত্র সত্য ঐ জান্‌গুরু আর মাটিতে বিচিত্র নক্সার ঐ খড়ির চিহ্নগুলোই। সারা শরীর তার ঝিমঝিম করছে। ঐ সরবতে কিছু ছিল কি? জানে না চিরঞ্জিলাল। কিন্তু তার মনে হতে লাগলো— অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসছে জান্‌গুরুর কণ্ঠস্বর। মাটির প্রদীপের আগুন জ্বলা সলতেটা যেন একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। চোখ দুটো মুছলো চিরঞ্জিলাল।

—"তোর শরীরের মরদানা চলে গেছে। আগে সেটা তোকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর তোকে বাচ্চা দেবে দ্বিতীয় বৌ। সে হবে জোয়ান মেয়ে। তোর বাচ্চাকে পেটে ধরবে সে।"

—"কিন্তু, ঐ যে বললেন... সেটা ফিরে পেতে কি করতে হবে? সেটা বলুন আপনি।" অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললো চিরঞ্জিলাল। কেমন অসহায় কণ্ঠস্বর তার।

BanglaBook.org

আবার কি সব আঁকজোক করলো বুড়ো গুনীন। তারপর বললো—"সে বড় শক্ত কাজ! পারবি?" আচ্ছন্নের মতো কণ্ঠে চিরঞ্জি বললো—"পারবো, আপনি বলুন, আমি সব পারবো।"

—"দুটো শীতের বেশী পার হয়নি, এমন বাচ্চা একটা মেয়েকে শিংবোঙার কাছে উৎসর্গ করতে হবে অমাবস্যার রাতে। সেই রক্ত তিষির তেলে মিশিয়ে লাগাতে হবে শরীরে। ঐ জায়গাটায়ও লাগাতে হবে। তবে তোর মরদানা ফিরবে, তবে তোর জোয়ান বৌ তোর বাচ্চাকে পেটে ধরতে পারবে।"

—"আমি পারবো, সব পারবো।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঐ একটা কথা বারবার বলতে থাকে চিরঞ্জিলাল। যেন তার শরীরে কোনো সাড় নেই। অন্য কেউ যেন তাকে এসব করাচ্ছে। হাঁ করে চেয়ে আছে দশরথ।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে দশরথের। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে দুজনের। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন ভয়ের আকারে বেয়ে বেয়ে নীচে নামছে দশরথের। সেই বুড়িটা এসে একটা ঘটিতে করে জল রেখে গেল। জান্‌গুরুর নির্দেশে দুজনে সেই জল থেকে কিছুটা খেলো ঢক ঢক করে। কিছুটা মুখে চোখে ঝাপটা দিয়ে তসরের চাদরটা দিয়ে মাথা মুখ মুছে নিল দুজনে। তারপর সেই ছোট ছেলেটা ওদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

দুজনের মুখে কোনো কথা নেই। যেন কি এক ভয়ানক দৈবাদেশ শ্রবণ করে ফিরছে ওরা। ওদের দেখতে পেয়ে এক্কা গাড়ীটাকে কাছে নিয়ে এলো লছমন। দুজনে পিছন দিকে উঠে বসলো। চলতে শুরু করলো গাড়ীটা। গরম হাওয়া কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ধুলো উঠছে ঘোড়ার খুরে খুরে। গা মাথা ভরে যাচ্ছে। ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে সেই ধুলো। আজ দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি কারো। কিন্তু সেসবে ভ্রূক্ষেপ নেই চিরঞ্জিলাল কিংবা দশরথের। মাথার মধ্যে ঘুরছে গুনীনের কণ্ঠস্বর। —"দুটো শীতের বেশী পার হয়নি এমন বাচ্চা একটা মেয়েকে উৎসর্গ করতে হবে শিংবোঙার কাছে, অমাবস্যার রাতে।"

শিংবোঙার থান কোথায়? জানে না দশরথ। কালীর সাধক সে। আচ্ছা, কালীর সামনে তো লোকে বলিদান দেয়? শিংবোঙার বদলে মা কালীর সামনে বলিদান দিলেও কি চলবে? কথাটা তো জিজ্ঞাসা করে আসা হলো না? যদি চলেও, তবে দুই শীত পার না হওয়া বাচ্চা মেয়ে

BanglaBook.org

কোথায় পাবে দশরথ?

গাড়ীটা ততক্ষণে ওদের পাড়ায় এসে গেছে। আর একটু এগোলেই দশরথদের বাড়ী। পাশের বাড়ীতে থাকে ফুলমোতিয়ারা। দশরথ দেখলো, ঐ ভরদুপুরে আমগাছের ছায়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে মা হারা বোনঝি তিত্‌লিকে নিয়ে খেলাচ্ছে ফুলমোতিয়া। বছর দুই বয়েস বোধহয় তিত্‌লির। সেদিকে একবার তাকিয়েই ভয়ে দুচোখ বুজলো দশরথ।

।। বিংশ পরিচ্ছেদ ।।

সারারাত দুই চোখ মেলে বিছানার ওপর একা শুয়ে আছে দশরথ। আজ সকালে কি এক সাংঘাতিক কথা সে শুনে এসেছে জান্‌গুরুর কাছ থেকে! টাকা..... নিরাপদ ভবিষ্যৎ, পরিবারের সকলের জন্য চিরস্থায়ী নিরাপত্তা— যার মধ্যে তার কন্যা গুলাবীও একজন। একদিকে এত কিছু, অন্যদিকে বিবেক বুদ্ধির বিসর্জন, নৃশংসতা— কোন্‌টাকে বেছে নেবে সে? মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে বাজছে টাকার আওয়াজ— বিবেকের দংশন তাকে সুস্থ থাকতে দিচ্ছে না। একবার সে ভাবে— গুলাবীর কাছে যাবে কাল সকালেই। সব তাকে খুলে বলবে। গুলাবী রাজী হয়েছে চিরঞ্জিলালের শর্তে। কিন্তু সে শর্তের পিছনে যে এতবড় একটা অন্যায় জড়িয়ে রয়েছে— তা সে খুলে বলবে গুলাবীকে। এতে গুলাবী যদি পিছিয়ে আসে তো মঙ্গল।

সারারাত ঘুম হয়নি দশরথের। ভোর ভোর বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়েছে। ঘরের মধ্যে তখনো গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার জমা হয়ে আছে আসবাবপত্রের আনাচে-কানাচে। মশারীর একটা পাশ প্রায় গায়ে জড়িয়ে আছে জান্‌কীর। রামুকে নিয়ে এখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। রামুর দিকে একবার দৃষ্টি পড়লো দশরথের। রামু সবে দুটো শীত পার করে তৃতীয় গ্রীষ্মে পা রেখেছে। কিন্তু তিত্‌লি তো এখনো দুটো শীত অতিক্রম করেনি। দশরথ নিজেও তো পিতা। তিত্‌লির বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কোথাও তো সে আছে..... কোনো জায়গায়? মাথার মধ্যেটা আবার কেমন যেন করতে থাকে দশরথের।

ঘরের মধ্যে দশরথের নড়াচড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে জান্‌কীর।

BanglaBook.org

বিরক্ত মুখে ভ্রূদুটো কুঁচকে সে জিজ্ঞাসা করে— "সারা রাত নিজে ঘুমোওনি— আমাকেও ঘুমোতে দাওনি। সকালটায় যে চোখদুটো একটু বুজবো— সে উপায় আছে? এই সাত সকালে তোমার কি এত রাজকার্য আছে যে, উঠে ঘুর ঘুর করছো? যত সব আপদ আমার।" দুবার বিশাল হাঁ করে হাই তুললো জান্‌কী।

কোনো জবাব দিল না দশরথ। দড়ির ওপরে রাখা নামাবলীটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। উঠোনের নিকোনো শক্ত মাটির ওপর তার খড়মের আওয়াজ পেয়ে জান্‌কী বুঝতে পারলো— বাইরে কোথাও যাচ্ছে দশরথ। বাচ্চাটার গায়ে একবার ডান হাতটা রেখে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো জান্‌কী।

আজ পুজোটা কোনো রকমে সারলো দশরথ। প্রথমে সে যাবে গুলাবীর কাছে। সব বলবে। গুলাবীর 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার ওপরে নির্ভর করছে দশরথের ন্যায় আর অন্যায়ের সাথে লড়াইয়ের পরিণতি। নির্ভর করছে নশংসতা আর ভবিষ্যতের নিরাপদ জীবনের অসম প্রতিযোগিতার ফলাফল। যজমানদের বাড়ীতে যেতে হয়তো আজ দেরী হয়ে যাবে তার। কিন্তু প্রথমেই তার যাবার দরকার মেয়ের কাছে। তার হাতের পুজো পাবার জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা করতে পারবেন অনন্তকাল— কিন্তু তার নিজের বিবেকের পক্ষে আর এক মুহূর্তকালের জন্যেও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে দশরথ।

গুলাবীর বাড়ীতে যখন দশরথ গিয়ে পৌঁছেছে তখন তার শরীর ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। নামাবলীটা দিয়ে মুখটা মুছে হাঁফাতে হাঁফাতে দশরথ ধপ্ করে বসে পড়লো গুলাবীর বিছানার ওপর। কলসী থেকে এক গ্লাস জল তাকে দিল গুলাবী। আলনা থেকে গামছাটা নিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে বাবার হাতে দিয়ে সে বলে— "গামছাটা দিয়ে মুখখানা মুছে নাও, বাবা। যা গরম পড়েছে! এত বেলায় এরকম গরমে কেউ আসে? রাতের দিকেই তো এলে পারতে, বাবা।" মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দশরথ। কোনো কথা সে বলতে পারে না কিছুক্ষণ। শুধু চোখ দিয়ে বয়ে যায় অঝোর জলের ধারা। মেয়ের মাথার ওপরে সে একটা হাত রেখে নীরবে বসে থাকে।

—"কি হয়েছে, বাবা? কোনো খারাপ খবর? বাড়ীতে সকলে ভাল আছে তো?" ব্যস্ত প্রশ্ন গুলাবীর। এবার অস্ফুটে কথা বলে দশরথ।

BanglaBook.org

—"কিছু না-রে গুলাবী, তোর জন্য হঠাৎ মনটা কেমন করলো— তাই চলে এলাম। কিছু হয়নি, তুই ভাবিস না।"

সত্যি কথাটা বলতে পারলো না দশরথ। বিবেক আর অর্থলোভের মধ্যে কোন্‌টা যে জয়লাভ করবে— তা বুঝে গেছে দশরথ। তবে, এসব কথা বলার বোধহয় দরকার নেই গুলাবীকে। এমন কি, রঘুকেও নয়, শুধু সে নিজে আর ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরী এ কথা জানলেই হবে। আর কেউ নয়।

উঠে পড়ে দশরথ। বলে— "যজমান বাড়ী যাওয়া হয়নি এখনো। সেখানে ঠাকুর উপোসী রয়েছেন। আজ যাই রে গুলাবী, পরে আবার আসবো।" গুলাবী বাবার হাতে দশটা টাকা দিয়ে দিল। ধুতির ট্যাঁকে নোটটা জড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল দশরথ। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালো সে। আকাশে আগুন ঝরছে। স্নিগ্ধ ভোরের যে আকাশটা মাথায় নিয়ে সে বার হয়েছিল ঘর থেকে— সে আকাশটাকে যেন ঝলসে দিচ্ছে তপ্ত সূর্য। পথে পা বাড়ালো দশরথ।

রাত্রে একবার 'চৌধুরী হাভেলি'তে যেতে হবে। গতকালের ঘটনার পরে চিরঞ্জি নিজে কি স্থির করলো— তা জানা হয়নি। জান্‌গুরুর নির্দেশ, চিরঞ্জির সুস্থতা, গুলাবীর মাতৃত্ব— সবকিছুর ওপর নির্ভর করছে তার এবং দশরথের পরিবারের সুখ, শান্তি, স্বস্তি। রোদের তাপ কমে গেলে সন্ধ্যার মুখে 'চৌধুরী হাভেলি'র ফটকে এসে পৌঁছালো দশরথ।

চিরঞ্জিকাকার সঙ্গে সেদিন বিছানায় শুয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল— তাতে শঙ্কিত হয়েছে গুলাবী। মুখে সে যতই চিরঞ্জিকে আশ্বাস দিক না কেন, চিরঞ্জিকাকা আবার তার আগেকার শক্তি ফিরে পাবে কিনা— সে সন্দেহ থেকেই গেছে গুলাবীর। যদি ফিরে না পায় তবে তার এবং রঘুর জীবনের সব স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে। চিরঞ্জিকাকা গুলাবীর গর্ভের সন্তানকে তার নিজের বলে মনে করতে পারবে না, কারণ, সন্তানকে জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা যে তার আর নেই— এই সত্যটা চিরঞ্জিকাকার জানা হয়ে যাবে। গুলাবীর গর্ভে রঘুর যে সন্তান এখন রয়েছে— সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে চিরঞ্জি বুঝে যাবে সে সন্তান তার নয়, অন্য কারো। আর, যদি এর মধ্যে চিরঞ্জি তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরে পায়ও, তবে এই সন্তানকেই তার বলে চালিয়ে দেবে গুলাবী। সমস্যা যেটা থেকে যাবে, তা হলো

BanglaBook.org

রঘু সেই সন্তানকে চিরঞ্জির হাতে তুলে দিতে রাজী হবে কিনা। সেই ব্যর্থ চেষ্টাটাকেই আপ্রাণ করতে হবে গুলাবীকে। আর নইলে একটাই রাস্তা আছে— সমস্ত প্রাপ্য টাকা পাওয়া হয়ে গেলে গুলাবী আর রঘু নিজেদের সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে কোথাও, যেখানে তাদের নাগাল কখনো পাবে না চিরঞ্জিলাল চৌধুরী।

কিন্তু এত কথা রঘুকে বলতে গেলে গুলাবীকে আরো অনেক পূর্ব কথা বলতে হবে। জানাতে হবে, চিরঞ্জির সাথে তার শর্তের কথা— যে শর্তের একটা অংশে অবশ্যম্ভাবী ভাবে থেকে যাবে চিরঞ্জিলালের সন্তান তার নিজের গর্ভে ধারণ করার জন্য গুলাবীর সাথে চিরঞ্জির দেহজ সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা। রঘুনাথ এমন অর্থপিশাচ নয় যে, স্ত্রীর এই ভ্রষ্টাচার সে কিছু রজতমুদ্রার বিনিময়ে মেনে নেবে। তাহলে একমাত্র রাস্তা থেকে যায় — চিরঞ্জির সুস্থতা ফিরে আসা, গুলাবীর সাথে তার সফল দেহজ সম্পর্ক স্থাপন, আপন গর্ভের সন্তান সম্পর্কে চিরঞ্জির কাছে গুলাবীর মিথ্যা ভাষণ, সমস্ত অর্থ করায়ত্ত করে গুলাবী এবং রঘুর অন্যত্র পলায়ন।

এতসব পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ক্লান্তি এসে যাচ্ছিল গুলাবীর। এত ঘটনার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলো 'যদি' এসে দাঁড়াবে। সব 'যদি'-র সুষ্ঠু সমাধান হবে কিনা — তা সে নিজেও জানে না।

সন্ধ্যায় রঘু এলো। গুলাবীকে একা একা অন্ধকারে শুয়ে থাকতে দেখে শুধালো — "শরীরটা কি আবার তোর বেযুত, গোলাপ? লোকে বলে, এ সময়ে এমনটাই হয়। তবে, অন্য কিছু খারাপ নয়তো? খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক করছিস্?" বিছানার এক পাশে বসলো রঘু। উঠে বসলো গুলাবী। বললো — "তুমি তো বলোনি আজ আসবে বলে? যাক, এসে গেছ, খুব ভালো হয়েছে। কাল থেকে একটা কথা মাথায় ঘুরছে। তোমাকে বলবো বলবো বলে মন করছিল।" রঘুর গলার তাবিজটা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে রঘুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে সে। রঘু ডান হাত দিয়ে ওকে নিজের কাছে আরো ঘন করে টেনে নেয়। তারপর বলে — "কথা একটা কেন, তোর হাজারটা কথা আমি শুনবো। আমার বাচ্চার তুই 'মা' বলে কথা। বল্, কি বলবি?"

— "হ্যাঁ গো, আমরা যদি এখানে আর না থাকি? যদি চিরঞ্জিকাকার টাকা নিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই ..... অনেক দূরে, কোনো অজানা জায়গায়? আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ গুলাবীর।

— "তাই তো কথা আছে। কাকা তো বলেছে যে, পূর্ণিয়ায় গ্যারেজ

BanglaBook.org

বানিয়ে দেবে। সেটা তো দূরেই হলো।" হেসে জবাব দেয় রঘু।

— "না গো, পূর্ণিয়া নয়, মনে করো আরো .... আরো .... কোনো দূর জায়গায় —যেখানকার খবর চিরঞ্জিকাকা জানে না, জানবে না?"

— "কিন্তু এসব তুই কি বলছিস, গোলাপ? যে টাকা দিয়ে আমাদের এত বড় উপকার করে দিচ্ছে— তাকে না জানিয়ে, না বলে আমরা নিজের মতো অন্য কোথাও গিয়ে বাস করবো— তা হয় নাকি? না, হওয়া উচিৎ?" গুলাবীর সমস্ত দুশ্চিন্তা আর উদ্ভট পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল রঘুনাথ।

— "তুমি বুঝছো না, চিরঞ্জিকাকা তোমায় কখনো ভাল চোখে দেখেনি, দেখবে না। তার আজকের এই পরিবর্তনকে আমার ভালো ঠেকছে না। আমার দিকে তার কুনজর আছে। আমরা অন্য কোথাও চলে গেলে সে ইচ্ছা থাকলেও তোমার আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার বাচ্চার কোনো ক্ষতি হতে আমি দেবো না। হ্যাঁ গো, চলো না, আমরা অন্য কোথাও বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই।" প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে গুলাবী। তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে রঘু বলে — "তুই এখনই এসব কেন ভাবছিস? তেমন ভয়ের মতো কিছু দেখলে আমিই কি তোকে তার নাগালের মধ্যে রেখে দেবো? সেসব তখন দেখা যাবে। এখন ওসব তোকে ভাবতে হবে না।"

উঠে পড়ে রঘু। বলে — "আজ আর দেরী করবো না রে, গোলাপ। গ্যারেজটার ব্যাপারে কিভাবে কি করবো — তার একটা ভাবনা চিন্তা করতে হবে। এ ব্যাপারে বিষ্ণুকাকা আমায় বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করবে বলেছে। আমি চলে যাব জেনেও কিন্তু আমার জন্য মানুষটার ভালবাসা কমেনি! এই হলো মানুষ!"

— "আচ্ছা, যদি গ্যারজ না-ই হয়? যদি ঐ বাবদ সমস্ত টাকা আমাদের আগেই দিয়ে দেয় কাকা? তখন তো আমরা ভেবেচিন্তে আরো অন্য কিছুও একটা বের করতে পারি?" আশঙ্কিত কণ্ঠ গুলাবীর। "গ্যারেজই যে করতে হবে, তার কি মানে? এ গাঁয়ে যে জমি কাকা আমার নামে কিনে দিতে চায় — সে জমি না কিনে সমস্ত টাকা নগদে চাইলে দেবে না চিরঞ্জিকাকা? তোমার কি মনে হয় গো?"

গুলাবীর আচরণ, তার আশঙ্কা, তার নতুন প্রস্তাব — সব কিছু যেন বড় অদ্ভুত মনে হতে থাকে রঘুনাথের। তার কেবলই মনে হতে থাকে — গুলাবী যেন এই জীবন, এই গ্রাম, এই চিরঞ্জিকাকা — সব কিছু থেকে কোথাও

BanglaBook.org

পালিয়ে যেতে চাইছে! কিসের এত ভয় তার? যে স্বামী আর যে সন্তানকে নিয়ে সে দূরে কোথাও সরে যেতে এত ব্যগ্র — সেই স্বামী তো এখনো তার বৈধ স্বামী হয়নি, যদিও গর্ভে তার যে সন্তান, সে তার ঐ 'এখনো-না-হওয়া' স্বামীরই।

গুলাবীর পিঠে আলতো করে দুটো চাপড় মেরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায় রঘু। বলে— " তুই বড় ভীতু রে, গোলাপ। জানি না তোর এত ভয় কেন, বা কাকে?"

— "আমার বাচ্চাকে আমি কাউকে দেবো না। ও শুধু আমার, আমাদের।"

— "আমাকেও দিবি না?" আবার হা হা করে হাসতে থাকে রঘুনাথ। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে গুলাবী— " না না, কাউকে না, কাউকে নয় গো! এসব কথা তুমি আমাকে আর বোলো না।"

হাসি বন্ধ করে এবার বলে রঘু — "ওসব এখন থাক রে, গোলাপ। সময়ে সব দেখা যাবে। আমি এখন চলি।"

বেরিয়ে গেল রঘু। বাইরের দরজায় মাথার ওপর এক আকাশ তারা নিয়ে নিকষ কালো আকাশটা অন্ধকারের মধ্যে যেন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল এক ভাবী জননীর মুখের দিকে! রঘু অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুয়ার থেকে একটুও নড়লো না গুলাবী।

দশরথ যে আজই আসবে— তেমন কোনো কথা ছিল না চিরিঞ্জিলালের সঙ্গে। তাই চিরঞ্জি আজ সন্ধ্যায় তাকে আশা করেনি। কিন্তু সে আজ বাড়ী থেকে বাইরে কোথাও যায়নি বলে দেখা হয়ে গেল দশরথের সঙ্গে।

— "এসো, এসো! কাল যা ধকল গেল ! এখনো তার জের চলছে। তুমি ঠিকঠাক আছ তো?" বললো চিরঞ্জিলাল।

— "আজ্ঞে, আমার আর বেঠিকের আছেটা কি ! চিন্তা শুধু আপনারই জন্যে। তাই দেখতে চলে এলাম।" বললো দশরথ।

— "আচ্ছা, জান্‌গুরুর কথাগুলো তোমার মনে আছে, দশরথ? কি সব ভয়ানক কথা লোকটা বলে গেল! এসব কি হয় নাকি?" প্রশ্নটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল চিরঞ্জিলাল।

— "আজ্ঞে, হয় বলেই তো জানি। সেইসব কথাই তো বলবো বলে চলে এলাম।" কেমন একটা চাপা স্বর দশরথের কণ্ঠে।

BanglaBook.org

— "তার মানে, ঐ যে একটা বাচ্চা মেয়েকে ..... সে কি করে সম্ভব হয়? তেমন বাচ্চাকে পাবেই বা কোথায়? একি পাঁঠার বাচ্চা যে, বাজার থেকে কিনে আনলাম।" হাসলো চিরঞ্জি। অবিশ্বাসের।

— "দরজাটা বন্ধ করে দিই, কর্তা। এসব বড় সাংঘাতিক কথা। দেওয়ালেরও নাকি কান আছে — লোকে বলে।" উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলো দশরথ। মশার জন্য জানালাগুলো আগে থেকেই বন্ধ ছিল।

— "ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার তো নিজের কাজ হয়ে যাওয়া নিয়ে কথা? বাকিটা আমি দেখবো।"

— "কিন্তু শিংবোঙা না কি একটা ঠাকুরের নাম বললো জান্‌গুরু? তার থান কোথায়? থান কোথাও থাকলেও সে তো সাঁওতালদের গাঁয়েই কোথাও হবে। চেনা জানা জায়গায় লোকজনের মধ্যে এমন কাণ্ড করা .....।" থেমে যায় চিরঞ্জিলাল।

— "আমি আবার যাবো। জান্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করে আসবো — কালীমায়ের সামনে তো আমরা ইষ্টসাধনে বলিদান দিই। সেখানে কি দেওয়া যাবে না? তাছাড়া, কালীমন্দিরটা একেবারে নির্জন জায়গায়। জনপ্রাণী টেরও পাবে না।"

— "সত্যিকার কাজ হবে বলে তোমার মনে হয়, দশরথ? ধরো, যদি এত করেও কিছু কাজ হলো না, অথচ এতবড় একটা পাপের কাজ হয়ে গেল? তখন?"

এমন আশঙ্কা যে দশরথেরও নেই, তা নয়। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে নিরাপদ ভবিষ্যৎ জীবন আর কন্যার সুখ সমৃদ্ধি বোধহয় সমস্ত বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সে বারবার জোর দিয়ে বলতে থাকে — "জান্‌গুরুর বিধান মিথ্যে হয় না. কর্তা। ওরা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, জানতে পায়। তাই তো ওরা জান্‌গুরু। ওদের কথা মিথ্যা হয় না। আপনি দেখবেন!"

বার বাড়ীর ঐ ঘরখানায় যেন একই সাথে বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়াতে থাকে বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অন্ধ কুসংস্কার, সন্দেহ, আতঙ্ক, লোভ — অক্ষম বিবেক বুদ্ধির সাথে এ এক আশ্চর্য অসম সহাবস্থান যেন! মুখে আর কোনো কথা আসে না চিরঞ্জিলাল ঠাকুরের। একা-ই যেন কথা বলে যাচ্ছে দশরথ। সেদিন জান্‌গুরুর ঘরে ঘোলাটে রঙের যে সরবৎটা তখনকার মতো চিরঞ্জির বিশ্বাসকে অবশ করে দিয়েছিল — আজ সন্ধ্যায় বার বাড়ীর বাতাস যেন আবার তা-ই করে দিচ্ছে চিরঞ্জিকে।

BanglaBook.org

এতক্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাবে সে বলে — "তুমিই যা করার করো। শুধু, কবে হবে তা জানিও আমাকে। আমায় যা করতে হবে — তখন বলে দিও। আজ আমি বড় ক্লান্ত, দশরথ। আজ তুমি যাও।"

— "আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী। তিন দিন বাদে অমাবস্যা। ভালো দিন। ঐ রাতেই ....."

— "তুমি যাও, দশরথ। বললাম তো, সময় হলে আমায় জানিও। মাথাটার মধ্যে কেমন যেন লাগছে আমার, আমায় একটু একা থাকতে দাও।"

চিরঞ্জির দিকে একবার চেয়ে রইল দশরথ। তারপর ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

।। একবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

নিজের অক্ষমতার কথা সাবিত্রীকে বলতে পারেনি চিরঞ্জিলাল। সাবিত্রী শুধু জেনেছিল, অনেক টাকার বিনিময়ে গুলাবী স্বীকার হয়েছে চিরঞ্জির সন্তানকে ধারণ করতে। পুত্রের কামনায় চিরঞ্জি মানসিক করেছে কালীমায়ের কাছে। সংকল্প পূর্ণতা পেলে দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেবে সে। বাকিটা সাবিত্রী জানে না। কিন্তু বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। তবু, যা সে দিতে পারেনি তার স্বামীকে, তা আর একজন দিতে স্বীকার হয়েছে— তার স্বামীর বংশ রক্ষা হবে, তাদের উভয়ের অন্তিম কাজ করার সেই অনাগত পুত্র সন্তান— স্বর্গবাসের মধ্যে দিয়ে এই জীবনের চিরমুক্তি ঘটবে দুজনের। তাই আশায় ভাঙা বুক নিয়ে প্রাণটাকে বড় কষ্টে ধরে রেখেছে সাবিত্রী।

এই রকমই জেনেছে গুলাবীও। চিরঞ্জির মানসিকের কথা সেও শুনেছে। পুত্রের কামনায় দেবীকে অমাবস্যায় পূজা দেবে চিরঞ্জিলাল— বলিদানে সন্তুষ্ট করবে সে দেবীকে। তার অসংযত যৌবনের সাজা স্বরূপ যে সক্ষমতাকে সে হারিয়েছে— তা ফিরে পাবে দেবীর প্রসাদে। শুধু মাঝের একটা ঝড় গুলাবীর জীবনের খাতার কয়েকটা পৃষ্ঠাকে ওলোট পালোট করে দিতে ধেয়ে আসবে তার জীবনের আকাশ জুড়ে!

জীবনের এই বিচিত্র নাটকের প্রধান সঞ্চালক দশরথ একা-ই। তারই ওপর এতগুলো মানুষের ভালো মন্দ, সুখ স্বস্তি, শান্তি সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে সে বড়বেড়িয়া গ্রাম থেকে ঘুরে এসেছে আরো একবার। জান্‌গুরু

BanglaBook.org

সম্মতি দিয়েছে— কালীমায়ের সামনে বলিদান দিলেও সংকল্প সিদ্ধ হবে। সে কথা জানাবার জন্যে আজ দুপুরে 'চৌধুরী হাভেলি'তে একবার এসেছিল দশরথ। মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে সবেমাত্র বড় দুই খিলি জর্দা পান মুখে দিয়ে শোবার প্রস্তুতি করছিল চিরঞ্জিলাল। এমন সময়ে ভৃত্য এসে সংবাদ দিল— "ঠাকুর মশাই এসেছেন। খুব দরকার, যদি একবার দেখা করা সম্ভব হয়। বার বাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

মোটা এক জোড়া ভ্রূ বিরক্তিতে একবার কুঞ্চিত করলো চিরঞ্জি। তারপর সাবিত্রীকে বললো— "দেখে আসি, কি বলতে এসেছে। আগামী পরশু অমাবস্যা। রাত্রে পুজো হবে মন্দিরে। ব্যবস্থা **সব ওকেই** করতে বলেছি টাকা পয়সা যা দেবার দেওয়া আছে। এখন **আবার কি বলতে** চায় কে জানে। তুই থাক, আমি দেখছি!" উঠলো চিরঞ্জিলাল।

—"পুজোতে আমাকে লাগবে না? **আমি তোমার ধর্মপত্নী**, স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কি স্বামীর পুজো হয়?" প্রশ্ন করলো **সাবিত্রী**।

— "না, না! মাঝ রাত্রে পুজো। ওখানে ঐ মন্দিরে তুই কোথায় যাবি! ভোরের আগে প্রসাদ নিয়ে ফিরে আসবো আমরা। তোর যাবার দরকার নেই।" ঘরে বাইরে পা বাড়ালো চিরঞ্জিলাল।

বার বাড়ীর ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করছিল দশরথ। চিরঞ্জিকে ঢুকতে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালো সে। হাতের ইশারায় চিরঞ্জি তাকে ফরাসের ওপর বসতে বললো। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো অনুচ্চ কণ্ঠে— "আবার কি হলো? বড়বেড়িয়ায় জান্‌গুরুকে সব বলেছ? এখানে কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

— "না, না! তবে, আপনি যেন কর্ত্রী মাকে ভুল করেও মন্দিরে যাবার জন্যে বলবেন না। কথাটা আপনাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে আসতে হলো। কথা হয়ে গেছে। এখানেই সব হবে।"

— "কিন্তু ঐ ব্যাপারটা? কাউকে জোগাড় করতে পেরেছ?" ইঙ্গিতে বলিদানের কথাটা দশরথকে বোঝাতে চাইল চিরঞ্জি।

—"ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন, কর্তা। যজমান বাড়ীর সূত্রে অনেক গাঁয়ে আমার যাতায়াত। ব্যবস্থা করে নিতে অসুবিধা হবে না। পুজোর জায়গায় শুধু থাকতে হবে গুলাবীকে। উৎসর্গ হবে তো আপনার জোর গুলাবীর নামে। আপনাকেও থাকতে হবে।"

—"কিন্তু গুলাবী কি রাজী হবে? তাকে তো এসব কথা আগে কিছু বলা

BanglaBook.org

হয়নি।" প্রশ্ন করে চিরঞ্জি।

ঠোঁটের কোলে, চোখের কোণে একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় দশরথের। সে বলে— "কর্তা আমায় হাসালেন এবার! গুলাবী মেয়েমানুষ, এতটা সহ্য করা কোনো মেয়ের পক্ষে কি সম্ভব? আগে তার কিছু জানার দরকার নেই। শেষ মুহূর্তে যখন সে জানবে— তখন তার আর প্রতিবাদ করার মতো শক্তি থাকবে না। জান্‌গুরু আমাকে সেই ওষুধটা দিয়েছে— যেটা বেটে সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে সেদিন খাইয়েছিল।" নিজের পরিকল্পনায় আত্মতৃপ্ত দশরথ জবাব দিল।

আর কোনো কথা বললো না চিরঞ্জি। —"তাহলে পরশু রাতে আপনি প্রথম প্রহরে মন্দিরে চলে আসবেন। আমরা ওখানে হাজির থাকবো ঠিক সময়ে। কেমন?"

মোহাবিষ্টের মতো মাথা হেলিয়ে ইশারায় সম্মতি জানালো চিরঞ্জিলাল। খড়মটা পায়ে গলিয়ে ভেজানো দরজাটা নিজের হাতে আস্তে খুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দশরথ। কিছুক্ষণ একা ঘরের মাঝখানে নিশ্চলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে অন্দরের দিকে পা বাড়ালো চিরঞ্জিলাল।

সন্ধ্যার পর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তিত্‌লিকে। ঘুমন্ত মেয়েটাকে ঘরে শুইয়ে রেখে পুকুরের দিকে শুধু একবার গিয়েছিল ফুলমোতিয়া। ঘরের দরজা বন্ধ করার কোনো প্রশ্ন ছিল না। পাশের ঘরে শুয়ে ছিল শনিচারী। দুই ঘরের মধ্যেকার দরজাটা আলতো করে ভেজানো ছিল। পুকুর ঘাট থেকে ঘরে ফিরে এসে ফুলমোতিয়া দেখলো বিছানায় নেই তিত্‌লি। প্রথমটায় সে মনে করেছিল— একা ঘরে ভয় পেয়ে তিত্‌লি হয়তো কেঁদেছিল; মা শনিচারী বোধহয় তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। অথচ ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে বছর দুই বয়সের ঘুমন্ত মেয়েটা।

পাগলের মতো হয়ে গেছে ফুলমোতিয়া। লণ্ঠনটা নিয়ে ঘর দুয়ার, উঠোন, বাড়ীর আশপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে তিত্‌লিকে। না, কোথাও নেই বাচ্চাটা। শনিচারীও উঠে পড়েছে। ফুলমোতিয়া উন্মাদের মতো ছুটে এসেছে দশরথের বাড়ীতে। তার কান্না আর চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে জান্‌কী আর শাম্‌লি।

দশরথ ঘরে নেই। একটু আগেই সে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। আজ রাতে মন্দিরে কালীমায়ের পুজো আছে। বাবাকে সাহায্য করবে গুলাবী।

BanglaBook.org

দশরথ চলে গেছে আগে। একটু দেরীতে সে যেতে বলে গেছে গুলাবীকে। গুলাবী তখন একাই যাবে। এখন সে ঘরে নেই। ফুলমোতিয়া শাম্‌লিকে সঙ্গে নিয়ে যতদূর যাওয়া সম্ভব হয়— অন্ধকারে ঘুরে এলো। নাঃ, কোথাও নেই তিত্‌লি। জলের মধ্যে পড়ে যাওয়া প্রস্তরখণ্ডের মতো অন্ধকারের সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেছে তিত্‌লি। ফুলমোতিয়ার বুক ভাঙা হাহাকার আর কান্না অমানিশার অন্ধকারকে যেন খান খান করে দিচ্ছে। মা নেই তিত্‌লির। বাপটা থেকেও নেই। কিন্তু কোনোদিন যদি লোকটা ফিরে এসে মেয়েকে দাবী করে— তখন কি জবাব তাকে দেবে ফুলমোতিয়া?

এই দিকটায় শুধু দুটিই মাত্র বাড়ী। একটা দশরথের, অন্যটা ফুলমোতিয়াদের। আর যেসব বাড়ী— সেগুলো কিছুটা দূরে দূরে, দশরথের ধানী জমি পার হয়ে বেশ খানিকটা দক্ষিণে। সুতরাং ঘুমন্ত তিত্‌লির পক্ষে কারো বাড়ী চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, রাতও এখন এমন হয়নি যে, শেয়াল কিংবা অন্য কোনো জানোয়ার মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ কান্নার পরে ফুলমোতিয়া বুঝতে পেরেছে তিত্‌লিকে আর বোধহয় পাওয়া যাবে না। ঘরের দাওয়ায় বসে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে সে। ভিতরে আধো অন্ধকারে শয্যা নিয়েছে শনিচারী। অসুস্থ শরীরে আর কাঁদবার শক্তিও বোধহয় তার নেই।

অন্ধকারে তারার আলোয় পথ দেখে দেখে হাঁটছিল গুলাবী। মন্দিরে যাবার রাস্তা তার অজানা নয়। কিন্তু রাতে সে এমন করে একা কখনো আগে যায়নি। কার্ত্তিক মাসে শ্যামা পূজার সময়ে আরো লোক আসে এদিকে। তখন কারোই আর একা মনে হয় না নিজেকে। কিন্তু আজ গুলাবী একা-ই হাঁটছে। সে জানে বাবা আর চিরঞ্জিকাকা আগেই মন্দিরে পৌঁছে সেখানে থাকবে। এখন কটা বাজে জানে না গুলাবী। আসবার আগে সকালে সে রঘুকে বলে এসেছিল পুজোর কথা। কিন্তু বলেনি তাকে রাত্রে এভাবে একা যেতে হবে। তাহলে রঘু হয়তো তাকে একা ছাড়তো না। রঘু জানে তার আর গুলাবীর সন্তানের মঙ্গল কামনায় সে আর তার বাবা দুজনে মন্দিরে পুজো দেবে। এখনো তাদের বিয়ে হয়নি। রঘু তাই গুলাবীর অনাগত সন্তানের জন্য বেশী কৌতূহল দেখাতে চায় না।

কোনো রকমে পথ চিনে চিনে হাঁটছে গুলাবী। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। এদিকে আর বসতি নেই। কৌশী নদীটা সরে গিয়ে শুধু একটা আধমজা খাল বা খাঁড়ির মতো হয়ে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

খাঁড়িটার দু'পাশে ঘন হয়েছে শাল, সেগুন আর মহুয়ার আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো। নীচে কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার ভেঙে চাঁদ উঠলে গাছগুলোর নীচে মাটির ওপর কাটা কাটা ম্রিয়মান আলোর টুকরো দেখা যায়। আজ অমাবস্যা। চাঁদ উঠবে না। অন্ধকারও তাই তরল হবে না আজ রাত্রে। পাশ দিয়ে দ্রুত কি যেন একটা জানোয়ার ছুটে চলে গেল। শুকনো ঝরা মহুয়ার পাতার ওপরে জেগে উঠলো খস্ খস্ একটা শব্দ। একটু পরে তা-ও শেষ।

দূর থেকে গুলাবীর মনে হলো, মন্দিরের দেওয়ালের ভাঙা ফাটলের ফাঁক দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা যেন দেখা যাচ্ছে। বোধহয় বাবা আর চিরঞ্জিকাকা এসে গেছে। একটু দ্রুত পা চালালো গুলাবী। লোক এসে গেছে জেনে ভয়ের রেশটাও যেন মন থেকে কেটে গেছে তার। আর একটুখানি গেলেই মন্দির। দূর থেকে মন্দিরটাকে একটা স্তূপীকৃত জমাট অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে গুলাবীর। বাবা আছে, আর ভয় করছে না তার।

নতুন একটা শাড়ী পরেছে গুলাবী। রওনা হবার আগে একবার চান করে নিয়েছে। বেশ একটা পবিত্র ভাব জাগছে ওর মনে। দেবী সন্তুষ্ট হবেন ওর ওপর? দেবেন সুস্থ, সুন্দর একটি সন্তান? মনের মধ্যে উথাল পাথাল চিন্তা গুলাবীর।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলো গুলাবী। সে ঠিকই বুঝেছিল। বাবা আর চিরঞ্জিকাকা আগেই এসে গেছে। চিরঞ্জিকাকার পরণেও একটা নতুন কোরা মিলের ধুতি। খালি গায়ে একটা উড়ুনি। বাবা দশরথের পরণে তসরের সেই ধুতিটা। গায়ে গুলাবীর পরিচিত সেই পুরানো নামাবলীটা নয়, আনকোরা নতুন একটা নামাবলী। সেদিকে একবার চেয়ে দেখলো গুলাবী।

দেবীর সামনে পুজোর উপাচার। দশরথ নিজের হাতে কলাপাতায় সাজাচ্ছিল। দুয়ারের দক্ষিণ পাশে হাড়িকাঠটায় সদ্য তেল সিঁদুর লেপা হয়েছে। কিন্তু বলির জন্য কোনো পশু তার চোখে পড়লো না। হয়তো যে দেবে— সে এখনো নিয়ে আসেনি। পুজো শেষ হবার আগে এসে গেলেই হবে। বড় একটা পিলসুজের ওপর খুব বড় একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। দেবীর গলায় তাজা রক্তজবার মোটা মালা। অন্ধকার আর আলোয় মাখামাখি একটা দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে দেবীর মুকুটে। লেলিহান রক্তবর্ণ জিহ্বাকে সেই অস্পষ্ট আলোতে যেন ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছিল গুলাবীর। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সে। তারপর কোনো কথা না বলে বাবার সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে কাজে হাত লাগালো গুলাবী। চিরঞ্জিলাল তার সঙ্গে কোনো কথা বললো না।

BanglaBook.org

মন্দিরের সংলগ্ন ছোট আরো একটা প্রকোষ্ঠ আছে। সেখানে দরজার মুখে একটা প্রদীপ জ্বলছে। সামনের আলো অতিক্রম করে গুলাবীর দৃষ্টি ভিতরে যেতে পারলো না।

হাতের কাজ শেষ করে দশরথ একবার ঐ ছোট ঘরটায় ঢুকলো। তারপর একটা মাটির কলসি বের করে এনে সামনে রাখলো গুলাবীর। গুলাবীকে ডেকে সে বললো— "মায়ের পুজোর আগে এটা খেয়ে নে। কারণবারি পান করতে হয় মায়ের পুজোর সময়।" ছোট দুটো মাটির ভাঁড় নিয়ে এলো দশরথ। চিরঞ্জি আর গুলাবীর জন্যে ঐ তরল বস্তুটা ঢেলে দিল দুটি পাত্রে। ভাঁড়টা তুলে এক নিঃশ্বাসে মুখে ঢেলে দিল চিরঞ্জিলাল। আস্তে আস্তে ভাঁড়টা হাতে তুলে নিল গুলাবী। মুখের কাছে আনতে বুঝতে পারলো এ গন্ধটা তার চেনা। মহুয়ার মদ খায় সাঁওতালরা। কারণবারি তাহলে সেই মদ? মদের গন্ধে বমি আসতে লাগলো গুলাবীর। সে ভাঁড়টা আবার মাটিতে নামিয়ে রাখলো। সামনে এগিয়ে এলো দশরথ। বললো— "মদ নয় রে গুলাবী; এ হলো কারণবারি। কারণবারি না হলে মায়ের সাধনা হয় না। তুই আমাদের সকলের মঙ্গল চাস না, গুলাবী?"

ভাঁড়টা হাতে তুলে নিয়ে নিজেই গুলাবীর বিহ্বল মুখগহ্বরে নিঃশেষ করে ঢেলে দেয় দশরথ। তীব্র একটা ঝাঁঝালো স্বাদ যেন গুলাবীর সমস্ত শরীরকে নাড়িয়ে দিল। চোখ বুজলো গুলাবী। আবার একপাত্র ভরে তার হাতে দিয়ে দশরথ বললো— "এবারে আমি বললে ওটা মুখে দিবি। আমি পুজোয় বসি।"

মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে গুলাবীর। একবার সে চেয়ে দেখলো চিরঞ্জিকাকার দিকে। চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে দেবীর সামনে বসে আছে কাকা। বাবা একমনে অস্ফুটে কিসব মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে। একবার পিছন ফিরে দরজার বাইরে অন্ধকার আকাশটা দেখার চেষ্টা করলো গুলাবী। কয়েকটা তারা ভিন্ন কিছুই চোখে পড়ে না। অন্ধকার যেন গোটা জায়গাটাকে গিলে খাচ্ছে।

দশরথের ইঙ্গিতে আবার একপাত্র মহুয়ার মদ মুখে ঢাললো গুলাবী। কটু গন্ধ আর তীব্র স্বাদে তার মাথাটা দুপাশে নড়ে কেঁপে উঠলো। মনে হচ্ছে, দেবীর হাতের খড়্গটা যেন দুলছে। মুণ্ড মালাটাও দুলছে দেবীর কণ্ঠে। আবার চোখ বুঝলো গুলাবী। রঘু এখন কি করছে? রঘু কি রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছে তার নিঃসঙ্গ শয্যায়? নিজের পেটের ওপর একবার

BanglaBook.org

হাত বুলিয়ে নিল গুলাবী। ঐখানে ঘুমিয়ে আছে রঘুর বংশধর—তার গর্ভে। জানে শুধু রঘু আর সে। কতক্ষণে পুজো শেষ হবে? দুচোখ যেন বারে বারে বুজে যেতে চায় গুলাবীর। কষ্ট করে তবু সে মেলে রাখতে চেষ্টা করছে চোখ দুটোকে। প্রদীপের মৃদু আলোয় প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালে বড় বড় ছায়া পড়েছে তিনজন মানুষের। সেদিকে নিঝুমের মতো তাকিয়ে রইল সে।

পুজো কখন শেষ হয়েছে ঠিক বুঝতে পারেনি গুলাবী। এক সময়ে তাকে ডাক দিল দশরথ। বললো — "এবারে ওঠ, গুলাবী। মায়ের বলি উৎসর্গ হবে।" আচ্ছন্নের মতো চোখে বাবার দিকে তাকালো সে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালো। দশরথ ঢুকে গেল পাশের ঘরে। তারপর লাল চেলির কাপড়ে জড়ানো একটা কি যেন দুহাতে ধরে মন্দিরের মধ্যে হাড়কাঠের পাশে মাটিতে রাখলো। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে গুলাবীর মনে হলো, ওটা একটা শিশু। ঘুমন্ত। মুখটা তেল সিঁদুর মাখানো একটা নতুন কাপড়ে ঢাকা। শরীরটা সম্পূর্ণ নগ্ন। গুলাবী বুঝতে পারে ওটি একটি শিশু কন্যা। মাথার ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে গুলাবীর। কিছু বলতে গেলে জড়িয়ে যাচ্ছে জিভটা, কথা বার হচ্ছে না।

—"ঐ বাচ্চাটাকে দেবীর সামনে মারবে, বাবা?" কোনো রকমে কাতর একটা আর্তির মতো বাক্য বের হয়ে আসে গুলাবীর মুখ দিয়ে। হুঙ্কার দিয়ে চাপা গলায় বলে দশরথ — "মারবো মানে? ও কথা বলতে নেই রে গুলাবী, মায়ের পায়ে উৎসর্গ হবে বাচ্চাটা। মায়ের আশীর্বাদে সকলের ভাল হবে — তোর, আমার, চৌধুরী ঠাকুরের .....এমন কি রঘুনাথেরও। দেবী ওকে নেবেন আজ। ওরও মুক্তি হয়ে যাবে।"

এসব কি শুনছে গুলাবী? সমস্ত শরীরটা তার তীব্র একটা ঝাঁকানিতে কেঁপে উঠলো। তার নিজের গর্ভে একটি প্রাণকে সযত্নে সে লালন করছে তার সমস্ত রক্ত দিয়ে। এ শিশুটাও তো কোনো মায়ের? না হয় সেই মাকে গুলাবী জানেই না। বাবাকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে গুলাবী শিশুটার পাশে। বাচ্চাটার কোনো সাড় নেই। বোধহয় ওকেও ঐ কারণবারি পান করিয়ে রেখেছে দশরথ। শিশুটাকে মাটি থেকে তোলার চেষ্টা করা মাত্র বাঘের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দশরথ। গুলাবীকে ধাক্কা দিয়ে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে গর্জন করে সে — "সময় পার হয়ে যাচ্ছে, গুলাবী! ওঠ, মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে সময়ে মায়ের কাছে বলিদান না

BanglaBook.org

দিতে পারলে। খেয়ে নে এটা।" বলে আবার একপাত্র কারণবারি তার মুখে ঢেলে দিল দশরথ। তরল জিনিসটা আবার সমস্ত শরীরকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে গুলাবীর। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের কোণটা মুছে নেয় সে।

ততক্ষণে শিশুটাকে তুলে তার মাথাটা হাড়কাঠের মধ্যে আটকে দিয়েছে দশরথ। পাশের ঘরটা থেকে একটা ঝকঝকে সিঁদুর মাখানো খড়্গ হাতে করে নিয়ে এসেছে সে। বাচ্চাটার হাত দুটো তার পিঠের পিছনে এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে দশরথ। অন্য হাতে খড়্গটা গুলাবীর হাতে দিয়ে সে বলে — "এক কোপে বলিদান দিতে হয়। নইলে অনর্থ হয়ে যাবে। খাঁড়াটা দুহাতে তোল, গুলাবী।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাঁড়াটা দু'হাতে ওপরে তুলে ধরে সে। এতক্ষণে বাচ্চাটা হাত পা নাড়ার চেষ্টা করছে। গুলাবী ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। মুখে সম্ভবত কাপড় গুঁজে বাঁধা আছে। সমস্ত শরীরটা দুলছে গুলাবীর। এবারে অন্য হাতে দশরথ শিশুটার দুটি পা চেপে ধরেছে। বাচ্চাটার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই গুলাবীর হাতের খড়্গটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো প্রদীপের কম্পমান আলোতে। খড়্গটা একবার ওপরে উঠেই সজোরে নেমে এলে নীচে।

ফিনকি দিয়ে এক ঝলক তাজা রক্ত ছুটে গেল দেবীর মূর্তির দিকে। সেই মুহূর্তেতিত্‌লির মুণ্ডটা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওপাশে রক্তজবার স্তূপের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

।। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

রাত শেষ হবার আগেই সকলে বার হয়ে এসেছে মন্দির ছেড়ে। গঙ্গাজল দিয়ে রক্তচিহ্ন মুছে দিয়েছে দশরথ। তিত্‌লির কাটা মুণ্ডুটা আর ধড়টা কোশির খাঁড়ির মাটি তুলে সেখানে জলের মধ্যে চাপা দিয়ে এসেছে সে। অবসন্ন গুলাবী নীরবে বাবার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে অন্ধকার পথ দিয়ে। আকাশের সমস্ত তারা এতক্ষণে হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। যন্ত্রচালিতের মতো তিনজনে নীরবে ফিরে আসছে অন্ধকারের সমুদ্রের ঢেউ কেটে। গুলাবীকে তার নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে চিরঞ্জিলাল। এখন সে 'চৌধুরী হাভেলি'তে যেতে পারবে না। দশরথ চলে যাচ্ছে তার নিজের বাড়ীতে। জানকী জানে, আজ তার ফিরতে ভোর হয়ে যাবে। সাবিত্রীও সেই রকমই জানে। রঘুনাথ শুধু জানে না কখন গুলাবীকে ওরা বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

নিজের ঘরে এখন একা একা অঘোরে ঘুমাচ্ছে রঘু।

গুলাবীর ঘরে পৌঁছানোর পরও রাত শেষ হয়নি। গুলাবীর আঁচল থেকে চাবিটা নিয়ে তালাটা খুলে ফেললো চিরঞ্জিলাল। সঙ্গে কলাপাতায় মোড়া খানিকটা কাঁচা গোল্লা। দশরথ ওকে দিয়েছে। ওতে মেশানো আছে জান্‌গুরুর দেওয়া মন্ত্রপূত কি এক রকমের শিকড় বাটা। জান্‌গুরুর নির্দেশ— সময়মত ওটা খেয়ে নিতে হবে।

দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে অবসন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গুলাবী। তাকে দু'হাতে ধরে ভিতরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল চিরঞ্জিলাল। ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে দশরথ। ঘরের মধ্যে এখন শুধু দুজন— গুলাবী আর চিরঞ্জিলাল।

ধুতি আর জামাটা খুলে নিয়েছে সে। সন্দেশ থেকে একটা দলা নিয়ে কোঁৎ করে গিলে নিল চিরঞ্জিলাল। তারপর বিছানায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকা গুলাবীর শরীর থেকে টান দিয়ে খুলে নিল তার শাড়ীটা। নেশায় আচ্ছন্ন গুলাবীর নিরাবরণ শরীর। সেদিকে লুব্ধ পশুর মতো তাকিয়ে আছে চিরঞ্জি। দুই কানের মধ্যে দিয়ে যেন আগুন বের হয়ে আসছে চিরঞ্জিলালের। ঘরের আলো সে জ্বালেনি। অন্ধকারে দীর্ঘ একটা স্তূপের মতো লাগছে গুলাবীর শরীরটা। নিজের শিথিল অঙ্গটাকে সহসা তার সুদৃঢ় মনে হতে থাকে। উত্তপ্ত অঙ্গটাকে একবার দুহাতে স্পর্শ করে দেখে নেয় চিরঞ্জিলাল। তারপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলাবীর আচ্ছন্ন নগ্ন দেহটার ওপরে। দাঁত দিয়ে যেন সে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে গুলাবীর অধরোষ্ঠ। চিরঞ্জির অস্থির দংশনে ক্ষত তৈরী হচ্ছে গুলাবীর গ্রীবা, স্কন্ধ, বক্ষে। পরপর দু'বার সে উন্মত্তের মতো ভোগ করে গুলাবীকে। তারপর তার শরীরের ওপর থেকে নেমে বিছানায় গুলাবীর পাশেই অজ্ঞানের মতো ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত দেহে। ঘুমাতে ঘুমাতে চিরঞ্জি স্বপ্ন দেখে— গুলাবীর শরীরের মধ্যে তার প্রাণবীজ থেকে উপ্ত হয়েছে একটি প্রাণবন্ত শিশু— পুরুষ শিশু, তার বংশধর।

একটা পরিতৃপ্ত ক্লান্তি শরীরে নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। ভোরের আগে সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

পরদিন গুলাবী হঠাৎ ফিরলো তার বাবার বাড়ীতে। ঘরে এসে সে শুনেছে তিত্‌লির নিখোঁজ হবার কথা। সমস্ত শরীরটা তার শিউরে উঠেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তিত্‌লিকে। বেচারী ফুলমোতিয়া কাল থেকে কাঁদতে কাঁদতে আর কান্নার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। শনিচারী স্তব্ধ হয়ে গেছে তিত্‌লির শোকে। প্রতিবেশীদের দুই একজন তাকে ঘিরে

BanglaBook.org

রয়েছে। তিত্‌লিদের ঘর পার করে প্রথমে নিজেদের ঘরে ঢুকলো গুলাবী।

— "তিত্‌লিকে পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেছিস, গুলাবী?" বললো জান্‌কী।

— "হ্যাঁরে, দিদি, কাল সন্ধ্যে থেকে তিত্‌লিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।" বললো শাম্‌লি। — "কোথায় যে গেল মেয়েটা, কে জানে। নিজে হাতে মা-মরা বোনঝিটাকে সে মায়ের মতো করে দু'বছর ধরে মানুষ করেছে তো ! একেবারে ভেঙে পড়েছে ফুলমোতিয়া।"

কোনো জবাব দিল না গুলাবী। মুখে চোখে একটু জল দিল বালতি থেকে। তারপর আঁচলে মুখ মুছে ফুলমোতিয়াদের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো সে। এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে থেমে গিয়েছিল ফুলমোতিয়া। হঠাৎ গুলাবীকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সে। কিছু কথা না বলে তার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তার পিঠে নিজের হাতখানা রাখলো গুলাবী। তার শূন্য দৃষ্টি ততক্ষণে এ বাড়ী ছাড়িয়ে, ও বাড়ী ছাড়িয়ে, মাঠ ঘাট প্রান্তর ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে কোশি নদীর মজে যাওয়া খাঁড়ির জলের কিনারায়। নিজের অজান্তে শরীরটা তার একবার কেঁপে উঠলো। দুটি চোখ বন্ধ করে নিল গুলাবী আতঙ্কে।

পুজোর ফুল আর প্রসাদ সাবিত্রীর জন্যে নিয়ে গিয়েছিল চিরঞ্জিলাল। ভক্তিভরে ফুল বেলপাতা স্বামীর মাথায় আর নিজের মাথায় স্পর্শ করে দেওয়ালের মধ্যেকার কুলুঙ্গিতে রেখে দিল সাবিত্রী। এক কণা প্রসাদ নিজের মুখে নিল সে।

এরপরে মাঝে কেটে গেছে প্রায় ২০/২৫ দিন। চিরঞ্জি শুনেছে গুলাবীর অসুস্থতার কথা। গুলাবীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে— গুলাবী সন্তানসম্ভবা।

এবারে গুলাবী আর রঘুর বিয়ের তারিখ স্থির করে ফেলে চিরঞ্জিলাল। গুলাবী আহ্লাদ করে চিরঞ্জিকে বলে— "জমি চাই না কাকা, আমার নামে সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে খাতা খুলে রেখে দিন। ওর টাকা দিয়ে এখনই গ্যারেজ খোলার দরকার নেই। বছরখানেক টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে কিছু বাড়িয়ে নিয়ে তখন তা থেকে টাকা তুলে গ্যারেজ করার কথা ভাবলেই চলবে।"

কথাটা ভালো লাগে চিরঞ্জির। মেয়েটার বুদ্ধি আছে। বিয়ের ব্যাপারেও যতদূর সম্ভব টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা নিজের খাতায় রাখতে চেয়েছে গুলাবী। চিরঞ্জিলাল এখন গুলাবীর সমস্ত কথা শুনবে। একদিন গুলাবীকে সঙ্গে করে পূর্ণিয়ায় নিয়ে গিয়ে ওখানকার তার চেনা ব্যাঙ্কে মোটা টাকা দিয়ে গুলাবীর নামের খাতা খুলে দেয় সে। শুধু দশরথের জন্যে বেশ খানিকটা জমি কিনে

BanglaBook.org

দিয়েছে ঐ গাঁয়েই। খুব খুশী দশরথ। জান্‌কীও।

বিয়ের তারিখ এসে গেল গুলাবীর। কন্যাকর্তা হিসাবে কন্যাদান করলো চিরঞ্জিলাল নিজে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ে হয়ে গেল গুলাবী আর রঘুনাথের। সকলে আনন্দ করলো বিয়েতে। শুধু একা ঘরে বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদলো সাবিত্রী।

হোটেলের ঘর সবই ছেড়ে দিয়েছে গুলাবী। রঘুনাথ তাকে নিয়ে গেছে নিজের বাড়ীতে। ছেলে বৌয়ের সঙ্গে কিছুদিন এখানে থাকার জন্যে কদিন হলো সত্যবতীও চলে এসেছে 'চৌধুরী হাভেলি' থেকে। এখনো ওখানকার কাজ ছাড়েনি সত্যবতী। একটা মেয়েকে পেয়েছে সে— তাকে দেবে সাবিত্রী দিদির কাছে। তারপর সে পাকাপাকিভাবে চলে এসে ছেলে বৌয়ের সঙ্গে থাকবে।

এখন আর রঘুনাথ বা গুলাবীর নিঃসঙ্গ একক জীবন নয়। প্রতি রাতেই রঘুনাথ পায় গুলাবীর উষ্ণ সান্নিধ্য। মা বলেছিল— "মাঝের ঘরের দরজাটা তোরা ওদিক থেকে বন্ধ করে দিস্, রঘু। আমি তো এদিকে রইলামই। দরকার পড়লে আমাকে ডাকিস। বৌমার শরীরটা তো ভাল নেই।"

হেসেছে রঘু। বলেছে — "মার কাছে আবার এত কি? তুমি তো আমাকে মানুষ করেছ ছোট থেকে। আজ কি বৌয়ের হাতে আমাকে 'পর' করে দেবে? সেসব হবে না। দরকার হলে তোমাকে নিয়েই আমরা একসঙ্গে শোবো।"

মজা লেগেছে সত্যবতীর ছেলের পাগলামির কথা শুনে। ভালোও লেগেছে। তার রঘু এখনো মায়ের রয়েছে। একা একা নিজের ঘরে শুয়ে রাতে ঘুম আসে না সত্যবতীর। গুলাবীর চুড়ির টুং টাং আওয়াজ কানে আসে। কানে আসে খাটের ওপর নড়াচড়ার শব্দ। রঘুনাথের বাবার কত সাধের স্বপ্ন— তার রঘুবাবার একটা সংসার হয়। দেখে যেতে পারেনি মানুষটা। নিজেকে কেমন যেন স্বার্থপরের মতো নিঃশেষ করে দিয়ে অকালে চলে গেল। স্বামীর কথা ভেবে চোখে জল এলো সত্যবতীর। কিন্তু সে জল সত্যবতী মোছার কোনো চেষ্টাই করলো না।

সত্যবতীর হঠাৎ ভীষণ জ্বর এসেছে। প্রথম দিকটায় ডাক্তার দেখাতে চায়নি সত্যবতী। চৌধুরী হাভেলিতে আবার ফিরে গেছে সে। এখানে সাবিত্রী দিদির স্বামীকে ব্যস্ত করতে মন চায় না সত্যবতীর। পরের বাড়ী। সব সুবিধা কি এখানে চাওয়া যায়, না, পাওয়ার দাবী করা যায়? অবশ্য সাবিত্রী খুব চেষ্টা

BanglaBook.org

করেছে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে। সত্যবতীই রাজী হয়নি। কিন্তু ৩/৪ দিনের মধ্যেই সত্যবতীর খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা। জেলখানার বড় ডাক্তারকে অনেক বলে কয়ে বাড়ীতে এনে সত্যবতীকে দেখাতে রাজী করেছে চিরঞ্জিলাল। আরারিয়া ছোট গ্রাম। বড় ডাক্তার এখানে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সত্যবতীর যেরকম অবস্থা— তাতে গাড়ীতে করেও তাকে জেলা সদরে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছে ডাক্তার। রঘু খবর পেয়ে গুলাবীকে নিয়ে মায়ের কাছে এসেছে। মাকে নিজের কাছে নিতে চেয়ে চিরঞ্জিকে সে বলে— "কাকা, মাকে নিয়েই যাই আমার কাছে। যা হবার আমার বাড়ীতেই হোক। হাজার হলেও ছেলের বাড়ী তো!'

প্রথমটায় যথেষ্ট আপত্তি করেছিল চিরঞ্জিলাল। সাবিত্রীও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর না বলেনি চিরঞ্জিলাল চৌধুরী। সে বুঝেছিল— সত্যবতীর এ রোগ সারার নয়। মেনিনজাইটিসের কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা পূর্ণিয়াতেও নেই। তাছাড়া, কেসটা একেবারে খারাপের দিকে চলে গেছে। গরুর গাড়ীতে করে শুইয়ে মাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলো রঘুনাথ। সারা রাত মাথার কাছে দুজনে পালা করে বসে থাকে। অচৈতন্য সত্যবতী কিছু বুঝতে পারে না। চিরঞ্জি রোজই আসে একবার করে। সত্যবতীকে দেখার ফাঁকে ফাঁকে সে লক্ষ্য করার চেষ্টা করে গুলাবীকে। গুলাবীর শারীরিক পরিবর্তন কিছু হচ্ছে কিনা তীক্ষ্ণ চোখে বুঝতে চেষ্টা করে চিরঞ্জি।

জ্বর আর নামেই না। মাথায় কাপড়ের পুঁটলি করে বরফ দেয় রঘু। অচৈতন্য সত্যবতী পুত্রের সেবার কথাটাও বুঝতে পারে না। আজ সকালে হঠাৎ একবার জ্ঞান ফিরে এলো সত্যবতীর। জ্বরতপ্ত দুটি চোখ মেলে সে দেখলো মাথার কাছে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছে গুলাবী। জ্বরের তাপে সত্যবতীর চোখদুটি যেন পুড়ে যাচ্ছে। ক্ষীণভাবে মাথাটা একবার এপাশে-ওপাশে নড়ে কাকে যেন খুঁজতে চেষ্টা করে।

মাকে চোখ মেলতে দেখে নীচু হয়ে তাকে প্রশ্ন করে গুলাবী— "কাকে খুঁজছো, মা? তোমার ছেলেকে? সে তোমার জন্যে ওষুধ আনতে গেছে। আমায় চিনতে পারছো না মা? আমি গুলাবী।"

কিছু বুঝতে পারে না সত্যবতী। শূন্য দৃষ্টিতে নির্বাক চেয়ে থাকে সে গুলাবীর দিকে। তারপর চোখ দুটি বুজে যায় তার। আর বড় আদরের রঘুবাবাকে আর দেখা হলো না মা সত্যবতীর। ঠোঁট দুটি একবার মুহূর্তের জন্য থরথর

BanglaBook.org

করে কেঁপে ওঠে তার, তারপর সে দুটি চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গেল একেবারে।

জান্‌গুরুর বিধান আর তার ফলাফল সম্বন্ধে প্রথমটায় সে রকম গভীর কোনো বিশ্বাস ছিল না সাবিত্রীর। কিন্তু সেদিনের যে ঘটনা ঘটে গেল গুলাবীর ঘরে, তা আশ্চর্য করে দিয়েছে চিরঞ্জিকে। তার হারানো ক্ষমতা ফিরে এসেছে জান্‌গুরুর ব্যবস্থাতেই। আসন্ন পিতৃত্বের শক্তিতে বিশ্বাসী চিরঞ্জির এক গভীর প্রত্যয় জন্মে গেছে যে, গুলাবীর গর্ভে তার পুত্রসন্তানই শ্বাস নিচ্ছে। তাকে পরম যত্নে রক্ষা করতে হবে। কারণ, চৌধুরী চিরঞ্জিলালের বংশরক্ষার প্রধান দায়িত্ব ঐ অনাগত শিশুটিই গ্রহণ করতে চলেছে। রঘুর মা সত্যবতী মারা গেছে। রঘু অথবা গুলাবী কেউই বয়সে প্রাচীন বা প্রাজ্ঞ নয়। এ সময়ে গুলাবীর যে যত্ন, যে সাবধানতা প্রয়োজন তা ওরা কেউই জানে না। একদিন সকালে কথাটা সাবিত্রীর কাছে পাড়ে চিরঞ্জিলাল। —"দেখ্ সাবি, গুলাবীটার শাশুড়ী ঘরে নেই। একা একা ওরা কি যে করে কে জানে। গুলাবীর যত্ন করার মতো কেউ তো ওখানে নেই। আচ্ছা, মেয়েটাকে এখানে এনে রাখা যায় না? তাহলে তুই তো একটু দেখাশুনা করতে পারিস?"

সাবিত্রী একবার স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম, অনেক লড়াই করে সাবিত্রী কোনো রকমে সমস্ত ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে। চিরঞ্জির জীবনচর্যা, আচরণ, কথাবার্তায় একটা অন্য মানুষ যেন জন্ম নিয়েছে পুরনো চিরঞ্জির শরীরের মধ্যে। এখন যেন মনে হয় গুলাবীকে নিয়ে সাবিত্রীর আর কোনো ভয় নেই। গুলাবীর বিয়ে হয়ে গেছে রঘুর সঙ্গে। নিজের জগৎ খুঁজে পেয়ে গেছে সে। তার প্রতি স্বামীর সেই শরীরী মোহও বোধহয় অনেকটা কেটে গেছে। কেমন একটা বাৎসল্য যেন সে দেখতে পায় চিরঞ্জির চোখে মুখে। তাই আর না বলতে পারলো না সাবিত্রী। সে নিজেও চিরঞ্জির সঙ্গে রঘুর বাড়ীতে গিয়ে রঘুকে কথাটা বলে— "আমি তোমাদের কাকী হলেও মায়ের সমান, রঘু। তোমার মা সত্যবতী দিদি আজ থাকলে আমি কিছু চিন্তা করতাম না। কিন্তু তিনি নেই। এ সময়ে কখন কি করতে হয়, তার কিছুই তোমরা জানো না। আমাদের ইচ্ছে, গুলাবী এ সময়টা আমার কাছেই থাকুক। তুমি সময়ে অসময়ে ওকে দেখে আসবে। কি বলো তুমি?"

সাবিত্রী আর রঘু দুজনেই বিশ্বাস করে যে খারাপ মানুষও একদিন ভালো হয়ে যায়। তাই আর আপত্তি করে না রঘু। সে বলে— "আপনি মা,

BanglaBook.org

যা ভাল বলবেন, তাই হবে। নিয়ে যান ওকে। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো।"

গুলাবীকে নিয়ে দুজনে চলে এসেছে চৌধুরী হাভেলিতে। সাবিত্রীর ঘরের পাশের ঘরটাতে তার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে চিরঞ্জি নিজে। গুলাবীর গর্ভে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে যে পুত্র সন্তান— তার জনক চিরঞ্জিলাল নিজে, এ এক গভীর বিশ্বাস তার। সাবিত্রীও বুঝে গেছে যে পুত্রের জন্ম সে দিতে পারেনি, বংশরক্ষক সেই সন্তান অন্য এক মাতৃগর্ভে বড় হচ্ছে সাবিত্রীকেই অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আজ তাই গুলাবীর ওপর সাবিত্রী এবং চিরঞ্জির যেন কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রাণ দিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে অনাগত সেই সন্তানকে রক্ষা করা তাদের উভয়েরই একান্ত পবিত্র কর্তব্য।

একই ভাবে রঘুও জানে, তারই আত্মজ আজ গোলাপের গর্ভে বেড়ে উঠছে। রঘুর পিতা সুরেশ যাদব যে পৌত্রকে শুধুমাত্র কল্পনা করেই স্বর্গগত হয়েছে, সেই অচরিতার্থ বাসনা নিয়ে আর কয়েক মাসের মধ্যে সেই সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখবে সুরেশ যাদবের পুত্র রঘুনাথ যাদব। সেই সন্তানকে যে কোনো মূল্যে সযত্নে রক্ষা করবে তার গর্বিত আত্মজ রঘু, রঘুনাথ যাদব।

গুলাবীকে নিয়ে চিরঞ্জি আর সাবিত্রী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একা একা বিছানায় শুয়ে বড় ভালো লাগছিল রঘুনাথের । কতদিন পরে আজ যেন বড় নিশ্চিন্ত সে। মা সত্যবতী চলে যাবার পরে এই প্রথম যেন বড় সুখী মনে হচ্ছে তার নিজেকে।

।। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

রঘুনাথ যে এখনই গ্যারেজের কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, এ কথা জেনে সব চেয়ে খুশী ছোটকু, দীনু আর ব্রিজ। হরিবিষ্ণুও খুশী হয়েছে মনে মনে। মুখে তা প্রকাশ করেও ফেললো সে একদিন— "তোর ভালই সব সময়ে চেয়েছি আমি। তবু, মিথ্যা বলবো না, তুই চলে যাবি— এই কথাটা শোনার পরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন নিশ্চিন্ত লাগছে নিজেকে। তুই চলে গেলে আমার ভাল লাগে না রে রঘু। বড় অসহায় লাগে। বুড়ো বাপকে জোয়ান ছেলে ছেড়ে চলে গেলে যেমন মনে হয় তার, তোর জন্য আমার প্রাণও তেমনি কাঁদে, তুই বুঝিস রঘু?"

BanglaBook.org

চোখ দুটো চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে প্রৌঢ় হরিবিষ্ণু যাদবের। অবাক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে রঘুনাথ। বিষ্ণুকাকা তাকে এত ভালোবাসে? জানতো না সে। কৃতজ্ঞতায় রঘুর চোখেও জল এসে গেল।

দু'একদিন পরপরই 'চৌধুরী হাভেলি'তে গিয়ে গুলাবীকে দেখে আসে রঘু। প্রথম প্রথম এটা ওটা হাতে নিয়ে যেত সে গুলাবীর জন্য। কিন্তু বারণ করেছিল সাবিত্রী। বলেছিল— "গুলাবী তো আমারও মেয়ে। তার জন্যে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি রঘু। তুমি কিছু এনো না অকারণে।" আবেগে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল রঘুনাথ। এরপর থেকে কোনোদিন আর কিছু হাতে করে সে যায়নি ও বাড়ীতে।

চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। গুলাবীর মনে হয় কে যেন, কি যেন একটা মাঝে মাঝে নড়েচড়ে ওঠে পেটের ভিতরে। চমকে চমকে ওঠে গুলাবী। কাকীকে লজ্জায় বলতে পারে না সে। বলেছিল রঘুকে। রঘু গুলাবীর পেটের ওপরে কান রেখে শোনার চেষ্টা করেছিল তার আংজর নড়াচড়ার শব্দ। তারপর দুজনে খুব হেসেছিল মজা পেয়ে।

যত দিন যাচ্ছে, ততই একটা অদ্ভুত অস্থিরতা পেয়ে বসছে গুলাবীকে। না, সে কিছুতেই দিতে পারবে না তার সেই অনাগত সন্তানকে কারো হাতে তুলে। এদের দেওয়া অর্থ, এত যত্ন, এত স্নেহ কোনো কিছুর মূল্যেই সে বিকিয়ে দিতে পারবে না তার মাতৃত্বকে। অথচ কথা তো সেই রকমই আছে। অনেক টাকা জমা হয়ে গেছে তার ব্যাঙ্কের খাতায়। নিজের জমি থেকে বেশ অনেকটা জমি তার বাবা দশরথকে লিখে দিয়েছে চিরঞ্জিকাকা। বোনের বিয়ের যৌতুকের জন্যও দিয়ে রেখেছে জমি আর নগদ টাকা। গুলাবীকেও দিয়েছে অলংকার পত্র। কিন্তু তবু গুলাবী তুলে দিতে পারবে না তার নাড়ী ছেঁড়া ধনকে চিরঞ্জি আর সাবিত্রীর হাতে।

সন্ধ্যায় রঘু এসেছিল গুলাবীকে দেখতে। কথার ফাঁকে হঠাৎ গুলাবী রঘুর কাছে ঘন হয়ে বসে বলে— "হ্যাঁগো, চলো না অনেক দূরে আমরা কোথাও চলে যাই। যেখানে কেউ আমাদের জানে না, চেনে না। এখানে প্রাণ আমার হাঁফিয়ে ওঠে।"

বুঝতে পারে না রঘুনাথ। এখানে কাকা কাকীর এত আদর, এত যত্নে তবু কেন মন ভরে না গোলাপের? কেন সে রঘুর সঙ্গে পালিয়ে চলে যেতে চায় এখানকার টাকা পয়সা সব তুলে নিয়ে অন্য কোথাও?

গুলাবীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সে বলে— "তা হয় না রে

BanglaBook.org

গোলাপ। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা কথা আছে? পারলাম কি বিষ্ণুকাকার গ্যারেজ ছেড়ে চলে যেতে? নিজে যখন মা হবি তখন বুঝতে পারবি বাপ মায়ের সমান মানুষদের কষ্ট।"

সব কথা খুলে বলতে পারে না গুলাবী। সেসব লজ্জার কথা, লোভের কথা, পিতৃসম বৃদ্ধের কন্যার প্রতি কামনা আর লালসার কথা রঘুকে বলা যায় না। কারণ রঘু বিশ্বাস করে যে মানুষেরই পরিবর্তন হয়, পাথরের নয়। রঘুর বুকে মাথা রেখে শুধু নিষ্ফল কান্না-ই তার সার।

তবু নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করে একদিন গুলাবী বলে ফেলে রঘুকে— সবটুকু নয়, যেটুকু তাকে বলা যায় ততটুকু। —"তোমাকে বলিনি তুমি কষ্ট পাবে বলে। কিন্তু আজ না বলে পারছি না। চিরঞ্জিকাকাকে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমার আমার ছেলে হলে তাকে আমি দিয়ে দেবো ওঁকে, উনি তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করবেন। এর বদলে আমার বাবাকে, আমাদের জন্যে অনেক টাকা দেবেন কাকা। কিন্তু আজ বুঝছি, কত বড় ভুল করেছিলাম আমি। যত দিন এগিয়ে আসছে ততই মানসিক কষ্টে মরে যাচ্ছি আমি। অথচ এত টাকা আমরা নিয়েছি কাকার কাছ থেকে। ছেলে জন্মালেই তো কাকার হাতে তাকে তুলে দিতে হবে। তার চেয়ে চলো না, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই, দূরে?* কাতর প্রার্থনা গুলাবীর। এসব কথা জানতো না রঘু: গুলাবীর কথায় তার মাথার মধ্যেটা কেমন যেন করে ওঠে। সত্যিই তো, অর্থের বিনিময়ে আজ তার পিতৃত্বকে বিক্রি করে দিতে হবে চৌধুরী হাভেলির বাজারে?

এখনই গুলাবীকে কিছু বললো না রঘু। শুধু বললো— "ব্যাপারটা তুই এমন জটিল করে তুলে আজ বলছিস আমাকে! এখানেও তো আবার সেই কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন। প্রশ্ন পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের মর্যাদারও।" অত সব শক্ত কথা বোঝে না গুলাবী। বোঝে না রঘুও। কিন্তু কোথায় যে একটা মস্ত জট পাকিয়ে রয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না দুজনেরই।

দিন সাতেক চরম অস্থিরতায় কাটে রঘুর। তার মনে হতে লাগলো, এ অবস্থায় গুলাবীকে বোধহয় আর ওই বাড়ীতে রাখা উচিত হবে না। কথাটা সে অন্যভাবে পেশ করলো চিরঞ্জির কাছে— "বাড়ীতে আমার একা একা নানা অসুবিধে হচ্ছে, কাকা। তাছাড়া, গুলাবী নিজেও ব্যস্ত হচ্ছে আমার কাছে এসে থাকার জন্যে। ও এখন বুঝে নিয়েছে এ সময়ে কি করতে হয়, কিভাবে থাকতে হয়। মনে হয় না আমার কাছে চলে গেলে খুব কিছু অসুবিধা

BanglaBook.org

হবে ওর। যদি অনুমতি করেন তবে নিয়েই যাই গুলাবীকে।"

সাবিত্রীর সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলোচনা করে চিরঞ্জিলাল। গুলাবী পরের স্ত্রী। স্বামীর কাছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়াটাই সঙ্গত। তাই শেষ পর্যন্ত রঘুর কাছে ফিরেই গেল গুলাবী।

এখন মা নেই, তাই আরারিয়াতে যে পড়ে থাকতেই হবে, এমন কোনো মানে নেই রঘুর। হরিবিষ্ণুর কাছে চাকরী তো ছেড়ে দেবার কথা বলা-ই আছে। সে আজ না হোক কাল চলে যাবে। তাছাড়া গুলাবীর কাছ থেকে বাচ্চাকে দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা শোনার পর থেকে মনে মনে এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তাটাও একরকম করে রেখেছিল রঘুনাথ। ব্যাঙ্কের সব টাকা পয়সা তুলে রেখে দিয়েছিল সে। বৌকে নিয়ে পূর্ণিয়ায় চলে যাচ্ছে বলে রঘু চলে গেল মুঙ্গেরে। চিরঞ্জিও জেনেছিল পূর্ণিয়ায় যাচ্ছে রঘু আর গুলাবী।

কিছুদিন কেটে গেছে রঘুরা এখনকার পাট তুলে দিয়ে চলে গেছে। তাদের রেখে যাওয়া ঠিকানায় খোঁজ করতে গিয়ে চিরঞ্জি জানতে পারলো ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েও থাকেনি রঘুরা কখনো। তারা কোথায় চলে গেছে সঠিক না বলতে পারলেও বাড়ীওয়ালা জানালো রঘুনাথ যাদব মুঙ্গেরে কোথাও আছে। এত বড় বেইমানী আর অকৃতজ্ঞতায় পাগলের মতো হয়ে গেল চিরঞ্জিলাল। সে জানে গুলাবীর গর্ভে রয়েছে তারই সন্তান। এত অর্থের বিনিময়ে সে শুধু তার সন্তানকেই চায়। কিন্তু এ তো চিরঞ্জির ঘরে দিনে দুপুরে ডাকাতির সমান।

লোক মারফৎ খোঁজ করতে করতে একদিন মোটর মেকানিক রঘুনাথ যাদবকে মুঙ্গেরে খুঁজে পেতে অসুবিধা নয় না চিরঞ্জির। রঘু তখন বাড়ীতে ছিল না। দুপুর বেলা বেরিয়েছিল কাজের খোঁজে। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে দরজা খুললো গুলাবী। তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল চিরঞ্জিকাকাকে দেখে।

রঘুনাথরা এমন ভাবে চলে যাওয়ায় শুধু সাবিত্রী নয়, দশরথও কম ভেঙে পড়েনি। মেয়েটা কোথায় উধাও হয়ে গেল সে চিন্তায় দশরথও যথেষ্ট অস্থির হয়ে পড়েছিল। চিরঞ্জির কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টাকা, জমি সবই পেয়েছে ঐ একই শর্তে। আজ যদি গুলাবী বা তার ছেলেকে না পায় চিরঞ্জি— তাহলে দশরথেরই বা কি দশা হতে পারে? তিত্‌লি হত্যার দায় প্রত্যক্ষভাবে তারই,

BanglaBook.org

চিরঞ্জির সরাসরি ভূমিকা কিছু নেই। এ অবস্থায় চিরঞ্জি ক্রুদ্ধ হয়ে দশরথের কতখানি ক্ষতি করে দিতে পারে তা ভেবে রাতের ঘুম চলে গেছে তার। সুতরাং রঘুদের সন্ধান সেও করছিল।

তিত্‌লিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শোকের প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেছে শনিচারীর। শুধু ফুলমোতিয়া সেদিন থেকে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেদিন যদি সে তিত্‌লিকে ঘরে একা রেখে পুকুর ঘাটে না যেতো, তাহলে হয়তো এমন করে হারিয়ে যেত না মেয়েটা। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় তার সব সময়ে। দশরথও আর যায় না ওদের বাড়ীতে। যে অন্যায় সে করেছে, তা আর কেউ না জানলেও সে নিজে তা জানে। ওদের কাছে দেখানোর মুখ তার নেই। ফুলমোতিয়াকে দেখলে দশরথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোশি নদীর ঐ মজে যাওয়া খাঁড়িটা, আর, একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাত। ভাবনাটা মাথায় এলে শরীরে একটা শিহরণ জেগে ওঠে দশরথের। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায় আপনা থেকেই। হঠাৎ এত টাকা আর জমি চিরঞ্জি তাকে কেন দিলো, তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা জান্‌কীর কাছে দিতে পারেনি দশরথ। চিরঞ্জি দশরথের যজমান হলেও কোনো গৃহস্বামীই তার কুল-পুরোহিতকেএত অর্থ আর জমি দান করে না। মনে মনে একটা সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে জান্‌কীর। কিন্তু সে জানে এ প্রশ্নের জবাব দশরথ তাকে কোনোদিন দেবে না, হয়তো বা দিতে পারবেও না কখনো। সত্যবতী আজ বেঁচে থাকলে তারও হয়তো মনে ঐ একই প্রশ্ন জাগতো। রঘুকে যে কোনো কারণেই হোক, ভাল চোখে যে চিরঞ্জিলাল দেখে না সেটা বুঝতে বাকি থাকতো না সত্যবতীর। সেই চিরঞ্জির এই আকস্মিক বিস্ময়কর পরিবর্তন নিঃসন্দেহে সত্যবতীর বিশ্বাসের বৃক্ষে কুঠারাঘাত করতো।

কিন্তু এখন আর এসব চিন্তা করার অর্থও নেই, প্রয়োজনীয়তাও নেই। গুলাবী আর রঘু দুজনেই স্থির করে নিয়েছে তাদের সন্তানকে কোনো কিছুর মূল্যেই তারা চিরঞ্জির হাতে তুলে দেবে না। তাই বিবেক বুদ্ধি বা নীতির কিছুটা বিসর্জন দিয়ে রঘু গুলাবীকে নিয়ে এক রকম পালিয়েই চলে এসেছিল মুঙ্গেরে, পূর্ণিয়ায় যাচ্ছে বলে। এটা যদি অনৈতিকতা হয়, তবে আরো বড় অনৈতিকতা হবে অভাবী মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে তার সন্তানকে কিনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সেটা অন্তত তারা করছে না কারো সঙ্গে। চিরঞ্জি নিজে পাঁচটি সন্তানের পিতা হয়েও আর এক অভাবী পিতার হৃদয়টা বুঝলো না, তার সন্তানকে কিনে নেওয়ার মতো ভ্রান্ত, অমানবিক, আর অনৈতিক

BanglaBook.org

কাজ যে করতে পারে— তার সাথে এটুকু তঞ্চকতা করা বোধহয় ততখানি গর্হিত নয়। এ ব্যাপারে তাই কোনো মনঃপীড়া নেই রঘুনাথের। তেমন হলে সে ফিরিয়ে দেবে চিরঞ্জিকাকার সমস্ত টাকা। এতখানি মনের জোর রাখে সে। অবশ্য, শুধু তার নিজের নেওয়া টাকারই তো প্রশ্ন নয় এখানে। ঐ প্রতিশ্রুতির সাথে যে জড়িয়ে রয়েছে তার শ্বশুরবাড়ীর পরিবারও। তাদের কি হবে তখন?

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এইসব কথা-ই ভাবছিল রঘুনাথ। বেলা বেড়েছে। এখন বাড়ী না ফিরলে ভাবনায় থাকবে গুলাবী। খাওয়াদাওয়া, চান কিছুই করবে না রঘু না ফিরে গেলে। তাই বাড়ীর দিকে হাঁটা শুরু করে রঘুনাথ।

মুঙ্গেরে যে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে রঘুনাথ — তারই পাশের বাড়ীতে থাকে এক মুসলিম পরিবার। মা আর ছেলের সংসার। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরদৌস আর তার মা জুবেদা বেগম বড় আপন করে নিয়েছে রঘু আর গুলাবীকে। ফিরদৌস পটের ছবি আঁকে, মাটির পুতুল বানায়। তার পটের ছবির চাহিদা আছে বাজারে। মুঙ্গেরের বড় বড় ছবির দোকান তার ছবি কিনে নেয়। ফিরদৌস শুনেছে, তারা নাকি ওর ছবি কিনে কাদের মাধ্যমে যেন বিদেশেও পাঠিয়ে থাকে। এই কাজ করে মা আর ছেলের ভালোই চলে যায়। দেহাতে কিছু জমি আছে। ফিরদৌসের সৎ ভাই চাষবাস করে। গানের গলাটিও তার বেশ। এক-একদিন রাতে ছবি আঁকা শেষ করে গলা ছেড়ে ভোজপুরী গান গায় ফিরদৌস। দেখতে কোমল, ফর্সা রং, দোহারা চেহারা। রঘুনাথরা ওখানে আসার দিনই জুবেদা নিজে এসে আলাপ করেছিল ওদের সঙ্গে। মালপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে রান্না করার সময় হবে না বলে সেদিন জুবেদা-ই ওদের জন্য খাবার এনে দিয়েছিল নিজের বাড়ী থেকে। মিষ্ট স্বভাব ফিরদৌসকে ভাল লেগেছিল গুলাবীর। রঘুর বয়সীই প্রায় ফিরদৌস। গুলাবীর কেবলই মনে একটা তুলনা এসে যাচ্ছিল রঘুনাথ আর সত্যবতী মায়ের সঙ্গে। গুলাবী অন্তঃসত্ত্বা জানতে পেরে জুবেদা মায়ের মতো যত্নে তার সাথে ব্যবহার করছে। একটা শূন্যতা ঘুচলো যেন গুলাবীর। রঘু যতক্ষণ কাজের খোঁজে বাইরে থাকে, ততক্ষণ গুলাবীর জন্যে তার কোনো চিন্তা থাকে না। বাড়ীর পাশে মায়ের মতো আছে একজন। দরকার হলে রঘুর ঘরেই ততক্ষণ থেকে যাবে জুবেদা বেগম। কখনো কখনো গুলাবী ফিরদৌসের পাশে বসে তার ছবি আঁকা দেখে। সৃষ্টিতে মগ্ন ফিরদৌসের আপন ভোলা রূপটি তারিয়ে

BanglaBook.org

তারিয়ে অনুভব করে গুলাবী। চা তৈরী করে এনে দেয় সে ফিরদৌসকে। কিন্তু খেতে বলতে ভুলে যায় গুলাবী। ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা যখন চোখে পড়ে তখন দুজনেই ফেটে পড়ে হাসিতে। এসব দেখতে ভারী ভালো লাগে জুবেদার। গুলাবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবে তার বড় আদরের ফিরদৌসের জন্যে এই রকম একটা বৌ সে ঘরে আনবে। কিন্তু ফিরদৌস কবে মাকে হ্যাঁ বলবে?

ঘরে নেই রঘুনাথ। দরজায় তালা দিয়ে আসেনি গুলাবী। পাশের ঘরটাই ওদের। এত অল্প সময়ে শিকল খুলে চুরি হয়ে যাবে না, জানে গুলাবী। ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল ফিরদৌসের। ছবিটা বোর্ডের ওপর ক্লিপ দিয়ে আটকে সে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গুলাবীকে জিজ্ঞাসা করল— "কেমন হয়েছে, কই, বললে না তো তুমি?" দুষ্টুমির হাসি হাসলো গুলাবী। ঠোঁটটা উল্টে সে বলে— "এই মোটামুটি।"

ছবিটাকে তুলে নেয় ফিরদৌস। বলে— "বেশ, তাই-ই না হয় হলো। কিন্তু নিজে থেকে বুঝি কিছু বলা যায় না, প্রশ্ন না করলে?"

আবার হাসলো গুলাবী। বললো, "আহা, তুলে নিলে কেন? আরো একটু দেখতে দাও ভালো করে। তবে তো বলতে পারবো সত্যিই কেমন হয়েছে।" ফিরদৌসের হাত থেকে ছবিটা কাড়তে যায় গুলাবী। সরিয়ে নেয় ফিরদৌস— "আমার পট অত সস্তা নয় যে, যেচে লোকের মত জানবো। এবার দেখতে পয়সা লাগবে।"

হাসতে হাসতে গুলাবী বলে— "ধার রইল ওটা। পরে সুদ সমেত দেবো।" হাঁ করে এসব দেখে জুবেদা বেগম। বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে তার। ফিরদৌসের বাপও পট আঁকতো, গান গাইতো। একবার এক গানের জলসায় গ্রামে তাকে দেখেছিল জুবেদা। তখন জুবেদার বয়স ছিল তেরো, আব্বাসের বয়স কুড়ি। দুজনের ভাল লেগে গিয়েছিল দুজনকে। ছবি আঁকিয়ে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়নি জুবেদার বাবা। তাছাড়া, আব্বাসের বাড়ী ছিল ভিন গাঁয়ে। শেষমেশ আব্বাসের সঙ্গে ছবির আকর্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল জুবেদা। বাবা পরে তাদের বিয়ে মেনে নিয়েছিল বটে। কিন্তু তখন একেবারে তার শেষ সময়। জামাইয়ের হাতটা ধরে শেষ কথাটা শুধু বলতে পেরেছিল রফিকুল— "আমার জুবেদাকে তুমি দেখো বাপজান। জুবেদা যেন সুখী হয়।"

আর কিছু বলতে পারেনি সে। খবর পেয়ে জুবেদা যখন বাপের বাড়ী

BanglaBook.org

এলো তখন পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে রফিকুলের ঘরে। আব্বাসের সঙ্গে ও বেশীদিন ঘর করা হয়নি জুবেদার। গান গাইতে গাইতে এক গ্রাম্য গানের আসরে মুখে রক্ত উঠে মরে গিয়েছিল আব্বাস। ভিতরে ভিতরে তার কাশের রোগ ছিল। ভয়ে সে কাউকে জানায়নি। তাহলে তাকে গানে কেউ ডাকবে না, তার পট কেউ কিনতে আসবে না।

সেই পট আঁকাকেই পেশা করে নিল ফিরদৌস। একটু বড় হতেই গানও। ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই আব্বাসকে মনে পড়তো জুবেদার। গলার আওয়াজটা পর্যন্ত হুবহু এক।

শিকলটা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো গুলাবী। এতক্ষণে বোধহয় এসে যাবে রঘু। তার জন্যে তেল গামছা আর লুঙ্গিটা হাতের কাছে রেখে দিল সে। রোদের মধ্যে তেতে পুড়ে আসবে। চানটা সেরে নিলে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসবে। নিজের চান সারা হয়ে গেছে গুলাবীর। এমন সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে রঘু এসেছে মনে করে দোরটা খুলে চমকে ওঠে গুলাবী। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চিরঞ্জিকাকা।

গুলাবীকে দেখে মাথায় খুন চেপে যায় চিরঞ্জির। চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে— "বেইমান কোথাকার। পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছিস এইখানে? ভাবলি, কেউ জানবে না? নরকে গেলেও তোদের আমি খুঁজে আনতাম।"

কোনো জবাব দিল না গুলাবী। দরজার দুটো পাল্লা বড় করে খুলে দিয়ে এক পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। ভিতরে ঢুকে এলো চিরঞ্জি। ঠিক সেই সময়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো রঘু।

।। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।।

বাড়ীতে আসার পথেও এমনটা যে ঘটবে— তা ভাবতে পারেনি রঘুনাথ। চিরঞ্জিকে হঠাৎ এভাবে এখানে দেখতে পেয়ে তার মুখে সহসা কোনো কথা জোগালো না। কি যেন একটা কথা সে কষ্ট করে বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই তার জামার কলারটা ঘাড়ের কাছে চেপে ধরলো চিরঞ্জিলাল— "আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস, শালা বেইমানের বাচ্চা!" দাঁতে দাঁতে ঘষছিল চিরঞ্জিলাল।

—"জামা ছাড়ুন।" মনে তীব্র একটা সাহস এনে বলে ফেলে রঘুনাথ—

BanglaBook.org

"নিজের ছেলেকে নিয়ে, নিজের বৌকে নিয়ে আমার যেখানে খুশী যেতে পারি। আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, আমার শ্বশুরের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল আমি জানি না। তাদের ডেকে আনুন, আমার যা বলবার আমি তখন বলবো।" কাঁধটা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রঘুনাথ।

হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় চিরঞ্জি। রঘু তাহলে কিছু জানে না? গুলাবী বা দশরথ তাকে কিছু জানায়নি? রঘু কি জানে না যে, গুলাবীর পেটে যে বাচ্চা রয়েছে— তা তার নিজের নয়? গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায় চিরঞ্জির। সে বলে— "তুই জানিস না তোর বৌ আর তোর শ্বশুরের সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছে? তুই জানিস না কেন এতগুলো টাকা আমি তোদের হাতে তুলে দিয়েছি? সে কি এমনি এমনি? তোর বৌয়ের পেটে যে বাচ্চা— সে আমার। জানিস না তুই? বাচ্চা জন্মালে সে বাচ্চা আমার হাতে তুলে দিতে হবে— সে কথাও তোর বৌ তোকে বলেনি? আজ জেনে রাখ, রঘু — এত সহজে তোদের ছেড়ে দেবো না আমি। বাচ্চা না দিলে সুদে আসলে সব আদায় করে নেবো! দরকার হলে তোকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে, তোর বৌকে আমার ঘরে তুলবো আমি! এই বলে দিলাম।"

হাঁফাচ্ছিল চিরঞ্জিলাল। এক আশ্চর্য কাহিনী যেন শুনছে রঘুনাথ। অবাক হয়ে সে গুলাবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাঁদছিল গুলাবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। এবার এক ঝটকায় তার মুখের আঁচল সরিয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠলো রঘু— "বল্, গুলাবী, বল্। এসব কথা সত্যি? বল্, কার বাচ্চা তোর পেটে, আমার না চৌধুরীকাকার? একবার বল্ গুলাবী!" শেষের দিকে কণ্ঠস্বর যেন বুজে আসে রঘুর। "তুই এত নীচে নামতে পারলি গুলাবী? কাকার সঙ্গে শুতে তোর একবারও বাধলো না? তুই এসব কি করেছিস রে, গোলাপ?"

কান্নায় ভেঙে পড়ে মাটিতে বসে পড়ে রঘুনাথ। — "আমার এত আশায় তুই এভাবে ছাই দিলি?" কিছুক্ষণ মাটিতে বসে মাথায় একটা হাত দিয়ে স্থির হয়ে রইল সে। তারপর চোখ মুছে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো রঘুনাথ। খুব ধীর আর সংযত গলায় সে বলে— "তুই যার বাচ্চা পেটে ধরেছিস — তার সঙ্গেই চলে য়া গুলাবী। আমি চলে যাচ্ছি। কাকা, আপনি ওকে নিয়ে যান আপনার সঙ্গে। আমি আজ এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টাকাপয়সা সব ওর নামেই এখানকার ব্যাঙ্কে রাখা আছে। ওকে বলুন, তুলে নিয়ে চলে যাক। ও টাকা আমি ছোঁবো না। সে প্রবৃত্তি আমার হবে না। আমি ভুলে যাইনি আমার বাবার নাম সুরেশ যাদব। আপনারা থাকুন, কাকা। আমায়

BanglaBook.org

যেতে দিন।"

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদছিল গুলাবী। রঘু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গুলাবী তাকে আটকালো না। শুধু কেঁদেই চলেছে সে।

—"তুই থাক। আমি কাল এসে তোকে নিয়ে যাব। এভাবে এক্ষুনি তো কিছু করা যায় না। সময় লাগে সবের। আমি যাচ্ছি। কাল আসবো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চিরঞ্জিলাল। তবু ঐ একই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল গুলাবী। কার কাছে যাবে সে? পাশের বাড়ীতে ফিরদৌস বেরিয়ে গেছে। ওর মা জুবেদাও বোধহয় চান করতে চলে গেছে গঙ্গায়। বাড়ীতে এখন একা গুলাবী। এভাবে বেঁচে থাকবে সে কার জন্যে? বাবা দশরথ? স্বামী রঘুনাথ? তার নিজের পেটের শিশুটা — কার জন্যে বেঁচে থাকবে সে? মাথার মধ্যে আর কোনো চিন্তা তার আসে না। ধীরে ধীরে ঘরের তাকটার দিকে এগিয়ে যায় গুলাবী। গতকালই পোকা-মাকড় মারার জন্যে এক কৌটো বিষ ওষুধ এনে রেখেছে রঘু। জানে গুলাবী। একটা কাগজ হাতের কাছে পেলো সে। পেরেকে টাঙানো রঘুর সার্টটার পকেটে একটা কলমও রয়েছে। কাগজ কলমটা নিয়ে সে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখলো— "আমার মৃত্যুর জন্যে যদি কারো হাত থাকে, তবে তা ঠাকুর চিরঞ্জিলাল চৌধুরীর।" নীচে নিজের নামটা লিখলো গুলাবী। তারপর পুরো কৌটোটা খুলে মুখের মধ্যে ঢেলে দিল সে।

নদী থেকে চান সেরে একটু দেরীতে ঘরে ফিরেছে জুবেদা। পটের ছবিগুলো নিয়ে শহরের দোকানে দিতে গেছে ফিরদৌস। ফিরতে বেলা হবে বলে গেছে সে। ছেলে ফিরলে মা আর ছেলে একসঙ্গে খেতে বসবে। রোজই তাই করে ওরা। ভেজা কাপড়গুলো উঠোনে মেলে দিয়ে একবার গুলাবীর খোঁজ করতে এলো জুবেদা। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে বাইরে থেকে বার কয়েক গুলাবীর নাম ধরে ডাকলো সে। কোনো সাড়া নেই গুলাবীর। এমন সময়ে কি ঘুমাচ্ছে মেয়েটা? আরো ক'বার ডাকলো জুবেদা। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিলো সে। না, কোনো সাড়া নেই। জুবেদার ডাকাডাকিতে তাদের পাশের ঘরের একটা বৌ বেরিয়ে এসে দেখছে। কৈফিয়তের সুরে জুবেদা তাকে বললো— "কচি বৌটা একা থাকে। শরীর ভাল নেই। কে জানে আবার কি হলো!"

পাশের বাড়ীর বৌয়ের একটা বছর দশ-বারোর ছেলে আছে। সে

BanglaBook.org

বললো— "কাকী, আমি দেখছি ওপাশের জানলা দিয়ে।" চলে গেল ছেলেটা। বাড়ীর পাঁচিলে উঠে চেষ্টা করলো ভিতরে দেখার।

—"দিদি মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে, কাকী! মুখ দিয়ে গাঁজলা বের হচ্ছে।" চিৎকার করে বললো ছেলেটা। সকলে মিলে জোর করে দরজার খিল ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলো— তখন আর কোনো জ্ঞান নেই গুলাবীর।

ততক্ষণে লোক জমা হয়ে গেছে গুলাবীদের ঘরে। পাড়ার দোকানদারদের কজন এসে গেছে। কি ভাগ্য, ফিরদৌসও সেই সময়ে ফিরে এসেছে বাড়ীতে। ঘরে ঢুকে সকলকে একটু সরিয়ে দিয়ে সে ঝুঁকে পড়লো গুলাবীর দিকে।

—"বোধহয় বিষ খেয়েছে। কেউ একজন একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করো, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।" একজন ছুটলো গাড়ীর খোঁজে। ফিরদৌস গুলাবীকে বড় যত্নে পাঁজাকোলা করে খাটে শুইয়ে দিল। ততক্ষণে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁদছে জুবেদা।

গাড়ী এলে আবার গুলাবীকে কোলে করে গাড়ীতে নিয়ে তুললো ফিরদৌস। তার সঙ্গে আরো জনা চারেক যুবক উঠে বসলো গাড়ীতে। ড্রাইভারকে হাতের ইশারা করে ফিরদৌস বললো— "হাসপাতাল, জলদি।"

হাসপাতালে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে সুস্থ হয়েছে গুলাবী। সে প্রাণে বেঁচেছে বটে, কিন্তু পেটের বাচ্চাটাকে বাঁচানো যায়নি। হাসপাতালে যাওয়া আসা, ওষুধ পত্র সমস্তই এনে দিয়েছে ফিরদৌস। এই তিন সপ্তাহে একদিনের জন্যেও রঘু এখানে আসেনি। এমন কি, চিরঞ্জিলালও নয়। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরার পরে গুলাবীর ঘরে শুতো জুবেদা। একা মেয়েটাকে ছাড়তে পারেনি সে।

দিন পড়ে থাকে না। মাঝে কেটে গেছে চার মাস। গুলাবী মুন্সে রেই রয়ে গেছে। বাবার কাছে গ্রামে ফিরে যায়নি সে, হয়তো আর কোনোদিন যাবেও না। এর মধ্যে চিরঞ্জিলালের সঙ্গেও তার আর যোগাযোগ হয়নি। চিরঞ্জি দুদিন বাদে আবার আসবে বলে চলে গিয়েও গত চার মাসে সে আর আসেনি। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু করে টাকা তুলে সংসার চালাচ্ছে গুলাবী। প্রথম প্রথম কিছু দিন সে আশায় আশায় ছিল— যদি রঘু ফিরে আসে। কিন্তু এখন সে ক্রমেই বুঝতে পারছে — তার এতবড় পতন হয়তো কোনোদিনই রঘু ক্ষমা করতে পারবে না। গুলাবীর মতো বয়সের একটা তরুণীকে নিয়ে খানিকটা সমস্যায় পড়ে গেছে জুবেদা।

শেষে আরো একমাস কেটে যাবার পর জুবেদাই একদিন বললো

BanglaBook.org

গুলাবীকে— "এ ভাবে আর কতদিন তুই রঘুর অপেক্ষায় দিন কাটাবি, গুলাব? সে হয়তো আর কোনোদিনই আসবে না। হয়তো সে তোকে ভুলেই যেতে চাইছে। কিন্তু তোর জীবন কি ভাবে কাটবে? তুই ইচ্ছে হলে ফিরদৌসকে বিয়ে করতে পারিস। কথাটা ভেবে দেখ। ফিরদৌসও তো তোকে ভালো চোখে দেখে। আমি বললে সে 'না' করবে না।"

নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গুলাবী জুবেদার দিকে। তারপর বললো— "কাকী, আর কটা দিন দেখি। মানুষ তো বদলায়ও। যদি হঠাৎ কখনো রঘু এসে .....।" আর বলতে পারে না গুলাবী। জুবেদার বুকে মুখ গুঁজে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে সে। জুবেদা পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলো।

ফিরদৌস একবার চেষ্টা করেছিল— কোনোভাবে যদি গুলাবীর বাবা অথবা চিরঞ্জিলালের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু গুলাবী ওকে তাদের কোনো ঠিকানাই দিতে চায়নি। শেষে ফিরদৌস একদিন তাকে একা পেয়ে বললো— "তুই যখন ফিরেই যাবি না গুলাবী, তখন আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যা। আবার তোর ঘর সংসার, স্বামী সন্তান— সব হবে। কারো জন্যে পথ চেয়ে সারা জীবন কেউ বসে থাকতে পারে না। আর, তা হওয়াও উচিত নয়। রঘু যদি ফিরে আসার হতো, তবে এই ছ'মাসে সে আসতো। তুই মিছেই অপেক্ষায় বসে আছিস গুলাবী।"

শেষ পর্যন্ত 'না' বলতে পারেনি গুলাবী। মসজিদে গিয়ে প্রথমে তাকে মুসলমান হতে হয়েছে। নাম হয়েছে নাসরিন বিবি। তারপর একদিন সে নিজের ঘর ছেড়ে পাশের বাড়ী ফিরদৌসের ঘরে বৌ হয়ে এলো। সেদিন জুবেদার কি আনন্দ। মন ভরে গেছে ফিরদৌসেরও।

কিন্তু গুলাবী? বিয়ের প্রথম রাতটায় সে কিছুতেই ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি ফিরদৌসের সঙ্গে। বলেছিল —"আজকের রাতটা তুমি আমাকে নিজের মতো থাকতে দাও, ফিরদৌস। কাল থেকে আমি তোমার।

BanglaBook.org

।। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

এত কাণ্ড ঘটে যাবার পরেও কিন্তু চিরঞ্জিলাল সম্পূর্ণ নীরব রয়েছে। মুঙ্গের থেকে ফিরে সে একবার ভেবেছিল— রঘুর কাছ থেকে গুলাবীকে নিয়ে সে

চলে আসবে। কিন্তু সাহস হয়নি তার শেষ পর্যন্ত। চিরঞ্জি জানে, কালীমন্দিরের ঘটনার কিছু রঘুর জানা নেই। কিন্তু গুলাবী বা দশরথ সবই জানে। এদের ঘাঁটালে বিপদ চিরঞ্জির নিজেরই। শেষ পর্যন্ত যদি ওদের সঙ্গে চিরঞ্জি নিজেও ধরা পড়ে যায়— তবে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পাবে না সে নিজেও।

বাড়ী ফিরে এসে মিথ্যা করে সে সাবিত্রীকে বলেছিল —"গুলাবীর বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল রে, সাবি! আমাদের ভাগ্যে ছেলে বোধহয় আর লেখা নেই। নইলে এমন হবে কেন? ওসব তুই ভুলে যা, সাবি। আমিও ভুলে যাব। তোকে আর কষ্ট দিতে প্রাণ চায় না। মিথ্যে মায়ার পিছনে আর ছুটে লাভ নেই।"

ভারী একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে এসেছিল চিরঞ্জির বুক ফেটে। সারা জীবন যেমন নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে নিজের ভাগ্যকে— আজও সাবিত্রী তাই মেনে নিল। না মেনে নিয়ে তো উপায়ও কিছু নেই তার। গুলাবী চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে জানে না সে। গুলাবীর বিয়ে হয়ে গেছে রঘুনাথের সঙ্গে। সে এখন পরস্ত্রী। তার প্রতি চিরঞ্জির মোহ বোধহয় আর নেই। সুতরাং নিজের জীবন সম্পর্কে এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সাবিত্রী। সে তো এই রকমই কিছু একটা চেয়েছিল। সেটা সে পেয়েছে। সাবিত্রী নিজেকে নিয়ে আর কিছু ভাবে না, ভাববেও না।

গুলাবীর বাপের বাড়ীর কেউও আর আসে না তাদের বাড়ীতে। আগে দশরথ চৌধুরী হাভেলির পুজো পার্বণে কাজ করে দিত। কিন্তু গুলাবী উধাও হয়ে যাবার পরে দশরথও অনেকখানি ভেঙে পড়েছে। গুলাবী আদৌ বেঁচে আছে কিনা— জানে না সে। চৌধুরী কর্তা তার জন্যে যে জমিজমা লিখে দিয়েছে সেই জমি আর জমা টাকার সুদে তার ভালই চলে যায়। এখন আর যজমান বাড়ী গিয়ে গিয়ে তাকে পুজো করে আসতে হয় না।

কিন্তু বিপদ অন্যভাবে আসে। কোশি নদীর মজে যাওয়া খাঁড়ির জল বালি সরে গিয়ে একটা শিশুর খণ্ডিত দেহের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছিল। কুকুরে সেটা টেনে এনেছে বাইরে। মাথাটা নেই। পুলিশ এসে বাচ্চার লাশটা নিয়ে গেছে। একটি স্ত্রী-শিশুর দেহ। আশে পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে বাচ্চাটার মাথাটা আর তার জামাকাপড়। তিত্‌লি নিখোঁজ হবার পরে পুলিশে একটা ডায়েরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তখন কোনো কিনারা হয়নি। এতদিন পরে একটা কঙ্কাল এবং জামা উদ্ধার হবার পরে পুলিশ বা ফুলমোতিয়াদের আর সন্দেহ নেই যে, দেহটা তিত্‌লিরই। মুণ্ডুটা ধারালো

BanglaBook.org

অস্ত্র দিয়ে এক কোপে কাটা হয়েছে— দেখে বোঝা যায়। তবে কি শিশু বলি হয়েছিল ঐ রাত্রে? সে রাতটা ছিল অমাবস্যার। কাছে পিঠে নির্জন একটা কালী মন্দির। মন্দিরের সেবাইত আবার তিত্‌লিদেরই প্রতিবেশী। ঐ সময়ের পর থেকেই সেবাইত দশরথের এত বাড়বাড়ন্ত। কিভাবে হলো? তবে সে কি কোনো ধনী দাতার কল্যাণের জন্যে তিত্‌লিকে চুরি করে দেবীর সামনে বলি দিয়েছিল?

পুলিশ সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছে দশরথকে। ঐ গ্রামে ধনী বলতে চৌধুরী চিরঞ্জিলালই প্রধান। তার সঙ্গে যাওয়া আসা আছে দশরথের পরিবারের। দুই আর দুইয়ে চার করে তদন্তে এগোতে থাকে পুলিশ। আরো তদন্ত করতে করতে ধরা পড়ে চিরঞ্জিলাল। পুলিশের চাপে নতি স্বীকার করে সে বলে দেয় সব। প্রথমটায় সে গুলাবীর কোনো সন্ধান জানে না বলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিরঞ্জি গুলাবীর মুঙ্গেরের ঠিকানা জানিয়ে দেয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ধরে আনে গুলাবীকে— যার এখন নতুন নাম নাসরিন বিবি। সন্দেহ থেকে শুধু বাদ হয়ে গেছে রঘুনাথ যাদব। তাছাড়া, তার কোনো উদ্দেশও নেই। জামিন পায়নি কেউই।

আরারিয়ার মহকুমা আদালত থেকে মামলা গত পাঁচ মাসে গড়িয়েছে পূর্ণিয়ার জেলা আদালতে। দুই জায়গায়ই বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে নাসরিন বিবি আর দশরথের। যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে চিরঞ্জির। ষড়যন্ত্র আর হত্যার প্রমাণ লোপে সহায়তা, হত্যার কাজে সহযোগিতা করা— এসবের জন্যে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। প্রাণদণ্ড নয়।

হাইকোর্টে আপীল করেছে নাসরিনের হয়ে তার আইনজীবী বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। সমস্ত অর্থ জোগাচ্ছে ফিরদৌস। বার বার জেল হাজতে গিয়ে সে দেখা করতে চেয়েছে নাসরিনের সঙ্গে। কিন্তু নাসরিন একটা কথাও কখনো বলেনি তার সঙ্গে।

হাইকোর্টের শুনানীও শেষ হয়ে গেছে। আজ তার রায় দেবার দিন। আজই নির্ভর করবে নাসরিনের জীবন মরণ। যদিও জীবন লাভের মতো এমন অসম্ভব স্বপ্ন কারোরই নেই। হয়তো বা নাসরিনের নিজেরও। জেল হাজত থেকে বন্দীদের তোলা হয়ে গেছে। এখন সোজা পাটনা হাইকোর্ট।

গাড়ি পৌঁছে গেছে হাইকোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে। পাটনা হাইকোর্টের চওড়া গেটটার মধ্যে দিয়ে জেলের পুলিশ ভ্যানটা ঢুকলো। তারিখটা মনে রেখে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই স্থানীয় নারী অধিকার রক্ষা কমিটির'

BanglaBook.org

প্রায় শ'দুই সদস্যা জমায়েত হয়েছিল কোর্ট চত্বরে। বিচারাধীন কয়েদীদের নিয়ে কখন গাড়ী ঢুকবে— সেই অপেক্ষায় ছিল জনতা।

সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরম। বেলা দশটা বাজবার আগেই মাথার ওপর খর সূর্য। কিন্তু জনতার আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। দূর দূর জায়গা থেকে আসা মানুষ ঘিরে রেখেছে কোর্ট চত্বর। কাছেপিঠে ঠাণ্ডা সরবতের দোকানগুলোয় ভিড় থিক্‌থিক্ করছে। দু'আনার সরবৎ অনায়াসেই বেশী বরফ দিয়ে তিন আনা চার আনায় বিকোচ্ছে। নেত্রীস্থানীয়া একজন মহিলা ততক্ষণে উঠে পড়েছেন একটি জিপ গাড়ীর ওপরে। বিনা মাইকে চিৎকার করে সমবেত মহিলা জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন— "তোমরা সকলে আমার সাথে প্রতিবাদ করো। আসামী নাসরিনকে জজসাহেব যেন ফাঁসির সাজা দেন। ঐ মেয়েটা খুনী। জঘন্য অপরাধ করেছে। সমস্ত নারীসমাজকে, সমস্ত মায়েদের মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ও। ঐ কলঙ্কিনী, ভ্রষ্টা নাসরিনকে আমরা কেউ ক্ষমা করবো না।"

জ্বালাময়ী ভাষণে ততক্ষণে উদ্বেল জনতা। অনেক পুরুষও ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে মেয়েদের আশেপাশে। কয়েকটা কনস্টেবল লাঠি হাতে তৈরী হয়ে আছে, যে কোনো অবস্থাকে সামাল দেবার জন্যে। আপাতত তারাও লাঠি মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে হাঁ করে শুনছে উত্তেজিত ভাষণ।

পুলিশ ভ্যানটা গেট দিয়ে ঢোকামাত্রই কেমন করে যেন খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল বাতাসে। ভাষণ শোনা ছেড়ে রেখে মহিলাদের দল ছুটে এসে ঘিরে ধরেছে ভ্যানটিকে। এতক্ষণে সচল হয়েছে কনস্টেবলরাও। লাঠি উঁচিয়ে তারা ছুটে এসেছে ভ্যানের জন্য রাস্তা করে দিতে। পুলিশ আর মহিলাদের খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে কোনো রকমে গাড়ীটা কোর্ট বিল্ডিং—এর পিছনের দিকে চলে গেল— যেখান দিয়ে এজলাসের পিছনের ঘরে বন্দীদের জন্য অস্থায়ী অপেক্ষার জায়গায় যাওয়া যায়। কিছু উৎসাহী মানুষ চত্বর থেকে সংগ্রহ করা ইঁট পাটকেল তুলে ছুঁড়ে মারলো গাড়ীটার দিকে। পুলিশ তাদের পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। এরই মধ্যে বন্দীরা নামছে ভ্যানের দরজা খুলে। লাঠি হাতে হাতে ধরে জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে পুলিশ। দু'তিনজন বন্দী নেমে যাওয়ার পরে নামলো নাসরিন। আঁচলটা দিয়ে মাথা মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা। সঙ্গে একজন নারী পুলিশ। নাসরিনকে নামতে দেখে জনতা আরো উদ্বেল। চিৎকার হচ্ছে— "ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। বিচার আমরা করবো।" কেউ বলছে — "দেবীর সামনে হাড়কাঠে ওকেও বলি দাও, তবেই এর বিচার

BanglaBook.org

হবে।" সমস্ত জায়গাটা ততক্ষণে যেন এক অদ্ভুত অস্থিরতা, হিংসা আর ঘৃণার বাতাবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মাথার ওপর খর সূর্য, বাতাসে তপ্ত গুমোট ভাব— কিছুই যেন আর কারো স্মরণে নেই। শুধু প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর প্রতিহিংসা।

বন্দীদের ভিতরে নিয়ে যাবার পরও বেশ অনেকক্ষণ ধরে বাইরে চত্বরে চলতে থাকলো ভাষণ, প্রতিভাষণ। পুলিশ চেষ্টা করছে বিক্ষোভকারীদের কোর্ট চত্বর থেকে সরিয়ে দিতে।

বেলা এগারোটা বাজতেই এজলাসে উপস্থিত হয়ে গেছেন বিচারক। কোর্ট ঘর আগে থেকেই প্রায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মাথার ওপর দীর্ঘ দণ্ডে ঝোলানো দুই ব্লেডের কালো কালো পাখাগুলো আপ্রাণ ঘুরেও দূর করতে পারছে না ঘরের তপ্ত আবহাওয়াকে। এজলাসের ঠিক নীচে সারি সারি আসনে ভিড় করে আছেন আইনজীবীর দল। তাঁদের পরিধানে কালো গাউন, হাতে গোছা গোছা কাগজ। সকলেই একটু উত্তেজিত। ভিতর থেকে সম্পূর্ণ না হলেও অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বাইরের উত্তেজিত কলকণ্ঠের।

বিচারকের নির্দেশে আসামীদের হাজির করা হয়েছে কাঠগড়ায়। অন্যদের সাথে নাসরিনও হাজির সেখানে। নাসরিনের পরনে ছাপা একটা সুতির শাড়ী। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। মাথা নীচু করে সে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ার কাঠের রেলিংটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে।

ঘোমটার মধ্যে থেকেই সে একনজর দেখে নিতে চেষ্টা করে দর্শকাসনে উপবিষ্ট মানুষগুলোকে। না, যাকে সে আশা করেছিল সে আসেনি। এসেছে শাশুড়ী জুবেদা বেগম আর স্বামী ফিরদৌস। ছেলের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বসে আছে জুবেদা বেগম। উভয়েরই নীরব দর্শকের ভূমিকা।

মনটা একটা অস্বাভাবিক শূন্যতায় ভরে রয়েছে নাসরিনের। জেল থেকে হাইকোর্টে আসার সময়টুকু যেন তার কাছে এক অনন্তকাল। সেই কালটুকু যেন এই মুহূর্তে এসে ঠেকেছে সময়ের পাত্রের তলানীতে। এদিকে কোনো পাখা নেই। অসহ্য গরম। ঘোমটার মধ্যেই দরদর করে ঘাম গড়িয়ে নামছে তার মুখ বেয়ে, কণ্ঠ বেয়ে, দুই বাহুর অনাবৃত অংশ বেয়ে। আঁচল দিয়ে ভিতরটা একবার মুছে নেয় নাসরিন। কতক্ষণে বিচার শুরু হবে? নিম্ন আদালতে তার অপরাধ নিয়ে যেসব কথা দিনের পর দিন হয়েছিল— আবারো কি সেই সব কথা হবে এখানে? এতদিনে নাসরিন নিজেও বুঝে গেছে যে,

BanglaBook.org

তার অপরাধের যা মাত্রা— তাতে তার পুরনো দণ্ডই হয়তো আজ এখানেও বহাল থাকবে। আজ তার সাজা ঘোষণার দিন। যা হয় হয়ে যাক। আর পারছে না নাসরিন। ঘটনা ঘটেছিল ৩রা অক্টোবর, ১৯৫০ সালে। আজ ১৯৫১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। গত পাঁচ মাস তার কেটেছে পাটনা সেন্ট্রাল জেল আর পূর্ণিয়ার জেল হাজতে। এই ক'মাস মাঝে মাঝে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরদৌস এসে দেখা করেছে তার সঙ্গে। বেশীরভাগ সময়েই নীরব থেকেছে নাসরিন। ফিরদৌস দুহাতে নাসরিনের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলেছে— "কেন তুই এ কাজ করেছিলি, নাসরিন? তোর কি একবারও তার মায়ের কথা মনে পড়েনি? টাকার জন্য তুই এতবড় একটা পাপের কাজ করলি?"

দু' চোখে অঝোর ধারা নামতো ফিরদৌসের। কিন্তু কঠিন, উদাস দৃষ্টি মেলে নীরবে দূরের জেল পাঁচিলের দিকে চেয়ে থাকতো নাসরিন। কেন যে এ কাজে সে নামলো— তা জানতো শুধু একজন। কিন্তু সে-ও তো আর তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। নিম্ন আদালতে সে তো একদিনও আসেনি। যা কিছু করেছে এই ফিরদৌস। গাঁয়ের জমিজমা সব বিক্রি করে, মায়ের সামান্য সোনাদানা বিক্রি করে মামলা চালিয়ে গেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রক্ষা হলো না। আজ উচ্চ আদালতে দণ্ডাদেশ দানের দিন। মাকে সঙ্গে করে এখানে এসেছে ফিরদৌস।

সরকারী আইনজীবী মুখবন্ধ হিসাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। চোখা চোখা বাক্যবাণের শেষে বলতে ভুল করলেন না যে, এই আসামী যে জঘন্য অপরাধ করেছে তার জন্য মহামান্য আদালত যেন এতটুকু ক্ষমা প্রদর্শন না করেন। নিম্ন আদালতের রায়কেই যেন এখানেও বহাল রাখা হয়, যা দেখে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন অপরাধ করতে সাহস না পায়।

পাবলিক প্রসিকিউটারের বক্তব্য শেষ হয়েছে। এবার নিজের বক্তব্য শুরু করলেন প্রধান বিচারপতি। বত্রিশ পৃষ্ঠার রায়ের শেষে তিনি আসামীকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দণ্ডাদেশ শোনার জন্য বললেন।

উঠে দাঁড়ালো নাসরিন। মুখের অবগুণ্ঠন বিন্দুমাত্র অনাবৃত না করে কম্পিত হৃদয় নিয়ে বিচারপতির দণ্ডাদেশ শ্রবণ করলো সে। মাঝে মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। আদালত কক্ষের অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করে ঘুরে চলেছে দুই ব্লেডের কালো কালো পাখাগুলো। আরো শক্ত হাতে ছেলের হাতখানা জড়িয়ে ধরে জুবেদা বেগম। বিচারকের কণ্ঠস্বর আদালতের এজলাসের পিছনে টাঙানো দেওয়াল ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যায়— "মহামান্য

BanglaBook.org

জুরিগণের পরামর্শে আমি আসামী নাসরিন বিবিকে তিতলি হত্যাকাণ্ডে প্রধান অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করলাম। এই নিষ্ঠুর, অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ড স্থির মস্তিষ্কে ঘটানোর জন্য এই আদালত তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছে। তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রাণ যায়।"

দণ্ডাদেশ শুনে থরথর করে কাঁপতে থাকে নাসরিন। তারপর কাঠগড়ার মধ্যেকার বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়ে সে। দর্শকাসনে বসে থাকা জনা কয়েক দর্শক বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। শুধু অঝোর ধার অশ্রু নিয়ে মায়ের কাঁধের ওপর মাথা রাখে ফিরদৌস। কিন্তু ততক্ষণে নাসরিনকে হাতকড়া পরিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুজন নারী পুলিশ ও দুজন পুরুষ কনস্টেবল। পিছনে একবারও ফিরে তাকালো না নাসরিন। সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফিরদৌস। ততক্ষণে আদালত কক্ষ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। ছেলের হাতটা ধরে এই প্রথম কথা বললো জুবেদা বেগম— "চল্ ফিরদৌস এই বোধহয় ভালো হলো। আল্লা ওর সব অপরাধ মাফ করে দেবেন। পরের জন্মে ও খাঁটি সোনা হয়ে আবার তোর কাছে ফিরে আসবে। আমি জানি।"

।। ষড়বিংশ অধ্যায় ।।

রাতের ঘুম চলে গেছে ফিরদৌসের। দিন রাত শুধু তার এক চিন্তা— কেমন করে নাসরিনকে সে বাঁচাবে। আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করেছে সে। কিন্তু সেখানেও কোনো আশার আলো দেখতে পায়নি ফিরদৌস। নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালত — দুই জায়গাতেই নিজের অপরাধ কবুল করেছে নাসরিন। এরপর আর উচ্চতর কোনো আদালতে যাবার প্রশ্নই থাকতে পারে না। একথা আইনজীবীরা জানিয়ে দিয়েছেন। তবু কিছুতেই যেন হাল ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না ফিরদৌসের।

নাসরিনের দণ্ডাদেশের পরের দিনই জেল হাজতে গিয়ে তার সাথে দেখা করলো ফিরদৌস। সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে জালে ঢাকা জানালার ওপারে নীরবে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে নাসরিন। জালের ওপাশে রাখা তার হাতে এপাশ থেকে হাত রেখে কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে ফিরদৌস— "এ তুই কি করলি, নাসরিন? আমাকে একটা সুযোগও তুই দিলি না তোকে বাঁচানোর? উকিলবাবুরা বলেছেন, আর কিছু করার

BanglaBook.org

নেই; কিন্তু আমার মন বলছে, আর একবার যদি তুই জজসাহেবদের বলিস যে, এ খুন তোর ইচ্ছাতে হয়নি— তোকে নেশায় আচ্ছন্ন করে অন্য লোকে করিয়েছে, তাহলে হয়তো তোকে ওরা ছেড়ে দেবে! নাসরিন তুই একবার বল, নাসরিন একবার বল।"

—"যে ভাবেই হোক, যাদের ইচ্ছাতেই হোক, তিত্‌লিকে যে আমিই মেরেছি— একথা তো মিথ্যে নয়, ফিরদৌস? সেই পাপেই আমি আমার বাচ্চাকে হারিয়েছি— সেটাও তো মিথ্যে নয়। এজন্য সাজা তো আমায় পেতেই হবে ফিরদৌস।"

এতদিনের মধ্যে এই প্রথমবার একসঙ্গে এতগুলো কথা বললো নাসরিন। তার পরণে জেলখানার সাদা জমিতে চওড়া কালো ডুরে শাড়ী। মাথায় ঘোমটার আবরণ নেই। অবিন্যস্ত তৈলহীন কেশ, কোটরগত চক্ষু বেষ্টন করে ক্লান্তির কালিমা, ফিরদৌসের হৃদয়টা যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল নাসরিনের জন্যে।

—"কিন্তু আমার কথাও কি তোর একবারের জন্যেও মনে পড়ে না, নাসরিন? সারা জীবন নিজেকে আমি কি বোঝাবো? আমার যে আর কেউ রইল না রে।" আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে ফিরদৌস। নাসরিনের ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের একটা হাত সে ফিরদৌসের মাথার ওপর রাখে। কিন্তু মাঝে থেকে যাওয়া লোহার জালের একটা ব্যবধান আজ দুজনের দুটি জগতের মাঝখানে এক দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে।

—"মা কেমন আছে, ফিরদৌস?" আবেগহীন, শীতল কণ্ঠস্বর নাসরিনের। —"মাকে বোলো, মা যেন আমায় ক্ষমা করে দেয়। সকলের কাছে আজ আমি দোষী। ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই।" ধীরে ধীরে বলে নাসরিন।

—"মা তোর জন্যে আর কাঁদে না রে নাসরিন। মায়ের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লার নাম করে রাতদিন। বলে— আল্লা তোকে পরের জন্মে খাঁটি সোনা করে পাঠাবে আমার কাছে। কিন্তু সে তো পরের জন্মে! এই জন্মে আমি কি নিয়ে থাকবো রে? মা-টা মরে গেলে আমার আর কে থাকবে? তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল আমার!" কান্না, কান্না আর কান্না। শুধু কান্নাতেই বারবার যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে ফিরদৌস। ফিরদৌস শিল্পী, ফিরদৌস গায়ক— সাধারণ আর পাঁচটা মুসলমান যুবকের মতো সে নয়। নিজের আবেগকে সামলাতে পারে না সে। শিশুর সরলতায়

BanglaBook.org

কাতর আকুতিতে বড় সহজেই ভেঙে যায় ফিরদৌস।

সহসা কি যেন হয় নাসরিনের। জালের ওপার থেকে মুখটাকে সে নুইয়ে আনে প্রায় ফিরদৌসের কানের কাছে। অস্ফুটে কি যেন বলতে চায় সে। ফিরদৌস জিজ্ঞাসা করে— "কিছু বলবি, নাসরিন? কি বলতে চাস, আমাকে বল্ নাসরিন; আমি আর থাকতে পারছি না.....।"

—"আমি বোধহয় আবার বাচ্চার মা হতে চলেছি, ফিরদৌস। তোমার বাচ্চার মা! নিজের শরীর দিয়ে মনে হচ্ছে কদিন ধরে।" প্রায় ফিসফিস করে ফিরদৌসের কানের কাছে মুখ এনে জালের ওপার থেকে বললো নাসরিন।

—"কি বলছিস তুই? সত্যি? আবার তুই বাচ্চার মা হতে চলেছিস? বল্, বল্ নাসরিন! এ যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" অধীরতা ছড়িয়ে পড়ে ফিরদৌসের কণ্ঠে, সর্ব শরীরে।

—"হ্যাঁ, ঠিক সেবার যেমন হয়েছিল— তেমনি।" কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত শীতলতা নাসরিনের। যেন কিছুই হয়নি, যেন নতুন করে কিছু ভাববারই নেই এতে। শুধুমাত্র স্বামীকে এই সাধারণ সংবাদটুকু পরিবেশনই যথেষ্ট।

—"কিন্তু তোর যে সাজা হয়ে গেছে, নাসরিন! ও বাচ্চাকে তুই জন্ম দিবি কি করে?" পাগলের মতো স্বরে প্রশ্ন করে অস্থির ফিরদৌস। "আচ্ছা, এই কথাটা জজ সাহেবদের বললে তারা তোকে ছেড়ে দেবে না রে, নাসরিন? আমি যদি বলি? জেলের ডাক্তারবাবুরা যদি বলেন— তবু ওরা তোকে ছেড়ে দেবে না? একটা মাকে ওরা ফাঁসি দেবে? তাই কি কখনো হতে পারে? নাসরিন রে, আমি এক্ষুনি গিয়ে বলছি জেলার সাহেবকে। হাতে পায়ে ধরবো বলবো— আপনাদের ডাক্তারবাবুকে দিয়ে আমার বিবিকে পরীক্ষা করান— ও মা হতে চলেছে.....।"

প্রায় ছুটে যেতে চাইছিল ফিরদৌস। নাসরিন ওকে বলে— "এই কারণে সত্যিই যদি আমার বাচ্চাকে ওরা জন্মাতে দেয়— তবে চেষ্টা করতে পারো ফিরদৌস। উকিলবাবু বোধহয় ভাল করে বুদ্ধি দিতে পারবে।"

নাসরিনের বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হয় ফিরদৌস। অবাক চোখে কিছুক্ষণ সে চেয়ে থাকে বিবির মুখের দিকে। তারপর চোখ মুছে বলে— "তুই ঠিকই বলেছিস, নাসরিন। আমি আজই তোর উকিলবাবুর কাছে আবার যাবো। সব কথা বলবো। তারপর যা হয় হবে।"

সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। একজন পুলিশ কর্মী এসে নিয়ে গেল ফিরদৌসকে। বাঁকের ওপারে সে মিলিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত জালের কাছ

BanglaBook.org

থেকে এক চুলও সরলো না নাসরিন। কুঠুরীটার মধ্যে আলো কমে এসেছে। আলো জ্বালিয়ে দিতে কেউ আসেনি। সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষটির মধ্যে জালটার ওপরে দুটি হাতের পাতা রেখে অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে রইল নাসরিন।

ছেলের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে ব্যস্ত হচ্ছিল জুবেদা বেগম। পাটনা সেন্ট্রাল জেলে আরো যতদিন থাকবে নাসরিন— ততদিন জুবেদা আর ফিরদৌসও থাকবে পাটনাতে। সেই রকম ব্যবস্থাই করেছে ছেলে। মাঝে মাঝে তাহলে চোখের দেখাটা তো হতে পারবে। জুবেদা বেগম ছেলের মনের কথা বোঝে। ফিরদৌসের মা সে, ছেলের সমস্ত মন প্রাণ তার কাছে বইয়ের পড়া পৃষ্ঠার মতো। সে জানে, নাসরিনের ফাঁসি হয়ে গেলে বোধহয় আর ধরে রাখা যাবে না ফিরদৌসকে। ফিরদৌস প্রায়ই তাকে বলে— "জানিস আম্মা, নাসরিন চলে গেলে আমিও গলায় ফাঁস দেবো। তোর খুব কষ্ট হবে, জানি, কিন্তু আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো, বল্‌তো?"

—"আমার কথাটাও ভাববি না, ফিরদৌস? তুই ছাড়া আমারই বা আর আছে কে? আমাকে তুই কার কাছে রেখে যাবি রে?" ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে জুবেদা বেগম।

বেশ রাত করে ঘরে এলো ফিরদৌস। অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে একা বসে ছিল জুবেদা। গলির মধ্যে একটা একতলা পুরানো বাড়ীর একখানা ঘর নিয়েছে ফিরদৌস। কেন তারা এখানে থাকবে, কতদিনের জন্যে থাকবে— এসব কোনো কথাই সে বাড়ীওয়ালা বুড়ো আসগরকে বলেনি। বলেছে— মায়ের চিকিৎসার জন্যে এসেছে। দু'একমাস হয়তো থাকতে হবে, আবার বেশীও হতে পারে। বেশী কথার লোক নয় আসগর মিঞা। একা থাকে। নিজে রান্না করে খায়। নিজের ভাগের দু'কামরা বাড়ীর একখানা ভাড়া দিয়েছে। যে ভাড়াটে যতদিনই থাকুক— তার কিছু আসে যায় না তাতে। ঘরখানা তো এমনিই পড়ে থাকে। ভাড়াটে থাকলে ক'টা টাকা আসে। তাই ফিরদৌসদের ভাড়া দেওয়ার সময় আসগর কোনো প্রশ্ন করেনি। যতদিন এরা থাকবে— ততদিনের ভাড়া সময়মতো পেলেই হলো। ফিরদৌসও মামলা মকর্দমার বা নাসরিনের সাজার কথা কিছু তাকে বলেনি। বললে বুড়ো হয়তো তাকে ঘর ভাড়া দিতো কিনা সন্দেহ।

জানালা দিয়ে গলির মধ্যে কাউকে বিশেষ দেখা যায় না। লোক চলাচল যা কিছু বড় রাস্তা দিয়েই। কদাচিৎ গলির মধ্যে কাউকে দেখা যায়। একা

BanglaBook.org

বসে বসে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল জুবেদা বেগম। ফিরদৌস বলে গিয়েছিল জেলখানায় নাসরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু তার যে এত দেরী হবে— তা সে মাকে বলে যায়নি। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ— তার ওপর জেলখানা, ফাঁসির আসামী পুত্রবধূ। সব নিয়ে সর্বক্ষণই একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে জুবেদা। সাজার কোনো তারিখ এখনো তারা জানতে পারেনি। এভাবে একটা আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কত কাল মানুষ কাটাতে পারে? তাছাড়া নাসরিনের সাজা হয়ে যাবার পর ছেলেকে সে কেমন করে সামলাবে, কোথায় যাবে, কি করবে— তা কিছুই ভেবে পায় না সে।

রাতের রান্না কিছু করে না জুবেদা। গলির মুখের দোকান থেকে রুটি আর তরকা কিনে আনে ফিরদৌস। রান্না বলতে যা কিছু দুপুরেই। সুতরাং এই মুহূর্তেহাতে কোনো কাজ ছিল না জুবেদা বেগমের। ঘরের মধ্যে অসম্ভব গরম। ছাদের খাপরাগুলো এখনও তাপ ছড়াচ্ছে ভিতর দিকে। জিনিসপত্র বলতে কিছুই নেই। শোওয়ার জন্যে সামান্য ব্যবস্থা। কাপড়-চোপড় রাখার জন্যে একটা দড়ি ঘরের একদিকের দেওয়াল বরাবর টাঙানো। এক কোণে একটা স্টোভ, রান্না করার ও খাওয়ার জন্যে সামান্য কিছু বাসনের আয়োজন। ঘরে ইলেকট্রিক নেই। ফিরদৌস এলে লম্ফটা জ্বালাবে জুবেদা। গরমে তার কপালে ঘাম জমে আছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে জানলার ধারে ঠায় বসে রইল সে।

ঘরের জানালার কাছাকাছি আসতে ছেলেকে দেখতে পেয়ে দরজার কাছে উঠে এলো জুবেদা বেগম। দরজা খুলে প্রথমেই প্রশ্ন করে সে— "কি রে ফিরদৌস, এত রাত হলো?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর জুবেদার।

—"হ্যাঁ মা, তোকে অনেক কিছু বলার আছে। সে সব বড় গুরুতর, বড় ভাবনার। ঘরে আলো জ্বালাসনি যে? আগে আলোটা জ্বাল্, সব বলছি তারপর।" মায়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে মাথা মুখ মোছে ফিরদৌস। ও যেন বড়ই হয়নি, আজও ঠিক তেমনি মায়ের কোলের ছেলে হয়েই রয়েছে সে।

অন্ধকারে লম্ফটা হাতড়ে খুঁজে নিয়ে দেশলাই দিয়ে আলোটা জ্বালায় জুবেদা বেগম। তারপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে— "কি বড় ভাবনার কথা বলছিস্ রে, ফিরদৌস? কি এমন গুরুতর কথা তোর যে, এত দেরীতে বাড়ী আসতে হলো?"

—"জেলখানায় দেখা হয়েছে নাসরিনের সঙ্গে। ও বললো, তুই দাদি হতে চলেছিস, আমি বাপ।" হাঁফাতে হাঁফাতে বললো ফিরদৌস।

BanglaBook.org

—"ওমা! কি বলছিস তুই? কি হবে তাহলে, নাসরিনকে তবে ছেড়ে দেবে ওরা? বল্, ফিরদৌস বল্, এসব সত্যি?" আর যেন থাকতে পারছে না জুবেদা বেগম। মেঝের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে সে। ফিরদৌসও বসে পড়ে মায়ের পায়ের কাছে। —"সেই সব কথা বলার জন্যেই তো আমি নাসরিনের উকিলবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তাই তো এত দেরী হলো।" বললো ফিরদৌস।

—"কি বললো উকিলবাবু? এ কথা আদালতে বললে তারা নাসরিনকে ছেড়ে দেবে তো? তুই আমাকে উকিলবাবুর কাছে নিয়ে চল। তার সঙ্গে আমি নিজে জজসাহেবের বাড়ীতে যাব। তার দুটো পা ধরে বলবো— "হুজুর, আমার নাসরিনকে আপনি ছেড়ে দিন। নাহলে, ওর সঙ্গে আরো একটা প্রাণ চলে যাবে।"

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে জুবেদা বেগম। মায়ের মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে ফিরদৌস। বলে— "তাই হবে মা। কাল আবার উকিলবাবুর কাছে আমরা দুজনে যাব। যদি তিনি জজসাহেবের কাছে আমাদের নিয়ে যান, তবে আমরা তাঁকে এইসব কথা বলবো।"

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভবিষ্যতের মাঝে কোথায় যেন দূরে একটা আলোকরশ্মির ক্ষীণ জ্যোতি দেখতে পাচ্ছে জুবেদা বেগম। সত্যিই কি নাসরিন মা হতে চলেছে? সত্যিই কি একথা জানতে পারলে জজসাহেব তাকে ক্ষমা করে দেবেন? অতখানি ভাগ্য কি তাদের হবে? যে অনাগত পৌত্র অথবা পৌত্রী একদিন জুবেদা বেগমের ঘরে খেলে বেড়াতে পারতো— বাস্তবে সত্যিই কি সে কোনোদিন আসবে তার অপরাধী মায়ের কোলে? দেশে কি সত্যিই তেমন কোনো আইন নেই—যা একজন মাকে মার্জনা করতে পারে? অশিক্ষিতা জুবেদা বেগম জানে না এসব। এ বড় কূট কচালি আইনের। ফিরদৌসও জানে না। নাসরিনকে পেয়েও তার পাওয়া হলো না, পাওয়া হবে না। সন্তানসম্ভবা আসামী যদি বিচারকের কাছে ক্ষমা পায়— তবেই আবার ফিরদৌসের ঘর ভরবে। অনেক বেশী কিছু তো সে চায়নি। বিধবা মা, স্ত্রী আর একটি দুটি সন্তান নিয়ে ন্যূনতম স্বচ্ছলতার একটা সংসার চাওয়া কি তার পক্ষে খুব বেশী কিছু চাওয়া?

রাতে মা ছেলে কেউই কিছু খেলো না। একটা প্রচণ্ড আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব দুজনেরই ক্ষিদে ভুলিয়ে দিয়েছে। কাল ওরা উকিলবাবুর কাছে যাবে সকালে। কি বলবেন, কি করবেন তিনি— কিছুই জানে না ওরা। এভাবে

BanglaBook.org

কাউকে সঙ্গে নিয়ে সত্যিই কোনো জজসাহেবের বাড়ীতে যাওয়া যায় কিনা— তা-ও তো জানা নেই। জজসাহেব তাদের সঙ্গে দেখা করবেন কিনা, কথা বলবেন কিনা— কিছুই জানে না জুবেদা বেগম অথবা ফিরদৌস।

ছেলেকে কাছে নিয়ে শুয়ে পড়লো জুবেদা বেগম। বড় করুণ, বড় অসহায় লাগছিল তার ফিরদৌসকে। বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে ছেলের মাথার চুলের মধ্যে বড় মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল জুবেদা বেগম। তার দুটি চক্ষু উন্মুক্ত। ঘরের কোণে রাখা লম্ফটার অস্বচ্ছ আলোতে মাথার ওপর ঘরের চালের খাপরাগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে। ক্লান্ত ফিরদৌস ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু জুবেদার দুই চোখে ঘুম নেই। এক অজানিত ভবিষ্যৎ তাকে বিনিদ্র করে রেখেছে। মনটা তার কেমন যেন শূন্য। কোনো কিছু ভাল মন্দের, কোনো প্রত্যাশা অপ্রত্যাশার— কিছুরই চিন্তা তার মনে আজ নেই। একটা প্রচণ্ড মানসিক ক্লান্তি তাকে দীর্ণ করে দিচ্ছে। ঘুমাতে না চাইলেও কখন যে তন্দ্রা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তা সে নিজেই জানে না।

।। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

এরকম একটা কথা যে শুনতে হবে— প্রথমটা তা ভাবতেই পারেননি অ্যাডভোকেট বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। একটু সকাল সকালই আজ নিজের বাড়ীর একতলার চেম্বারে এসে বসেছিলেন বিন্ধ্যেশ্বর। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি। এত সকালে কোনো মক্কেল সাধারণত আসে না। এই সুযোগে চট করে কাগজটা পড়ে নেওয়া যায়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে একটু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

ভিতরে ঢুকলো জুবেদা বেগম আর ফিরদৌস। নাসরিন বিবির মামলায় তাঁর মক্কেলকে বাঁচাতে পারেননি বিন্ধ্যেশ্বর। একটা গ্লানি মনে মনে তাঁর থেকেই গিয়েছিল। তাই এই সাত সকালে সেই মক্কেলের মা ও স্বামীকে দেখে একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। তবু ভদ্রতা করে বললেন— "এসো, এসো। খবর সব ভালো তো? তা, হঠাৎ কি মনে করে? নতুন কিছু মামলার ব্যাপার আছে নাকি?"

BanglaBook.org

হাতের খবরের কাগজটা নামিয়ে ভাঁজ করে টেবিলের ডান দিকে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে বললেন বিন্ধ্যেশ্বর। জুবেদা বা ফিরদৌস কেউই চেয়ারে বসেনি। দুজনে টেবিলের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েই রইল।

—"আরে বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে কি কথা হয় নাকি। বোসো।" দুজনে বসলো। কে প্রথমে কথা বলবে বুঝতে পারছিল না জুবেদা বা ফিরদৌস। শেষ পর্যন্ত ফিরদৌসই গত কালকের সমস্ত ঘটনা খুলে বললো বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদকে। সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন বিন্ধ্যেশ্বর। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি কখনো পড়েন নি। প্রায় চল্লিশ বছর আইন আদালত ঘাঁটছেন, কিন্তু এরকম কোনো পরিস্থিতি বা এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো আইন এদেশে আদৌ আছে কিনা তা জানা নেই তাঁর। তিনি বললেন— "আমি একটা আবেদনপত্র লিখে দিচ্ছি, তোমরা সকলে সেটাতে সই করে আমাকে দাও। আদালতে সেটা পেশ করে দেখবো, কি হয়।"

—"উকিলবাবু, যদি আমরা মা ছেলে নিজেরা গিয়ে জজসাহেবের কাছে কিছু বলি— তিনি শুনবেন না? তাঁর পায়ে ধরবো আমরা।" বলতে বলতে দুচোখ জলে ভরে যায় জুবেদার।

—"আহা, এত ভেঙে পড়ছো কেন? বললাম তো, চিঠিটা লিখে দিচ্ছি, সকলে সই করে কালই আমাকে দাও। আবার কেসটা তুলতে একটা পিটিশন করবো। কিন্তু মুশকিল কি হয়েছে জানো? লোয়ার কোর্টে এবং হাইকোর্টে দু' জায়গায়ই তো আসামী তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। মামলা লড়বার কোনো সুযোগই তো আসামী কাউকে দিল না। অবশ্য, এখন ঘটনাটা অন্য রকম। আইনে না থাক, মানবিক দিক থেকে এর একটা ব্যাখ্যা কিছু বের করা যায় কিনা— সেটা দেখতে হবে।"

একখানা বড় লম্বা কাগজ দেরাজ থেকে বের করে নিয়ে ওদের হয়ে একটা আবেদনপত্র লিখে দিলেন বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। ইংরাজী আবেদনপত্রের মানেটা ওদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন— "এটা সই করিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে এসো। সাজার তারিখ ধার্য হয়ে গেলে কিছু আর করা যাবে কিনা জানি না। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। একসঙ্গে দুটো প্রাণ বলে কথা।"

কেমন একটা বিহ্বল ভাবে দুজনে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পিতৃপ্রতিম এই প্রৌঢ় আইনজ্ঞের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অশ্রু সজল হলো ফিরদৌস। তাঁকে

BanglaBook.org

হেঁট হয়ে প্রণাম করে নীরবে সে মাকে সঙ্গে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কনডেম্‌ড সেল-এ একা একা বড় উদাস লাগে নাসরিনের। দণ্ডাদেশ হয়ে গেছে। এখন শুধু সাজা পাওয়ার অপেক্ষা। কোথায়, কোন্ জেলখানায়, কবে তা হবে— তা জানে না সে নিজেও। তার প্রতিটি সকাল আসে সেই সংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে। সারাটা দিন কেটে যায় একটা অস্থির অপেক্ষায়। দিনের শেষে সে বুঝতে পারে— আজকেও ঐ খবরটা এলো না।

জেলখানার উত্তর দিক ঘেঁষে এই কনডেম্‌ড সেল। পাশাপাশি দুখানা কুঠরি। বড় জোর আট ফুট করে লম্বা চওড়ায়। সামনে, পিছনে, দুই পাশে অন্য সেল। কোনো ভাবেই রক্ষীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়— তাই এত সুরক্ষার ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে নাসরিন শুধু একজনই এই সেল-এর বন্দী। যে কোনোদিন তার সাজার অর্ডার আসতে পারে। এই জেলখানাতেই সে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্য কোনো জেলেও তাকে বদলী করে সে সাজা হতে পারে। কিছুই জানতে পারে না নাসরিন। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। মাঝে মাঝে শুধু ফিরদৌস বা জুবেদা আসে দেখা করতে।

গতকাল ফিরদৌস ঘুরে গেছে। আবার আজই সে আসবে— সেটা ভাবতে পারেনি নাসরিন। একজন মহিলা পুলিশ কর্মীর কাছে ফিরদৌসের আসার খবরে তাই সে বিলক্ষণ বিভ্রান্ত এবং চিন্তিত। শাশুড়ী জুবেদা বেগমের কিছু হয়নি তো?

ভিতরের প্রশস্ত চত্বরে অনেক লোক। অনেক মানুষ এসেছে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েকটা কনস্টেবল দর্শনার্থীদের নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। কেউ কেউ খাবার জিনিস এনেছে বন্দী আত্মীয়র জন্যে। বাইরের জিনিস কয়েদীদের দেওয়ার নিয়ম নেই। এই নিয়ে কিছু মানুষের সাথে জেলখানার কর্মীদের বচসা চলছে। চত্বরটায় প্রধানত শিশু আর মেয়ে বৌদেরই ভিড়। বেশীরভাগ মানুষের পোশাক আর চেহারায় হত দারিদ্র্যের ছাপ। মেয়ে বৌদের কোলে শিশু, হাতে ধরা বালক বালিকাদের হাত। এরই মধ্যে গরীব আত্মীয়দের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি পয়সা আদায় করাও চলছে। না আছে কোনো নিয়ম, না আছে কোনো প্রশাসনের ভয়। এই মুহূর্তে যেন সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ঐ জেলখানা কর্মীর দলই। বেশী কিছু বললে হয়তো বন্দী আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতেই দেবে না। ভয়ে ভক্তিতে পুলিশী জুলুম নীরবে

BanglaBook.org

ও বিনা প্রতিবাদেই সকলে সয়ে যাচ্ছে।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল ফিরদৌস। তারপর আস্তে আস্তে সাক্ষাৎকারের ঘরটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো সে। জানালার জালের ওপারে নাসরিন এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ একই পোশাক — যে পোশাকে গতকাল তাকে দেখেছিল ফিরদৌস। একটা কনস্টেবল এসে ওকে বললো— "সিগারেট আছে? খৈনি? তুই গতকালই এসেছিলি না? আজকে তোকে আসার অনুমতি কে দিয়েছে?"

বিভ্রান্তের মতো ওর দিকে চেয়ে রইল ফিরদৌস। লোকটা হাতের ছোট রুলটা ওর কোমরের কাছে চেপে ধরে বললো— "মাইরি, বোবা নাকি? এই! কথাটা কি বললাম? সিগারেট আছে? পকেটে কত এনেছিস? মাল না ছাড়লে দেখা হবে না।"

লোকটার হাতে একটা আধুলি দিল ফিরদৌস। আর বললো— "সিগারেট নেই। পয়সাও আর নেই। হেঁটে হেঁটে জেলে আসি। পয়সা আনি না।"

লোভীর মতো ভঙ্গিতে টপ্ করে ফিরদৌসের হাত থেকে আধুলিটা তুলে নিয়ে রুলটা ওর পেটে আরও একটু চাপ দিয়ে বললো — "এরপর থেকে সিগারেট আনবি। শালা।" কোনো জবাব দিল না ফিরদৌস। জালের দিকে তাকিয়ে দেখলো নাসরিন নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ততক্ষণে লোকটা সরে গেছে অন্য দিকে। গরীব বৌগুলোর আঁচলের গিঁট খুলিয়ে দেখছে পয়সা আছে কিনা। বাচ্চাগুলো মায়েদের কোলে থেকে চিল চিৎকার করছে।

জালের কাছে এগিয়ে গেল ফিরদৌস। বললো— "এই শালাগুলো মনে করে এরাই যেন আমাদের মা বাপ। কিন্তু কার কাছেই বা মানুষ নালিশ করবে। যত সব।"

— "বাড়ীতে কোনো খারাপ খবর নেই তো?" ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে নাসরিন।

— "না রে, বরং ভাল খবর একটা এনেছি। উকিলবাবুর কাছে সকালে মাকে নিয়ে দেখা করেছিলাম।। তোর খবর বললাম। মাটা বড় কাঁদছিল রে। উকিলবাবু সব শুনে বললেন— একটা দরখাস্ত জমা দাও। দেখি, কি করা যায়। সেই মতো একটা দরখাস্ত লিখে দিয়েছেন উকিলবাবু। আমরা সকলে সই করে ওঁর কাছে জমা দেবো। তারপর আদালতে যদি মামলাটাকে

BanglaBook.org

আবার তোলা যায়, সে চেষ্টা উনি করবেন।"

কাগজখানা খুলে দেখালো ফিরদৌস। কাগজটা নাড়াচাড়া করে জালের বাইরে থেকেই দেখিয়ে দিল কোথায় নাসরিনকে সই করতে হবে। এখানে সই করার সুযোগ নেই। সাক্ষাৎকারের সময় পার হয়ে গেলে সাব-জেলারের ঘরে গিয়ে ওটা সই করতে পারবে নাসরিন। এজন্যে আবার কিছু পয়সা খরচ করতে হবে। কিন্তু আর পয়সা দেবে না ফিরদৌস। সে বললো— "আমি দেখি সাব-জেলার সাহেবকে বলে তোর সইটা করাতে। তুই ভেতরে যা, নাসরিন। সাব-জেলার সাহেব তোকে ডাকিয়ে আনলে সই দিবি।"

সাব-জেলারের ঘরের দিকে পা বাড়ালো সে। আবার কয়েকজন পুলিশকর্মী তাকে ঘিরে ধরেছে। পরের দিন পয়সা আর সিগারেট আনার আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো রকমে সে পৌঁছাতে পেরেছে সাব-জেলারের ঘরের সামনে।

দরজার পর্দায় উঁকি দিয়ে দেখলো চেয়ার খালি। ঘরে কেউ নেই। অগত্যা দরজার কাছেই অপেক্ষা করতে থাকে ফিরদৌস। কিছুক্ষণ পরে মোটা গোঁফ আর সাদা পোশাক পরা সাব-জেলার সাহেব এসে দাঁড়ালেন ঘরের দরজার সামনে। ওকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— "এই, তুমি কে? কি চাই এখানে?"

— "আজ্ঞে, আমি আপনার কাছেই এসেছি। আমার বিবি এই জেলে আছে। আমাদের উকিলবাবু আমাদের জবানীতে একটা দরখাস্ত লিখে আমাকে দিয়েছেন আমার বিবির একটা সই ওতে করিয়ে আনতে। আমি সেটা এনেছি হুজুর। যদি দয়া করে তাকে ডেকে পাঠিয়ে একটা সই করিয়ে দেন।" পকেট থেকে কাগজটা আবার বের করে তাঁর সামনে মেলে ধরে ফিরদৌস।

"ভেতরে এসো, দেখছি।" কাগজখানা হাতে নিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন সাব-জেলার। কিছু না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ফিরদৌস।

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুললেন সাব-জেলার। বললেন— "তোমার বিবির তো সাজা হওয়ার অর্ডার আজকালের মধ্যে এলো বলে। এখন কি আর এসবে কিছু হবে?"

বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো ফিরদৌসের। তবু নিজেকে সংযত করে সে বললো— "শেষ একটা চেষ্টা করা যাবে না কি স্যার? ওর পেটে আমার বাচ্চা রয়েছে। জজসাহেব কি ওকে মাফ করে দেবেন না? ওর সাজা হলে মা আর বাচ্চাটা তো একসঙ্গে।"

BanglaBook.org

আর বলতে পারলো না ফিরদৌস। সাব-জেলারের সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। সাব-জেলারের বোধ হয় মায়া হয়েছে ফিরদৌসকে দেখে। তিনি বললেন— "থাক, থাক। কেঁদো না। আমি ডেকে আনাচ্ছি তোমার বিবিকে। দেখো, সই দিয়ে কিছু হয় কিনা।"

টেবিলে রাখা কলিং বেলটা হাতের চাপড় মেরে বাজালেন সাব-জেলার সাহেব। কেউ এলো না। অসহিষ্ণু হয়ে আরো দুবার পরপর ওটা বাজালেন তিনি। একটা কনস্টেবল এসে সেলাম করলো।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে চলে গেল লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যে দুজন মহিলা পুলিশ সাথে করে নাসরিনকে নিয়ে সে আবার ফিরে এলো। ঘোমটাটা মাথায় তুলে দিয়েছে নাসরিন। টেবিলের এক ধারে নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

— "এই লোকটা তোমার স্বামী? চেনো ওকে?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। "তোমার নামই তো নাসরিন বিবি? ১নং কনডেম্‌ড সেল?"

ঘাড় নাড়লো নাসরিন। সাব-জেলার বললেন — "ডাক্তারবাবুদের তুমি তোমার কথা বলেছ? এখানে কেউ জানে? ফিমেল ওয়ার্ডেনদের কিছু বলেছ?"

দুদিকে মাথা নাড়লো নাসরিন। সাব-জেলার বললেন ফিরদৌসকে — আমি জেল হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে রিপোর্ট দিতে বলছি। পরীক্ষা করে দেখে কাল রিপোর্ট দিলে তখন তুমি এসো। সইসাবুদ তখন হবে। এখন কিছু হবে না। কাগজটা আমি রাখলাম। ওর কথা সত্যি হলে তখন ও সই করে দেবে। আজ তুমি যাও।

ফিরদৌস কি একটা কথা বলতে গেল। সাব জেলার ধমক দিয়ে বললেন — "কি বললাম তোমায়? যাও এখন।"

বেরিয়ে গেল ফিরদৌস। কাগজটা টেবিলের ওপর পড়ে রইল। নাসরিন গেল না। সাব-জেলার আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন —"পরের একটা বাচ্চার জান নিতে তো হাত কাঁপেনি? এখন বুঝি নিজের বাচ্চার জন্যে যত দরদ? শালী, মেয়েছেলের জাতটাই এমনি। যা তুই, কাল ডাক্তারবাবু তোকে দেখবে। ওসব সই-টই কাল দেখা যাবে।"

যাদের সঙ্গে এসেছিল নাসরিন, তাদের সাথেই ফিরে গেল সে। ফিরদৌসের সঙ্গে আজ কোনো কথাই বিশেষ হলো না। পরপর দুই আদালতেই সে হত্যার কথা কবুল করেছে। এখন পেটে বাচ্চা আছে বলে কি খালাস

BanglaBook.org

পাবে সে? কে জানে।

আবার নিজের সেল-এর মধ্যে ফিরে এলো নাসরিন। মহিলা পুলিশটা তাকে জিজ্ঞাসা করলো — "তোর পেটে বাচ্চা আছে, আগে জানতিস না? কবে বুঝলি? ঐ লোকটা তোর স্বামী? আর বাচ্চা আছে তোর? কতদিন বিয়ে হয়েছে? ঐ ছোকরাটাই তো বাচ্চা। আবার, তার বাচ্চা তোর পেটে? বাচ্চাটা ওরই তো? না আর কারুর?"

কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করে হাসতে থাকে মেয়েটা। কোনো কথার জবার দেয় না নাসরিন। শুধু বলে—"হাসপাতালে কখন দেখে? আমাকে নিয়ে যাবে দিদি?"

মেয়েটা কিছুক্ষণ নাসরিনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর নিজের হাতের নোয়াটাকে কনুইয়ের দিকে ঠেলে আঁট করতে করতে বলে— "সকালে তৈরী থাকিস। আমি এসে নিয়ে যাব। তুই ভাবিস না।" একটু হাসলো মেয়েটা। তারপর গরাদ দেওয়া দরজাটায় একটা ভারী তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নাসরিন। সে জানে, নোয়া যার হাতে থাকে সে সধবা। হয়তো-বা কোনো সন্তানেরও জননী।

নিজের তলপেটের কাছে ডান হাতটা কিছুক্ষণের জন্যে ধরে রাখে নাসরিন। তারপর ময়লা কম্বলটার ওপরেই মাটিতে বসে পড়ে সে।

।। অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ।।

পাটনা শহরের এই দিকটায় নতুন করে শহর বাড়ছে। এইখানেই নতুন এলাকা পাটলিপুত্র নগরের পত্তন হয়েছে। এরই মধ্যে শহরের অনেক গণ্যমান্য ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর তৈরী করে ফেলেছেন। নতুন শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটও তৈরী হয়েছে যথেষ্ট প্রশস্ত করে। পুরনো পাটনার মতো এদিকটা ঘিঞ্জি হতে পারবে না। রাস্তার দুই পাশে গাছপালা লাগিয়ে নীচেটা গোল করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় সব জায়গায় এখনো পিচ না পড়লেও অধিকাংশ রাস্তাই তৈরী হয়ে গেছে। তবে পথে এখনও তেমন লোক সমাগম চোখে পড়ে না। দোকানপাট আস্তে আস্তে জমছে। তবু চারিদিকে বেশ একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব। প্রচণ্ড গরম। যে গাছগুলো

BanglaBook.org

বেশ বড় হয়ে গেছে সেগুলোর কথা আলাদা। কিন্তু ছোট গাছগুলো লৌহ বেষ্টনীর মধ্যে থেকে দারুণ দাবদাহে যেন শ্রান্ত, ক্লান্ত।

দুটো সাইকেল রিক্সা থেকে নামলো ফিরদৌস, জুবেদা বেগম আর বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। এই পাড়াতেই নতুন বাড়ী করেছেন জাস্টিস বিনায়ক চতুর্বেদী। রি'া দুটি তাঁরই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ রবিবার। ছুটির দিন। এমন দিন ছাড়া জাস্টিস চতুর্বেদীর সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। তাই আজকের দিনটাকেই বেছে নিয়েছেন বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। নিছক আদালতেই নয়, জাস্টিস চতুর্বেদীর সাথে অন্য একটি সূত্রেও যোগ আছে বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদের। জাস্টিস চতুর্বেদীর পত্নী ললিতা দেবী বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদের দূর সম্পর্কিত দিদি হন। সেই সুবাদে কিছু আসা যাওয়া ছিল দুই পক্ষের। আর, সেই ভরসাতেই তার মক্কেলকে নিয়ে এ বাড়ীতে আসবার সাহস হয়েছিল বিন্ধ্যেশ্বরের।

প্রশস্ত লোহার গেটটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে দারোয়ান দেখলো আগন্তুকদের। তারপর পূর্ণ পরিচয় জেনে ভিতরে চলে গেল সংবাদ জানাতে। কিন্তু গেট খুললো না। কিছুক্ষণ পরে লোকটা আবার ফিরে এসে চাবি দিয়ে বিরাট তালাটাকে খুলে গেট ফাঁক করে সকলকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার গেটটায় তালা লাগিয়ে দিলো।

মোরাম ছড়ানো পথ এসে শেষ হয়েছে প্রশস্ত পোর্টিকোর নীচে। ভিতরে ঢুকে একটা ঘরে ওদের বসতে দিয়ে দোতলায় চলে গেল লোকটা। ঘরের দেওয়ালে দুটো বিশাল হরিণের শিং একটা কাঠের ফলকের গায়ে লাগানো রয়েছে। দুই পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দুটি টেবিল — ওপরে সাদা দামী কাঠের চেয়ারের মাঝখানে বড় বড় ভারী গদি আঁটা সোফা। দেওয়ালে কার যেন মস্ত বড় একটা ফোটোগ্রাফ বাঁধানো রয়েছে। বড় বড় জানালা আর দরজায় মেঝে ছোঁওয়া ভারী কাপড়ের পুরু পর্দা। চারিদিকটা দুচোখ মেলে দেখছিল ফিরদৌস। মাথার ঘোমটায় মুখ প্রায় ঢাকা জুবেদা বেগমের। এই গরমেও সাদা শাড়ীর ওপর ঘি রং-এর একটা চাদর তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বেষ্টন করে রেখেছে। ফিরদৌস আর জুবেদা বসেনি। দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শুধু একা বসে আছেন বিন্ধ্যেশ্বর। অস্থির হয়ে কবজি ঘড়িটায় একবার চোখ রাখলেন তিনি। এমন সময়ে একটা খয়েরী ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে ভিতরে ঢুকলেন জাস্টিস চতুর্বেদী। পরণে সাদা সিল্কের ঢোলা পায়জামা, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি।

BanglaBook.org

ঘরে প্রবেশ করে ইঙ্গিতে সকলকে বসতে বললেন জাস্টিস চতুর্বেদী। তারপর নিজেও বসলেন বড় একটা সিঙ্গল সোফায়। হাতের নিভন্ত পাইপটা সোফার হাতলে দুবার আস্তে ঠুকে জিজ্ঞাসা করলেন— "প্রসাদজী, আপনি? এঁদের তো ঠিক .....।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দিলেন তিনি ফিরদৌস আর জুবেদা বেগমের দিকে। এগিয়ে এসে পদস্পর্শ করে প্রণাম করতে যাওয়া মাত্র বাধা দিয়ে ফিরদৌসকে বললেন— "এখন আর এসব কেউ করে না। ওসব ইংরেজ আমলে ছিল। এখন তো স্বাধীন দেশ, মানুষও সবাই স্বাধীন। এখন আর ওসব নেই, উঠে গেছে।" হাসলেন জাস্টিস চতুর্বেদী।

জাস্টিস চতুর্বেদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফিরদৌস। এই সেই মানুষ! ইনিই হয়তো মার্জনা করে দিতে পারেন নাসরিনকে। নাসরিনের গর্ভে রয়েছে একটি তাজা প্রাণ। প্রাণের সেই উত্তরাধিকারকে ইনিই পারেন জীবিত রাখতে। আবেগে বাক্য স্ফুরিত হচ্ছিল না ফিরদৌসের।

সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। আগমনের কারণটাও জানালেন তিনি জাস্টিস চতুর্বেদীকে। কিছুক্ষণ গালে ডান হাতটি রেখে গুম হয়ে বসে রইলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন —"ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে আমার কাছে না এলেই বোধহয় ভালো হতো। কারণ, সব জিনিসেরই তো নিয়ম বলে একটা ব্যাপার আছে। জিনিসটা এভাবে হয় না, আর, হওয়ানোর চেষ্টা করাটাও বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়। যা হোক, অ্যাডভোকেট প্রসাদ আমার আত্মীয়। তাই আমি এই অনিয়মটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছি না। তবে, তোমরা কোর্টে একটা অ্যাপিল করো। অ্যাপিলের সময়সীমা এখনো পার হয়ে যায়নি। তারপর যা হবার হবে।"

উঠে দাঁড়ালেন জাস্টিস চতুর্বেদী। হঠাৎ জুবেদা বেগম উঠে তাঁর পায়ের ওপরে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো— "হুজুর, ফিরদৌস আমার একমাত্র সন্তান, ওর সংসারটা এমন করে ভেসে যেতে দেবেন না। আপনিই নাসরিনকে সাজা দিয়েছেন, আপনিই মা বাপ, আপনিই আপনার অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করতে পারেন। আর কেউ নয়।"

"আরে, এসব কি হচ্ছে! আমি কে? না, না, আমি কেউ নই! আইন চলবে আইনের পথে। আমি কি আইন বদলানোর মালিক? প্রসাদজী, আপনি ওকে উঠতে বলুন। আর, আপনি কোর্টে যা করার করুন। তখন দেখা যাবে।" ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন জাস্টিস চতুর্বেদী। তাঁকে লক্ষ্য করে বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ একটু উচ্চকণ্ঠে বললেন— "ঠিক আছে। আমি একটা

BanglaBook.org

অ্যাপিল পিটিশন তৈরী করছি। হিয়ারিং-এর সময়ে যা বিবেচনা করার তা আপনারই হাতে। এরা আমার মক্কেল তো, তাই এদের হয়েই আবার বলি, একসাথে দুটো প্রাণ যেন না যায়, সেটাই শুধু দেখার। আইনের সীমার মধ্যে থেকে কি করা যায় সেটাও ভাববার। আমার এতখানি বয়সে এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি কখনো। আচ্ছা, আমরা আসি। নমস্কার।"

সকলে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে পরীক্ষা হয়েছিল নাসরিনের। তার সন্তান সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন চিকিৎসকেরা। বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদের চেষ্টায় হাইকোর্টে এই রিপোর্ট নিয়ে নতুন করে অ্যাপিল করেছে নাসরিন বিবি। অ্যাপিলের শুনানী যাতে অবিলম্বে হয় — সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। সাজা কার্যকর হওয়ার দিন ধার্য হবার আগেই শুনানী হওয়া দরকার।

আবার নতুন করে সামনে একটা আশার আলো যেন দেখতে পাচ্ছে নাসরিন। শুধু নাসরিনই নয়, ফিরদৌস, জুবেদা বেগম আর স্বয়ং বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। এরকম একটা অসাধারণ মামলা যদি জিততে পারেন তিনি, তবে তাঁকে আর পায় কে ? আইনে এরকম কথা কোথাও বলা বা লেখা হয়নি। এরকমের কোনো দৃষ্টান্তও কোথাও নেই। আইনে যেখানে নির্দিষ্ট করে কোনো বিধান নেই, সেখানে মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, শুভ অশুভ বোধ ইত্যাদিকে কাজে লাগানোর একটা সুযোগ থেকেই যায়। আর, অ্যাপিলের শুনানীর সময়ে সেই সুযোগটাকেই কার্যকর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ।

মুখে যতই আইনের পক্ষে বলেছিলেন জাস্টিস চতুর্বেদী — কিন্তু তাঁর মনেও একটা দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে। এখানে দ্বন্দ্বে দুই পক্ষ — প্রথম পক্ষ, আইনের ধারা ও তার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় পক্ষ মানুষের বিবেক ও মানবিকতা। আজ জাস্টিস চতুর্বেদীর মতো প্রবীণ বিচারকের সামনেও এক জটিল সমস্যা জ্বলন্ত প্রশ্নচিহ্নর মতো হয়ে দেখা দিয়েছে।

জেলখানার কনডেম্‌ড সেল-এ নিঃসঙ্গ বন্দিনী নাসরিন বিবিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নতুন করে। যে পাপ তার অনিচ্ছায় হয়েছে, যে পাপের পরিকল্পনা তার চিন্তার অগোচরে রোপিত হয়েছিল, আজ তারই মাশুল দিতে হচ্ছে তাকে। বাবা, চিরঞ্জিকাকা — তারা তাদের পাপের ফল পেয়েছে। সেটা তাদের প্রা প্যই ছিল। সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই নাসরিনের মনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শিকার হলো সে একা। তাকে হারাতে হলো রঘুনাথের

BanglaBook.org

মতো স্বামীকে। আজ সমস্ত পূর্ণিয়া অঞ্চলে সে শুধু একা হয়ে গেল চরম অপরাধী — যার নামে হয়তো মানুষ চিরকাল থুতকার দেবে। সে যদি আজ মুক্তিও পেয়ে যায় তবে কেমন হবে তার জীবন? ঐ পুরানো অপরাধের গ্লানি কি সারা জীবন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে না? নিজের সন্তানকে যখন সে বুকে ধরে রাখবে, তখন জীবনের অপর পার থেকে এক ভাগ্যহীনা জননীর অভিশাপ কি নাসরিনের সন্তানের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আনবে না?

সেল-এর নিঃশব্দতা আর একাকীত্বের মধ্যে বসে বসে রাত দিন এইসব কথা ভাবে বন্দিনী নাসরিন বিবি। রঘুনাথ কোথায়, সে বেঁচে আছে, না নাসরিনের মতো সেও গ্লানির জীবন থেকে বাঁচবার মানসে আত্মহনন করেছে, তা জানে না নাসরিন। তবু সে আশায় বুক বাঁধে। কি অসামান্য যাদুবলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে সে। আবার তার ঘর হবে, সংসার হবে, স্বামীর সোহাগ হবে, সন্তানের জননী হয়ে সোনার সংসারের আকাশে এক উজ্জ্বল তারকা হয়ে বেঁচে থাকবে সে।

মাঝে মাঝে আইনজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে ফিরদৌস দেখা করে যায় নাসরিনের সঙ্গে। এর মধ্যে আদালতে তার পূর্ববর্তী স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার সাথে সাথে নাসরিন তার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আদালতের কাছে মার্জনাও প্রার্থনা করেছে।

আগামীকাল নাসরিনের আপীলের শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে। সারা রাত একটুও ঘুমায়নি সে। চারিদিকে কক্ষবেষ্টিত তার সেল-এর মধ্যে থেকে সে চেষ্টা করেছে কখন সকাল হবে তা জানার। বেলা নটার সময়ে তাকে নিয়ে আসা হলো পাটনা হাইকোর্টে। বিচারকের আসনে জাস্টিস চতুর্বেদীকে দেখে তার মন উৎসাহিত হয়েছিল। কাঠগড়া থেকে সামনের সারিতে বসা জুবেদা বেগম ও ফিরদৌসকে দেখে সে একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরই বিচারে তার কি পরিণতি হবে এবং তা স্বামী ফিরদৌস কতখানি সহ্য করতে পারবে — এ কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে অসম্ভব ভেঙে পড়ছিল নাসরিন। তবু, বাইরে থেকে নিজেকে একটা কঠিন আবরণের মধ্যে ধরে রাখার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল সে।

আজ আর কোর্ট চত্বরে লোকের ভিড় হয়নি। শিশু হত্যার ঘৃণ্য আসামীর প্রাণদণ্ড হয়েছে সেটাই জেনে গেছে সকলে। নতুন পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন এসেছে সেটা কারো জানা নেই। তাই আজকের আদালত প্রাণহীন, বর্ণহীন।

BanglaBook.org

নাসরিনের আবেদন নিয়ে শুনানী শুরু হলো। আসামী নিজেই তার নিজের এবং তার গর্ভস্থ অনাগত সন্তানের প্রাণের জন্য মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন রেখেছে। আবেগময় ভাষায় ও কণ্ঠে সে কথা জানালেন নাসরিনের আইনজ্ঞ বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ। সমস্ত শুনলেন জুরিবৃন্দ। কিছু সময়ের বিরতির মধ্যে মহামান্য জুরিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিরতির শেষে আবার ফিরে এসেছেন।

আদালত কক্ষে সেদিনের মতো আজও প্রচণ্ড উত্তাপ। তবে আজ ধিক্কার দেওয়ার মতো অথবা সমর্থন জানানোর মতো জনতা নেই। জুরিদের সাথে আলোচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি। এবারে তিনি তাঁর রায় ঘোষণা করবেন। একটা চাপা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে নাসরিন, কাঁপছে ফিরদৌস, কাঁপছে জুবেদা বেগম। এমনকি আসামীর আইনজ্ঞ বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ স্বয়ং।

আজও সেদিনের মতো কালো কালো পাখাগুলো দুটি করে কাঠের ব্লেড নিয়ে দীর্ঘ দণ্ড থেকে ঝুলে থাকতে থাকতে সশব্দে ঘুরে চলেছে। আজো সেদিনের মতো বিচারপতির মাথার কাছে পিছনের দেওয়ালে থাকা বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে সময়ের চলে যাওয়া ঘোষণা করে চলেছে অক্লান্ত ভাবে।

বিচারপতি এবার নিজের বক্তব্য আরম্ভ করলেন— "তিত্‌লি নামে একটা দুই বৎসরের শিশুকে নৃশংসভাবে পরিকল্পনা করে হত্যার দায়ে এই আদালত আসামী নাসরিন বিবিকে প্রাণদণ্ড দান করেছিল। সেই সাজা কার্যকর হবার আগেই একটি ভিন্নতর এবং বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে — ভারতীয় দণ্ডবিধিতে তা শুধু অদ্ভুতই নয়, অভাবনীয়। মাত্র কিছুদিন আগে জানতে পারা গেছে যে, বিবাহিতা নাসরিন সন্তানসম্ভবা। চিকিৎসকের পরীক্ষায় সে সত্য নির্ণীত হবার পরে আসামী তার নিজের ও তার গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে। এদেশের দণ্ডবিধির আইনে এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আইন কি করবে তার কোনো সমাধান সূত্র নেই। তাই এই সমগ্র বিষয়টিকে মহামান্য জুরি মহোদয়গণের বিবেচনার জন্য তাঁদের কাছে পেশ করা হয়েছিল। জুরি মহোদয়গণের কাছ থেকে যে মতামত পাওয়া গেছে তার মধ্যে চারজনের মত এই আদালতের পূর্ব রায় বহাল হবার স পক্ষে, তিনজন মত প্রকাশ করেছেন আসামীর দণ্ডকে লঘু করতে অথবা তাকে মার্জনা করে দিতে। তাঁদের বক্তব্য, সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক আসামীর সাজা। কিন্তু অন্য পক্ষ বলছেন — তা সঙ্গত নয়।

BanglaBook.org

সদ্যোজাত একটি শিশুর কাছে তার মা কতদিনের জন্য প্রয়োজনীয়, তার কোনো আইনী বিধান কোথাও নেই। তাছাড়া, কোনো বন্দীকে সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়ে গেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় রেখে দেওয়ার অর্থ তাকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে অস্থায়ী ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যা কিনা অমানবিক। প্রথম দলের বক্তব্য, আইনের চোখে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী সব সময়ে একটি একক ও অখণ্ড ব্যক্তিত্ব। অন্তঃসত্ত্বা হলেও তাকে আইন এক ও অখণ্ড হিসাবেই বিবেচনা করবে — অন্তত আইন হিসাবে তা-ই হওয়া উচিৎ। এখানে ভাবাবেগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যদি এরকম নৃশংস হত্যাকারীকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। সুতরাং আইন তার নির্ধারিত পথেই চলুক। আমি এই মামলার প্রধান বিচারপতি হিসাবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে জুরি মহোদয়গণের গরিষ্ঠ অংশের বিবেচনায় আসামী নাসরিন বিবির পূর্ব দণ্ডাদেশই বহাল রাখলাম।"

প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির, অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাসরিন। এতদিনের সমস্ত অস্থিরতা, সমস্ত দুশ্চিন্তা তার যেন সহসাই চলে গেছে। সে বুঝে গেছে তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে তার গর্ভস্থ সন্তান। এক মায়ের প্রাণের ধনকে সে একদিন জানিতে বা অজানিতে বিনষ্ট করেছিল। আজ সেই শাস্তি সে নিজে পেতে চলেছে। এই বোধহয় ভালো হলো। এতেই বোধহয় তার প্রায়শ্চিত্ত হলো।

বিন্ধ্যেশ্বর প্রসাদ চেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতে। কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না নাসরিন। এমনকি, ফিরদৌসের কান্নাও তাকে টলাতে পারেনি এতটুকু। আচঞ্চল পদে নিজের কনডেম্ড সেল-এ ফিরে গেছে নাসরিন। তার রাতের ঘুম এতটুকু বিঘ্নিত হয়নি গতকাল। মনে হচ্ছে, মনে প্রাণে আজ সে মুক্ত, গ্লানিহীন। পালকের মতো সে হাল্কা।

শুধু নিজেকে মানাতে পারেনি ফিরদৌস। সারা রাত ঘরের বাইরে অস্থির পদচারণা করেছে সে। এক দানা খাবারও তাকে খাওয়াতে পারেনি মা জুবেদা।

BanglaBook.org

।। ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।।

[পাটনা সেন্ট্রাল জেলের 'ফাঁসি সেল'-এর মহিলা কারারক্ষী বিন্দিয়া পাঠকের ডায়েরি থেকে।]

৩রা অক্টোবর ১৯৫১

'কনডেম্‌ড সেল'। জেলের সাধারণ কয়েদীদের কাছে আর চলতি ভাষায় 'ফাঁসি সেল'। গত রাত থেকে চারদিন ধরে এই সেলের এক নম্বর কুঠরির পাহারার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখানে যাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখা হচ্ছে, তার নাম নাসরিন বিবি। একটা শিশুকে দেবীর সামনে বলিদান দেওয়ার জঘন্য অপরাধে সে ফাঁসির দড়ি মাথায় নিয়ে প্রহর গুনছে শেষ সময়টির। ওর ঐ জঘন্য অপরাধের কথা আমাকে বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রাম্য তরুণীটির চেহারায় বা আচরণে আমি কোনো ভয়ঙ্করতা বা নৃশংসতার ছায়া দেখতে পাইনি। কেমন শান্ত হয়ে সেল-এর একপাশে কম্বলের ওপরে সে বসে থাকে। জেলারের কাছে একটা কৃষ্ণের ছবি চেয়েছিল ও। ছবিটাকে সে সর্বক্ষণ দেখে। মাঝে মাঝে আপন মনে কি যেন বিড়বিড় করে বলে ছবিটাকে। গেটের বাইরে টুলে বসে আমার কানে সে শব্দ পৌঁছায় না। ভীষণ শান্ত মেয়েটি। শ্যামলা, সুশ্রী, শান্ত এই মেয়েটা কি সত্যিই ঐ জঘন্য অপরাধ করেছে? বিচারে কোনো ভুল হয়নি তো? আমার কেমন যেন মায়া হয় মেয়েটার জন্যে। গতকাল রাত্রে যখন ওর পাহারায় আমি ছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ও ঘুমায়নি। গরাদের কাছে এসে আমাকে ডাকলো, "দিদি, আমাকে একটা সাদা শাড়ী দিতে পারো না? এই কালো ডোরা দেওয়া শাড়ী আমার পরতে বড় ভয় করে। সাদা রং কত সুন্দর, না? জেলারবাবুকে বলে একটা সাদা শাড়ী ......" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল ও। তারপর গরাদের শিক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ফের এক কোণে বসে পড়লো। আচ্ছা, আপন মনে ও কি বলে? ওর কি মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে? জেলার সাহেবকে বলেছিলাম কথাটা। তিনি ধমক দিয়ে বললেন — "কয়েদীদের নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ওদের সঙ্গে কোনো কথাও বলবে না। তোমার ডিউটি যা, তা-ই শুধু করে যাবে। তোমার তো নাইটের ডিউটি, তাই না?" হ্যাঁ, বলে থেমে গিয়েছিলাম।

৪ঠা অক্টোবর ১৯৫১

কাল রাতে ডিউটি করছিলাম ১নং সেল-এর। কয়েদী মেয়েটা গত দুদিন ধরেই দেখছি ঘুমাচ্ছে না রাতে। আচ্ছা, ও কি জানতে পেরেছে যে আর

Banglabook.org

দুদিন পরেই ওর ফাঁসি হয়ে যাবে? বোধহয় ওকে সে কথা জানানো হয়নি। কিন্তু আমি জানি। এর জন্যে সব রকম প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। রেশম সুতো আর শনের সুতো মেশানো নতুন দড়ি এসেছে। কয়েদির ওজন নেওয়া হয়েছে। সেই ওজনের সমান করে বালির বস্তা তৈরী করা হবে। বুঝতে হবে ওজনটা ধরতে পারবে কিনা হবে। জেলের বড় ডাক্তারবাবুর কাছে অর্ডারের কপি চলে গেছে। হ্যাংম্যান দুলারামকেও খবর দেওয়া হয়েছে — ভোরের আগেই হাজির থাকতে ৬ তারিখে।

আমার ভালো লাগছে না। একদম ভালো লাগছে না। এরকম ডিউটি আমার এই প্রথম। আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে বিধবা মায়ের কাছে রেখে আমাকে ডিউটি করতে হয়। আজ ওর বাবা থাকলে কাজ আমি ছেড়েই দিতাম। কিন্তু টাকার জন্যে সবই করতেবাধ্য হতে হচ্ছে। কাল রাত্রে নাসরিন হঠাৎ আমাকে বলেছিল — "দিদি, আমাকে একটা বড় পুতুল আনিয়ে দিতে পারো? একটা খোকা পুতুল?"

আমি বলেছিলাম— "দেখবো চেষ্টা করে। জেলার সাহেবকে বলবো।" সকালে ডিউটি সেরে বাড়ী যাবার সময় জেলার সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে কথাটা তাঁকে বলে এসেছিলাম। দেখছি তিনি কথা রেখেছেন। কাপড়ের তৈরী বড় একটা ছেলে পুতুল দেখতে পাচ্ছি মেয়েটা কোলে নিয়ে বসে আছে। তাকে দেহাতি গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। আচ্ছা, আমার ছোট্ট লাডলা কি কাল কারো গান শুনে ঘুমিয়েছিল? আমি রাত্রে থাকতে পারি না তো। লাডলা বোধহয় খুব কাঁদে আমার জন্যে! সকালে বাড়ী ফিরেই ওকে নিয়ে খুব আদর করি। লক্ষ্য করি, রাতে ও কেঁদেছিল, গালের ওপর শুকনো চোখের জলের ছাপ তখনও রয়ে গেছে।

৫ই অক্টোবর ১৯৫১

এত শান্ত, কোমল মেয়েটা ঐ কাজ করেছিল? ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এক একবার মনে করি ওকে জিজ্ঞাসা করবো, কেন, কার কথায় অথবা কার জন্যে সে এ কাজ করেছিল? কিন্তু জেলার সাহেব বলে দিয়েছেন — কয়েদীর সঙ্গে কোনো কথা না বলতে। আমার মনে কত প্রশ্ন ভিড় করে আসে। কে আছে ওর? ও কি কুমারী? সধবা, নাকি বিধবা। কেউ তো ওকে দেখতে

BanglaBook.org

আসে না এখানে। আগে নাকি কারা সব মাঝে মাঝে আসতো। আচ্ছা, তারা এখন সব কোথায়। মানুষ কেন অপরাধ করে? একটা অপরাধ করলেই কি মানুষ চিরদিনের জন্যে সবার চোখে পাপী হয়ে যায়? তাহলে, একটা ভালো কাজ করে মানুষ মহান হয় না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। ঐ মেয়েটা কেন ঐ পুতুলটাকে ঘুম পাড়ায়, সারা রাত জেগে জেগে? ওর কি সন্তান আছে? ও নিজে কি কারো মা?

কাল রাত্রে ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেছেন ঐ মেয়েটাকে। সঙ্গে জেলার সাহেবও ছিলেন। কি সব যেন কথা হলো দুজনের। আমি শুনতে পাইনি। চলে যাবার সময় আমার কাঁধে একটা আলতো চাপড় মেরে জেলার সাহেব বলে গেলেন, "তোমার ডিউটি শেষ হবার সময় এসে যাচ্ছে। আর একটা রাত তো!"

আর একটা রাত? তাহলে কি কালকের রাত শেষ হলেই নাসরিনের ....। নাঃ, এসব ভাবনা আমার কেন?

নাসরিন কালে রাত্রে বললো— "দিদি, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে কেউ কথা বলে না আমার সঙ্গে। বাড়ীতে তোমার কে কে আছে, দিদি? মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে ....." শেষের কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছিল নাসরিন। আমি বলেছিলাম, "আমার বাচ্চাটা আমায় বড় হারায়। মা ওকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেও পারে না। শুধু কাঁদে আমার জন্যে।"

"আমার মুন্নাও খুব কাঁদে আমার জন্যে। — কাল হঠাৎ মনে হলো, আমাকে এরা ছেড়ে দেবে। বাড়ীতে আমার ছোট্ট বাচ্চা মুন্না বড় কাঁদে তো! জেলার সাহেব আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে। বলেছে মুন্নার বাবা ওকে সামলাতে পারে না। কাল বিকেলে মুন্নাকে আমার কাছে এনেছিল। তুমি তখন ছিলে না। তুমি তো রাত্রে ডিউটি করো। মুন্নাকে কোলে নিয়ে আমি খুব আদর করেছি। বলেছি, আর তো একটা দিন। আমি আর তোকে ছেড়ে কোথাও থাকবো না।"

বলতে বলতে কাঁদছিল মেয়েটা। হঠাৎ আমারও চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল জেলার সাহেবের মানার

BanglaBook.org

কথা। কয়েদীর সঙ্গে কথা বলা বারণ।

আচ্ছা, ওর নাকি পেটে বাচ্চা আছে! বাড়ীতে আরো একটা ছেলে আছে নাকি ওর? সত্যি? কে জানে!

৬ই অক্টোবর ১৯৫১

কাল রাতের ডিউটি আজ সকাল ৮টায় শেষ হয়েছে। ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহ মন নিয়ে সকালে বাড়ী এসেছি। একবার শুধু আমার লাডলাকে বুকে তুলে আদর করেছি। সারা দিন স্নান বা খাওয়া কিছু করিনি। ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম ঘুম না ভাঙলে আমাকে ডেকো না। এতখানি সহ্য করতে পারি না আমি। জীবনে এই প্রথম, হয়তো- বা এই শেষ। আমি আর কখনো ফাঁসি সেল-এর ডিউটি করবো না।

কাল রাত ৮টায় ডিউটিতে এসেই জেনেছিলাম, কাল ভোর ছটার সময় নাসরিনের ফাঁসি হবে। মনটা হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জানতাম, দু একদিনের মধ্যেই যা হবার হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে, কালই?

১নং সেল-এর গরাদের পাশে আমার টুলে বসেছিলাম আমি। আজ ঠিক করে ফেলেছি ওর সঙ্গে কোনো কথা বলবো না আমি। শুধু করে যাব আমার ডিউটি।

হঠাৎ দেখি, গরাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ও। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো "কটা বাজে দিদি? একটুও ঘুম আসছে না। তিন দিন ঘুমাই না। একটা ঘুমের বড়ি কাল রাত্রে এনে দিও আমায়। কাল ঘুমাবো ভাল করে।"

কোনো কথা বলিনি আমি। ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে টুলটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে সরে বসলাম। হাসলো নাসরিন। বললো, "ঝগড়া করে কি করবে? ছাড়া পেয়ে চলে গেলে আর কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবো? জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল, কাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে? বলেছি— আমার মুন্নাকে।" কি সব বলছে মেয়েটা! নাঃ আমাকে শক্ত হতে হলো। ও আবার চুপ করে গিয়ে বসলো মেঝেতে পাতা কম্বলটার ওপর। কথা বলিনি আমি।

ভোরবেলা, তখন বোধহয় ৫টা বাজে। সেল-এর সামনের ঢাকা বারান্দায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ দু-তিনজনের জুতোর আওয়াজে তাকিয়ে দেখলাম—

BanglaBook.org

জেলার সাহেব। সঙ্গে ডাক্তারবাবু, দুজন মহিলা কনস্টেব্‌ল আর একজন পুরুষ কনস্টেব্‌ল।

আমাকে ইশারায় তালাটা খুলে দিতে বললেন জেলার সাহেব। কম্বলের ওপর এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিল নাসরিন, বুকের কাছে সেই পুতুলটা। আমাকে ডাকতে বললেন জেলার সাহেব। আমি ওর কাছে গিয়ে একবার ডাকলাম— —'নাসরিন, ওঠো।' কোনো সাড়া নেই, নিশ্চিন্তে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। এবার আমি আলতো করে ওর গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলাম। ধড়ফড় করে উঠে বসলো ও। তারপর সকলকে দেখে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। থমকে একটুক্ষণ নীরব থেকে বললে— "আপনারা? এ সময়ে? আমি বাড়ী যাবে বুঝি? আমার মুন্নার কাছে?"

জেলার সাহেব এগিয়ে এসে বললেন— "তোমার সাজার সময় হয়ে গেছে। কাকে যেন তুমি দেখতে চেয়েছিলে? খবর নিয়ে দেখা গেছে, ঐ নামে সেখানে কেউ থাকে না। ফিরদৌস বলে একটা লোক আর তার মা থাকে। তারা সকালে আসবে। গাড়ী যাবে ওদের আনতে।"

কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে নাসরিনকে। মহিলা কারারক্ষীটি একটা নতুন শাড়ী আর ব্লাউজ এনেছে। আমাকে সে বললো— "ওকে চান করিয়ে এনে শাড়ীটা পরিয়ে দাও। হাতে সময় কম।" কনস্টেবলটা এক বালতি জল আর একটা মগ রেখে গেল। ওরা সকলে সরে গেল একটু আড়ালে— যেখান থেকে সেল-টা দেখা যায় না।

বিমূঢ়ের মতো লাগছে নাসরিনকে। কেমন যেন আবিষ্টের মতো। ওর মাথায় মগে করে কয়েক মগ জল ঢেলে দিলাম। গামছা দিয়ে ভেজা শরীরটা মুছিয়ে দিয়ে পরিয়ে দিলাম নতুন শাড়ীটা। কোনো বাধা দিল না, শিশুর মতো নীরবে, বিনা বাধায় সব করতে দিল। আমি ডাকলাম অন্যদের। একটা থালায় করে কিছু খাবার এসেছে। আমি বললাম— 'খাও, নাসরিন।' ও খেলো না। একটা খাবার ভেঙে ওর মুখের সামনে ধরলাম। ও বিমূঢ়ের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। খাবারটা পড়ে গেল মুখ থেকে।

—"ওকে নিয়ে এসো।" কনস্টেব্‌ল আর মহিলা কারাকর্মী দুজনকে বললেন জেলার। হঠাৎ কি যেন হলো, অসম্ভব শক্তি দিয়ে দুজনকে ধাক্কা

BanglaBook.org

দিয়ে ফেলে দিল নাসরিন। তারপর ছুটে পালাতে গেল! সবাই ধরে ফেললো ওকে। ও চিৎকার করে কাঁদছে— "যাবো না, যাবো না আমি। আমাকে আমার মুন্নার কাছে নিয়ে চলো। আমার মুন্না কাঁদছে আমার জন্যে...।"

জোর করে ওকে টানছে সকলে। আমি নিথর দাঁড়িয়ে আছি নীরবে। আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে মেয়েটা বললো—"দিদি, ওরা আমায় মেরে ফেলছে, তুমি বাঁচাও আমাকে, দিদি, বাঁচাও।"

ইশারায় আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন জেলার সাহেব। আমিও ভূতাবিষ্টের মতো হাঁটতে লাগলাম ওদের সঙ্গে। মাঝখানে মেয়েটা। ফাঁসির মঞ্চের সামনে তৈরী হয়েই ছিল হ্যাংম্যান দুলারাম। মহিলা কারাকর্মী দুজন মঞ্চের ওপর তুলে আনলো মেয়েটাকে। এখন আর কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করছে না ও। কেমন যেন বিহ্বল, বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ভাব। কি যে ঘটছে, কি যে ঘটতে চলেছে— সে সম্বন্ধে যেন কোনো ধারণাই আর ওর নেই।

দুলারাম ওর হাত দুটো পিছনে নিয়ে বেঁধে দিল একটা শক্ত দড়ি দিয়ে। পা দুটোও বেঁধে দিল। কোনো বাধা নেই। বাধ্য শিশুর মতো সবই নীরবে মেনে নিচ্ছে মেয়েটা। দুলারাম একটা কালো থলের মতো আবরণ পরিয়ে দিলো ওর মুখের ওপরে, মাথায়। তার ওপর দিয়ে ফাঁসটা গলিয়ে দিল গলায়। গিঁটটা একটু কসে নামিয়ে আনলো ফাঁসটা পর্যন্ত। তারপর মেয়েটার সামনে দুহাত জোড় করে বললে— "তুমি আমায় ক্ষমা কোরো, এ কাজ আমায় বাঁচার জন্যে করতে হয়। আমার কোনো পাপ নেই। ঠাকুর, আমার কাজের জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন।"

ইশারায় সে সম্মতি চাইল জেলার সাহেবের কাছে। ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন জেলার। ঘড়িটা দেখলেন ডাক্তারবাবু। ফাঁসি মঞ্চের হাতলের লিভারটা সজোরে টান দিল দুলারাম। মুহূর্তে মেয়েটার পায়ের তলার পাটাতনটা দুভাগে ভাগ হয়ে নীচে নেমে গেল। ফাঁসিকাঠের মাথার মাঝখানে বাঁধা মোটা দড়িটায় সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে নাসরিনের হাত-পা বাঁধা, মুখ ঢাকা শরীরটা নেমে গেল কুয়োর মতো গভীর খাদটার ভিতরে। ফাঁক হয়ে যাওয়া পাটাতন দুটো আবার সশব্দে আগের জায়গায় এসে গেল। লক্ষ্য করলাম, ফাঁসিকাঠের ওপরে বাঁধা দড়িটা অস্থিরভাবে চঞ্চল হয়ে থরথর

BanglaBook.org

করে কাঁপছে। একটুক্ষণ পরে সে কম্পন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। আধঘণ্টা সকলে অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর ডাক্তারবাবু বডিটা তুলে নিতে বললেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াইনি। অন্যেরা তখনও রয়েছে সেখানে।

একটু আগেই জেলখানার সাইরেনে সকাল ছটা বাজার সঙ্কেত হয়ে গেছে। হয়তো এতক্ষণে সেই লোকটা আর তার মা পৌঁছে গেছে জেলের গাড়ীতে করে এই সেন্ট্রাল জেলের অফিসে। মুন্না বলে কেউ সত্যিই আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলেও সে জানবে না আজ ভোর ছটার সাইরেনের সাথে সাথে তার 'মা' চলে গেল। মেয়েটার পেটের বাচ্চাটার কি হলো? তার তো কোনো অপরাধ নেই! এই পৃথিবীর আলো তার দেখা হলো না— কিন্তু সে কার অপরাধে? তার মায়ের? ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের? না, প্রশাসনের?

এর উত্তর নেই। এর উত্তর মেলে না, এর উত্তর কখনো মেলেনি আমার জীবনে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org